প্রতিচিন্তা



সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

পঞ্চম বর্ষ ● দ্বিতীয় সংখ্যা ● ঢাকা ● এপ্রিল-জুন ২০১৫

সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে
প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।
যোগাযোগ : সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কারওয়ান বাজার
ঢাকা-১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১
পরিবেশক : প্রথমা প্রকাশন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

প্রতি চিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

এপ্রিল-জুন সংখ্যা ২০১৫

সম্পাদক
মতিউর রহমান, সম্পাদক, প্রথম আলো

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
খন্দকার সাখাওয়াত আলী, সমাজ গবেষক; ফেলো, পিপিআরসি

উপদেষ্টা পর্ষদ
নুরুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ; ইমেরিটাস ফেলো, ইফপ্রি
আনিসুজ্জামান, প্রফেসর ইমেরিটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আজিজুর রহমান খান, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া
সিরাজুল ইসলাম, ইতিহাসবিদ; কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো
রওনক জাহান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি
আকবর আলি খান, অর্থনীতিবিদ, লেখক; অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মাহবুব হোসেন, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; উপদেষ্টা, ব্র্যাক

সম্পাদনা পর্ষদ
নজরুল ইসলাম, ঊর্ধ্বতন অর্থনীতিবিদ, জাতিসংঘ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগ
বদরুল আলম খান, অধ্যাপক, ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া
হাসান ফেরদৌস, জাতিসংঘে কর্মরত
আলী রীয়াজ, অধ্যাপক, রাজনীতি ও সরকার বিভাগ, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি
আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাজ্জাদ শরিফ, কবি, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, প্রথম আলো

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার, চিত্রশিল্পী

সহকারী সম্পাদক
খলিলউল্লাহ্ ও জোশিতা জিহান

দাম : ৫০ টাকা
ISSN 2310-2403
ওয়েবসাইট : protichinta.prothom-alo.com, ই-মেইল : protichinta@gmail.com

Protichinta : A Quarterly Journal on Society, Economy and State
April-June Issue, 2015; Editor & Publisher Matiur Rahman; Price 50 Taka
100 Kazi Nazrul Islam Avenue (CA Bhaban), Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Phone : 8180078-81

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৬

রাজনীতি
বাংলাদেশ : যেখানে গণতন্ত্রের রং ধূসর
বদরুল আলম খান ৯

জাতীয়তাবাদ
পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠের আধিপত্য
লাইলুফার ইয়াসমিন ৪১

সমাজ ও নারী
গ্রামীণ নারীর পরিবেশ সচেতনতা ও পরিবেশ অবনয়নের প্রতিক্রিয়া
সাবেকুন নাজমুন ৬১

পুনর্মুদ্রণ
ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মন
আবদুর রাজ্জাক ৮৩

অনুস্মৃতি
ঢাকার বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত এক নারীর শিক্ষা-সাংস্কৃতিক উদ্যোগ
আনোয়ারা বাহার চৌধুরী ১০৩

সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন
জামদানির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ভৌগোলিক নির্দেশনা
ইফতেখার ইকবাল ১৩৩

জ্ঞান সারথি কে শ্রদ্ধা
বাগান থেকে মহাকাশ
মীজান রহমান ১৪৫

লেখক পরিচিতি ১৭১



২০১৫ সালটির শুরু এক নৈরাজ্যকর রাজনৈতিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে। গণতন্ত্র আর নিরপেক্ষ নির্বাচনের নামে এই সহিংস পরিস্থিতি বিগত তিনটি মাস লাগাতার চলেছিল। স্থানীয় সিটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশের পরিস্থিতি খানিকটা স্বাভাবিক হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতির স্বাভাবিক অবস্থাটি কত দিন থাকবে, সেটাই বড় প্রশ্ন। বিষয়টি মাথায় রেখে বদরুল আলম খান বাংলাদেশের গণতন্ত্রের একটি তাত্ত্বিক কাঠামোগত বিশ্লেষণ তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। তাঁর প্রবন্ধে তিনি বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে উদারনীতিবিহীন গণতন্ত্র (Illiberal Democracy) হিসেবে আখ্যায়িত করতে পেরেছেন। তিনি গণতন্ত্রের আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক পূর্বশর্তগুলো আমাদের দেশে পূরণ না করেই গণতন্ত্রের কথা ভাবছি কি না, সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। একই সঙ্গে গণতন্ত্রের সাধারণ নীতিমালার প্রতি এলিট গোষ্ঠীর অঙ্গীকার এবং তাদের আন্তসম্পর্কগত সমঝোতা অর্থাৎ এলিট সমঝোতার তত্ত্ব কিংবা রাজনৈতিক ঐক্য ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, সেখানকার অস্থিতিশীল পরিস্থিতি, মানবাধিকার অবস্থা ইত্যাদি বিষয় বাংলাদেশের জাতীয় অঙ্গনে এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ ডিসকোর্স পর্যালোচনায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠদের আধিপত্য বিষয়ে আলোচিত প্রবন্ধটি লিখেছেন লাইলুফার ইয়াসমিন। পরিচয়ের বিষয়টি প্রত্যেক জাতি ও নৃগোষ্ঠীর কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পরিচয়ের রাজনীতি জাতিগঠনে এবং রাষ্ট্রভাঙনে উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে সংবেদনশীল রাষ্ট্রীয় ভূমিকা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। ভূরাজনৈতিক বিবেচনায় এই অঞ্চলের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই এখানকার পরিচয়ের রাজনীতি এবং শাসনপ্রক্রিয়া কীভাবে পরিচালিত হয় তা বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য জানাটা অপরিহার্য।

নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী উন্নয়নের প্রধান শর্ত—নারীর প্রান্তিকায়ন ও অবদমনের ক্ষেত্রগুলো উন্মোচিত করা। সমাজের বিভিন্ন স্তরে নারীর ভূমিকা এবং তার ওপর পরিচালিত শোষণ ও বঞ্চনার জায়গাগুলো যত বেশি সামনে তুলে ধরা যাবে, ততই ভালো প্রতিকারের পথ খুঁজে পাওয়া সহজ হবে। নারীর সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্ক থাকায় নারী যেমন শোষিত হয় এবং ভঙ্গুর অবস্থায় পতিত হয়, তেমনি পরিবেশের ক্ষতি বন্ধে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন কৌশল হিসেবে নারীর এই সহজাত প্রকৃতি-সংশ্লিষ্টতা কাজে লাগানো যাবে। 'গ্রামীণ নারীর পরিবেশ সচেতনতা ও পরিবেশ অবনয়নের বিরুদ্ধে সাড়া প্রদান' শিরোনামে সাবেকুন নাজমুন সে বিষয়ে একটি প্রারম্ভিক আলোচনা তুলে ধরেছেন।

সম্প্রতি পেরিয়ে গেল অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের জন্মশতবর্ষ। নিজে লিখেছেন খুবই কম। তবে তাঁর পড়াশোনার পরিধি ও প্রজ্ঞার কারণে তাঁর এক কিংবদন্তি ইমেজ গড়ে ওঠে। তিনটি প্রজন্মকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট তিন প্রজন্মের জ্ঞানচর্চায় তাঁর অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা ছিল তাদের পাথেয়। জাতীয় জীবনের উত্থানপর্বের তিনি ছিলেন পর্যবেক্ষক ও ক্ষেত্রবিশেষে অভিভাবক স্থানীয়। তাঁর জন্মশতবার্ষিকীকে উপলক্ষ করে প্রতিচিন্তার পাঠকদের সামনে তাঁর অভিসন্দর্ভের অনুদিত অংশবিশেষ পুনর্মুদ্রণ করা হলো।

আগামী ২০১৯ সালে আনোয়ারা বাহার চৌধুরী জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হবে। আমরা অগ্রিম এই মুসলিম নারীর প্রতিকৃতি ও ঢাকায় তাঁর শিক্ষা-সাংস্কৃতিক উদ্যোগের অন্তরঙ্গ বয়ান তুলে ধরেছি। তাঁর এ সাক্ষাৎকারে নিজের জীবনের রেখাচিত্রের পাশাপাশি ঢাকার বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ ও নারীর শিক্ষা-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার ইতিহাসের নানা উদ্যোগ ও ব্যক্তিদের কথা তুলে ধরা হয়েছে। বাঙালি মুসলিম সমাজের এমন একজন নারীর জীবনকথা তুলে ধরতে পেরে আমরা আনন্দিত। এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন প্রয়াত সাংবাদিক বেবী মওদুদ। সাক্ষাৎকারটি প্রতিচিন্তায় প্রথমবারের মতো ছাপা হলো।

বাংলাদেশের বয়নশিল্পে জামদানি গুরুত্বপূর্ণ। শুধু সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত গুরুত্বের জন্যই নয়, বাণিজ্যিক তাৎপর্য বিশ্লেষণে আন্তর্জাতিক স্বত্বাধিকার আদায়ের একটি অন্যতম জায়গা এই জামদানি। বর্তমান সময়ে জামদানির স্বত্ববিষয়ক মতবিরোধ এবং এর অর্থনীতি-রাজনীতি বুঝতে প্রবন্ধটি ছাপাতে উৎসাহিত করেছে। ইফতেখার ইকবাল জামদানির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ভৌগোলিক নির্দেশনা নামক লেখায় ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখিয়েছেন যে জামদানির উৎপত্তিস্থল ঢাকা।

অধ্যাপক মীজান রহমান নামটি এক মুক্তচিন্তক, সমাজসচেতন, বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। তিনি প্রবাসী বাংলাদেশি ছিলেন। অতিসম্প্রতি এমন একজন চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বকে হারিয়েছে বাংলাদেশ। দেশের বাইরে থাকলেও দেশের প্রতি, বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও আবেগ বারবার টেনে এনেছে মাতৃভূমিতে। মৃত্যুর মাস ছয়েক আগে তাঁর এই লেখাটি আমাদের হাতে আসে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে 'জ্ঞান সারথিকে শ্রদ্ধা' এই শিরোনামে ছাপতে পেরে আমরা বিশেষ সম্মানিত বোধ করছি।

খাতি
রাজনীতি
চিন্তা

বাংলাদেশ : যেখানে গণতন্ত্রের রং ধূসর

বদরুল আলম খান

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক বিকাশ যেভাবে হওয়ার কথা ছিল সেভাবে হয়নি। আজ যে গণতন্ত্র আমাদের দেশে স্থান করে নিয়েছে তাকে উদারনীতিবিহীন গণতন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। এর কারণ হিসেবে অনেকে দাবি করেন যে গণতন্ত্রের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পূর্বশর্তগুলো আমাদের দেশে পূরণ না করেই আমরা গণতন্ত্র নিয়ে ভেবেছি। আর সে কারণে এখানে গণতন্ত্রের উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি হয়নি। পূর্বশর্তের প্রশ্নে দুটি অবস্থান নিয়ে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। একটি আর্থসামাজিক উন্নয়ন, অন্যটি গণতন্ত্রের সাধারণ নীতিমালার প্রতি এলিট গোষ্ঠীর অঙ্গীকার এবং তাদের আন্তসম্পর্কগত সমঝোতা। এই উভয় পূর্বশর্তের শেকড় ইউরোপীয় সমাজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত।

বাংলাদেশের জন্য সে কারণে তাদের উপযোগিতা অনেকটা প্রশ্নবোধক হয়ে পড়ে। ইউরোপ বেশ কয়েকটি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের ধাপ অতিক্রম করে গণতন্ত্রে পৌঁছেছিল—প্রথমে জাতিগঠন, পরে রাজনৈতিক সংস্কার, শিল্প বিপ্লব এবং বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছিল। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ইউরোপকে প্রায় পাঁচ শ বছর ব্যয় করতে হয়। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে আমাদের দেশ একই সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক সংস্কার, জাতিগঠন এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। ফলে ইউরোপীয় সমাজের সঙ্গে তুলনা করলে চ্যালেঞ্জটি এ ক্ষেত্রে অনেক গুণ বেশি। সেই পরিপ্রেক্ষিতকে মাথায় রেখে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের ওপর প্রবন্ধে আলোকপাত করা হলো।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ : গণতন্ত্র, সিমোর লিপসেট, ধূসর এলাকা, ব্যারিংটন মুর, 'মাফিয়া গণতন্ত্র', এলিট সমঝোতার তত্ত্ব, রাজনৈতিক ঐক্য, আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজ, অনির্বাচিত আমলাতন্ত্র ও জনপ্রতিনিধি।

ভূমিকা

এ প্রবন্ধটি গণতন্ত্র নিয়ে লেখা। তবে গণতন্ত্রের সাধারণ দিক নিয়ে নয়। যে বিশেষ ধরনের গণতন্ত্র বাংলাদেশে আজ বহাল আছে তার হালচিত্র নিয়ে মূলত এটি লেখা হয়েছে। অনেকের মতে, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। কারণ সেখানে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা যে মাত্রায় রক্তক্ষয়ী এবং সংঘাতময়, সেটি পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। স্বাধীনতা লাভের ইতোমধ্যে ৪৪ বছর পার হয়েছে। অথচ গণতন্ত্র এখানে যৌবনে পৌঁছানোর আগেই অসুস্থতায় ভুগছে। এই অসুস্থ গণতন্ত্রের ওপর আলোচনার যৌক্তিকতা কতটুকু, সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে মূলত দুটি কারণে গণতন্ত্রের ওপর এই আলোচনাটি হওয়া প্রয়োজন বলে মনে হয়। একটি কারণ, গণতন্ত্র নিয়ে বিশ্বব্যাপী আজ বিশেষ উত্তেজনা বিরাজ করছে, বিভিন্ন দেশে তাকে প্রতিষ্ঠা করার বিপুল তোড়জোড় চলছে। সেই ডামাডোলের দিকে তাকিয়ে দেশীয় গণতন্ত্রচর্চার সাক্ষাৎ চিত্রটি তুলে ধরার কৌতূহল থেকে নিবৃত্ত থাকা কঠিন। তা যতই মনে হোক না কেন তার ওপর কালো মেঘের এক গভীর প্রলেপ রয়েছে। বিজ্ঞজনেরা মনে করেন যেকোনো জিনিসের মধ্যে যেমন ভালো দিক আছে, তেমনি মন্দ দিকও আছে। কেবল মন্দের দিকে তাকিয়ে ভালোকে উপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সেদিক থেকে ভেবে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সবটুকুকে নাকচ করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না। সে কারণে কিছুটা দুঃসাহস দেখিয়ে তাকে বিচারের ঝুঁকি নেওয়ার সুযোগ রয়েছে বলে মনে হয়।

আরও একটি কারণ আছে, যা নিতান্তই দেশীয়। আমাদের দেশে গণতন্ত্র নিয়ে বিজ্ঞ সমাজে এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচুর আগ্রহ লক্ষ করা যায়। গণতন্ত্র নিয়ে আলাপচারিতার শেষ নেই। চায়ের কাপে আড্ডা থেকে শুরু করে ঘরোয়া পরিবেশ এবং বন্ধুমহলে গণতন্ত্রের ভাগ্য নিয়ে প্রচুর আলাপ হয়ে থাকে। দৈনিক পত্রপত্রিকার পাতায় গণতন্ত্রসংক্রান্ত নানা লেখা প্রতিদিন প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু তার ওপর গবেষণাধর্মী রচনা চোখে পড়ে কদাচিৎ। সেই ঘাটতিটুকু এখানে কিছুটা হলেও পূরণ করার প্রচেষ্টা থাকবে।

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের চেহারা

মার্কিন *নিউজউইক* পত্রিকার সম্পাদক ফরিদ জাকারিয়ার মতো যাঁরা বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক প্রবণতা নিয়ে ভাবেন, তাঁদের বিশেষ উৎসাহ মূলত করে সেসব দেশকে নিয়ে যেসব দেশ দীর্ঘকাল স্বৈরশাসনের অধীনে থেকে ইদানীং গণতন্ত্রের পথে পা বাড়িয়েছে। সে ধরনের দেশের তালিকায় বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে প্রায়ই 'উদারনীতিবিহীন গণতন্ত্র' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

অনেকে মনে করেন গণতন্ত্রের বিচারে বাংলাদেশ এক ধূসর এলাকায় আটকে আছে। আর সে কারণে সামনে এগোনোর পথ তার জন্য অনেকটা রুদ্ধ। এই মূল্যায়ন কেন তার বেশ কিছু কারণ রয়েছে। প্রথমত, বাংলাদেশে যে ধরনের রাজনীতি স্থান করে নিয়েছে সে রাজনীতি মূলত সন্ত্রাসনির্ভর। রাজনৈতিক দল পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উদার মনোভাব দেখায় না। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি তাদের প্রত্যেকের রয়েছে প্রচণ্ড ঘৃণা। তারা সংকীর্ণ মনের, স্পর্শকাতর, ক্ষমতালোভী, অন্যের কল্যাণ পছন্দ করে না। প্রখ্যাত ভারতীয় চিন্তাবিদ নীরদ চৌধুরীর ভাষায় যাকে বলে, 'আত্মঘাতী'। এই রাজনৈতিক এলিট গোষ্ঠী এমনই অনড় এবং আত্মকেন্দ্রিক যে নিরপেক্ষ নির্বাচনের ফল মেনে নিতে তারা যথেষ্ট কার্পণ্য দেখায়। সরকারি দল বা বিরোধী দলকে শত্রু হিসেবে দেখে এবং তাদের প্রতি অগণতান্ত্রিক, সভ্য জগতের রীতিনীতিবিরোধী আচরণ করে।

বিরোধী দলও তাদের ভূমিকায় রাজনৈতিক প্রতিযোগিতাকে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে ধরে নেয়। সমঝোতার দরজা বন্ধ করে দেয়, প্রতিযোগিতাকে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে না রেখে জাতীয় সংসদ বর্জন করে, রাস্তায় নেমে সরকার উৎখাতে সহিংস পথ অনুসরণ করে। এতে করে রাজনীতির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ভেঙে পড়লেও দ্বিগুণ উল্লসিত হয়ে গণতন্ত্রের বিজয় হয়েছে ঘোষণা দিয়ে বিরোধী দল ক্ষমতা গ্রহণ করে। পুনরাবৃত্তি ঘটে সে একই চিত্রের। এবার তাদের পালা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নির্যাতন এবং নিপীড়ন চালানো, ঠিক যেভাবে তারা নিজেরাই নির্যাতিত হয়েছে। পরিচিত এই চক্রটি বাংলাদেশের রাজনীতিতে আজ বলা চলে প্রতিষ্ঠিত সত্য।

এই বিশেষ রাজনৈতিক সংস্কৃতির কারণে যে ধরনের গণতন্ত্র বাংলাদেশে স্থান করে নিয়েছে সেটি নিদারুণভাবে সংকীর্ণ প্রকৃতির। তাকে পোশাকি গণতন্ত্র বললেও ভুল হয় না। সেখানে মেয়াদান্তে নির্বাচন হয়, যদিও সে নির্বাচন নিরপেক্ষ কি না তা নিয়ে তর্ক থাকে। সেখানে ক্ষমতার রদবদল মুখ্য লক্ষ্য হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। অর্থনীতি, সামাজিক সম্পর্ক, নাগরিক অধিকার, মানবিক অধিকারসহ একটি আধুনিক সংস্কৃতি নির্মাণের পথ বা মাধ্যম হিসেবে তাকে দেখা হয় না। ভাবা হয় না মানবিক গুণাবলির বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্র হিসেবে, যেখানে মেধার পূর্ণ বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি সম্ভব হবে। এই সংকীর্ণ অর্থে গণতন্ত্রকে বোঝা এবং সহিংসতাকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার কারণে অর্থনীতি এবং রাজনীতির মধ্যে বিশাল অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়ে আছে। দেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেলেও দেশের শাসনপদ্ধতি তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগোচ্ছে না। অর্থনীতির বিশাল কর্মযজ্ঞে কোটি কোটি মানুষ অংশ নিলেও রাষ্ট্রপরিচালনার কৃতকৌশলে আধুনিকায়ন এবং গণতন্ত্রায়ণের লেশমাত্র নেই। রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রশ্নে দৃশ্যত স্থান করে নিয়েছে সংকোচনের আবহাওয়া। সেটি প্রত্যক্ষ

করা যাচ্ছে নানা দিক থেকে—সংসদ নির্বাচনে, তার কার্যক্রমে, বিচার বিভাগ বা অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের দলীয়করণে, স্বাধীনতাহীন অস্তিত্বে। ফলে গণতন্ত্রের প্রতি এখানে কোনো 'সক্রিয়, ইতিবাচক এবং গভীরভাবে অনুভূত আনুগত্য' (Larry Diamond, 1999: 64) গড়ে ওঠেনি। অর্থাৎ গণতন্ত্র এখানে নাগরিক অভ্যাসে পরিণত হয়নি।

এই ধরনের গণতন্ত্রকে অনেকে Feckless pluralism (Carothers, 2002, p.11), নির্বাচনী গণতন্ত্র (electoral democracy), মিথ্যা গণতন্ত্র (pseudo democracy), দুর্বল গণতন্ত্র (weak democracy), আংশিক গণতন্ত্র (partial democracy), আবরণী গণতন্ত্র (facade democracy), আধা গণতন্ত্র (semi-democratic), পোশাকি গণতন্ত্র (formal democracy) উদারনীতিবিমুখ গণতন্ত্র (illiberal democracy) হিসেবে ব্যাখ্যা করতে কার্পণ্য করেন না। প্রবণতাটি কেবল যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা নয়। ব্রাজিল, বুরকিনা ফাসো, কঙ্গো, এলসালভাদর, ইন্দোনেশিয়া, কেনিয়া, মালয়েশিয়া, রাশিয়া, তানজানিয়া, ইউক্রেন, জাম্বিয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ভেনেজুয়েলা, কলম্বিয়া, শ্রীলঙ্কায়ও সেটি লক্ষ করা যাচ্ছে এবং উল্লিখিত দেশগুলোতে গণতন্ত্রের মানের অবনতি ঘটেই চলেছে। সে কারণে অনেকে সেখানকার গণতন্ত্রকে frozen Democracy (Terry Lynn Karl, 1990) বলছেন। গণতন্ত্র সেখানে বরফের মতো নিশ্চল, প্রাণহীন, অথর্ব অথবা অকার্যকর। ওই একই প্রবণতা দেখা যায় দক্ষিণ আমেরিকায়। সেখানে স্থান করে নিয়েছে আরও ভয়ংকর এক মিশ্রণ। গণতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রের আঁতাত থেকে জন্ম নিয়েছে 'বাজার স্বৈরতন্ত্র' (Market Authoritarianism)। অর্থনীতিতে নব্য উদারনীতিবাদ চালু রাখা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নানা ধরনের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করে এ গণতন্ত্র জন্ম দিচ্ছে ভুঁইফোড় এক নব্য বুর্জোয়ার। এই একই মডেলের সাক্ষাৎ মেলে পূর্ব ইউরোপে। সেখানে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোকে ভেঙে পুঁজিবাদ গড়ে উঠেছে বটে, কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার মতো করে সে পুঁজিবাদও নৈতিকতাবর্জিত। কঠোর পরিশ্রম, সততা, দায়িত্ববোধ যেগুলো পুঁজিবাদের ধ্রুপদি গুণ, সেগুলো সেখানে অনুপস্থিত। ফলে দুর্নীতিগ্রস্ত বণিক শ্রেণির সঙ্গে দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক এলিটের আঁতাত থেকে সেখানে জন্ম নিয়েছে 'মাফিয়া গণতন্ত্র'। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

তবে এ ধরনের কঠোর মন্তব্যকে গ্রহণ করে নেওয়ার আগে একটি বিশেষ সত্য মাথায় রাখা উচিত। অন্যান্য তৃতীয় বিশ্বের দেশের মতো বাংলাদেশ আজ গণতন্ত্রের পথে যে সময় অতিক্রম করছে তাকে অন্তর্বর্তী সময় হিসেবে ধরে নিতে হবে এবং মানতে হবে যে যেকোনো অন্তর্বর্তীকালীন গণতন্ত্রের পক্ষে এই ধরনের সংকটে পড়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। প্রখ্যাত মার্কিন পণ্ডিত সামুয়েল হান্টিংটনও

সেটি উপলব্ধি করতে ভোলেননি। ১৯৯৬ সালে লেখা এক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, 'a new reverse wave may be gathering which could lead to the ersion of some third-wave gains' (Huntington, Samuel, 1996), এই পরিপ্রেক্ষিতে যে প্রশ্নটি অনেকে যুক্তিযুক্ত ভাবেন তা হলো—গণতন্ত্র নিয়ে ভাবার আগে দেখা প্রয়োজন দেশটি গণতন্ত্রের জন্য উপযোগী কি না। অর্থাৎ দেশটি গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত পূরণ করে কি না। সে কারণে তড়িঘড়ি করে গণতন্ত্রের পথে পা বাড়ানোর আগে আমাদের ভাবা উচিত দেশটি গণতন্ত্রের জন্য আদৌ প্রস্তুত আছে কি না।

দুটি পূর্বশর্ত

পূর্বশর্তের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে দুটি তাত্ত্বিক অবস্থান গবেষণা জগতে এ পর্যন্ত স্থান পেয়েছে। এই দুইয়ের মধ্যে একটির দাবি হচ্ছে, কিছু পূর্বশর্ত পূরণ না করে কোনো দেশের পক্ষে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। ধারাটি সমাজের আর্থসামাজিক কাঠামোর ওপর বিশেষ জোর দেয়। মনে করা হয় কোনো দেশ যদি আর্থসামাজিক অগ্রগতির বিশেষ পর্যায়ে না পৌঁছায় তাহলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে বাধ্য। ধারাটি ষাট এবং সত্তর দশকের দিকে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। যাঁরা এই তাত্ত্বিক অবস্থানের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের মধ্যে মুখ্য হলেন ব্যারিংটন মুর (১৯৬৬), ডিয়েত্রিক রুশমেয়ার, জন স্তেভেন্স (১৯৯২), সিমর লিপসেট এবং নদিয়া গিয়া (Nodia Ghia, 2002) প্রমুখ। এই ধারাটি পুঁজিবাদী অর্থনীতি গড়ে তুলে সমাজকে আধুনিক করা অপরিহার্য মনে করে। তা না হলে যেহেতু ব্যক্তি অধিকার স্বীকৃতি পায় না। সমাজ নানা শ্রেণিতে বিভক্ত না হলে (মধ্যবিত্ত শ্রেণি, পুঁজিপতি গোষ্ঠী বা শ্রমিক শ্রেণি) প্রতিদ্বন্দ্বিতার মানসিকতার জন্ম নেয় না, নাগরিক অধিকার এবং দাবির রাজনৈতিক প্রকাশ ঘটে না। জনগণ গণতন্ত্র বা রাষ্ট্রশাসনকে কেন্দ্র করে সুস্থ বিতর্কে অংশ নিতে পারে না। এরই সঙ্গে তাঁদের তালিকায় আরও রয়েছে একটি নাগরিক সমাজের প্রয়োজনীয়তা। সে নাগরিক সমাজই তাঁদের মতে, গণতন্ত্রের প্রধান শক্তি এবং রক্ষক। তাঁরা আরও জোর দেন নাগরিক সংস্কৃতির ওপর। তাঁদের ধারণায় গণতন্ত্রের প্রতি সাধারণ মানুষের আনুগত্য নিশ্চিত হলে এবং সেটি একটি সংস্কৃতিতে পরিণত হলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সহজ হয়। সব মিলিয়ে দেশ ও সমাজের কাঠামোগত এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন প্রথম, গণতন্ত্রের ভাবনা পরে। এই হলো আর্থসামাজিক পূর্বশর্তের দাবি।

এই চিন্তাধারা সিমোর লিপসেট (1959) নামের একজন মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেছেন। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি একটি দেশে গণতন্ত্রের

পূর্বশর্ত তৈরি করে—সেই ধারণাটি আমরা তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি। লিপসেটের সঙ্গে সুর মিলিয়ে নদিয়া গিয়া নামের আরও একজন গবেষক ওই একই যুক্তি তুলে ধরে বলেছেন, প্রথমে সমাজে বিপুল পরিবর্তন আনতে হবে। সেই পরিবর্তন গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত তৈরি করবে এবং দেশ গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাবে (Nodia Ghia, 2002, p.6)। প্রখ্যাত মার্ক্সবাদী সমাজতান্ত্রিক ব্যারিংটন মুর গণতন্ত্রের বিকাশকে এই একই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন। তিনি আধুনিকায়নকে একমাত্র পূর্বশর্ত হিসেবে দেখেননি। তার সঙ্গে তিনি আরও অন্তর্ভুক্ত করেছেন সামাজিক কাঠামো ও শ্রেণি আঁতাতের প্রসঙ্গকে। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে—এক বিশেষ ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল হিসেবে ব্রিটেনে পুঁজিবাদ এসেছিল। ব্রিটিশ সমাজের বিশেষ কাঠামো, কৃষির সঙ্গে যুক্ত শক্তিশালী অভিজাততন্ত্রের সরব উপস্থিতি সেখানে না থাকলে গণতন্ত্র সেখানে প্রতিষ্ঠিত হতো কি না সন্দেহ। ওই শ্রেণি নিজেদের অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে রাজতন্ত্র, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, চার্চ, ধর্মযাজক এবং ভ্যাটিকানের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। অভিজাত শ্রেণি রাজার সমর্থনে না দাঁড়িয়ে রাজতন্ত্রের চিরশত্রু বুর্জোয়ার সঙ্গে আঁতাত গড়ে তুলেছিল, তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাজতন্ত্র উৎখাতের আন্দোলনে শরিক হয়ে। এই বিশেষ প্যাটার্নটি ইউরোপের অন্য আর কোথাও দেখা যায়নি। চীন বা রাশিয়ায় পুঁজিবাদ এসেছে স্বৈরতন্ত্রের হাত ধরে, গণতন্ত্রের সঙ্গে নয়। জার্মানির ক্ষেত্রেও ওই একই কথা প্রযোজ্য। সেখানেও পুঁজিবাদকে আসতে হয়েছে ফ্যাসিবাদের ঘাড়ে চেপে। কিন্তু ব্রিটিশ পুঁজিবাদ এবং তার অনুষঙ্গ হিসেবে গণতন্ত্রের ওই বিশেষ ধারাটি একেবারে স্বতন্ত্র।

ব্যারিংটন মুর ওই একই অবস্থান থেকে ঔপনিবেশিক ভারতকে বিচার করেছেন। ব্রিটিশ নীতির সহায়তায় সেখানে এক বিশেষ সামাজিক কাঠামো গড়ে ওঠে। ওই কাঠামোর মূল শক্তি ছিল ভূমিকেন্দ্রিক গ্রামীণ অভিজাত শ্রেণির সঙ্গে মুৎসুদ্দি এবং শিল্প বুর্জোয়ার আঁতাত। শহুরে মুৎসুদ্দি শ্রেণিও কৃষকের সঙ্গে আঁতাত করে এবং সেই আঁতাতের মূলে ভারতীয় কংগ্রেস পার্টির রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিশেষ অবদান ছিল। এই একই নেতৃত্ব শ্রমিক এবং কৃষকের ঐক্যকে গ্রামীণ এবং শহুরে প্রভুত্বকারী শ্রেণির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দেয়নি। জাতীয় ঐক্য আরও সম্ভব হয়েছিল গ্রামীণ অভিজাত শ্রেণির রাজনৈতিক দুর্বলতার কারণে। ইংরেজি স্বার্থের সঙ্গে তাদের স্বার্থ যুক্ত থাকায় তাদের সামাজিক অবস্থানকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ভালো চোখে দেখেনি। সে কারণে অভিজাত বুর্জোয়া ঐক্য শ্রমিক বা কৃষক শ্রেণির বিরুদ্ধেও দাঁড়ায়নি। বরং ওই আঁতাতকে শক্তিশালী করেছে। ফলে ভারতে রাজনৈতিক শ্রেণিগুলোর মধ্যে যে ঐক্য গড়ে ওঠে সেটিই সেখানে গণতন্ত্রের ভিত হিসেবে কাজ করে এবং গণতান্ত্রিক গঠনে সাহায্য করে। লিপসেট, ব্যারিংটন মুর

বা নদিয়া গিয়ার যুক্তি থেকে তাহলে যেটি দাঁড়ায় তা হলো—সমাজের আর্থসামাজিক অগ্রগতির পর্যায়, নানা শ্রেণির মধ্যে সম্পর্কের মিথষ্ক্রিয়া, যা কিনা ওই আর্থসামাজিক ক্ষেত্র থেকে উদ্ভূত, গণতন্ত্রের ভাগ্যকে নির্ধারণ করে। গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে।

এই তাত্ত্বিক ধারার ঠিক বিপরীতে অন্য একটি ধারা আছে। সে ধারাটির দাবি, আর্থসামাজিক পূর্বশর্ত পূরণ না করেই যেকোনো দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এই মতের যাঁরা অনুসারী তাঁদের মধ্যে রবার্ট ভাল (১৯৮৯), রনালদ ইঙ্গেলহাট (১৯৯০), সিমোর লিপসেট (১৯৯৪), গ্যাব্রিয়েল আলমনড এবং সিডনি ভেরবা (১৯৬৩), রস্টো (১৯৭৩), জোসেফ সুম্পিটার (১৯৭৬), ল্যারি ডায়ামন্ড (১৯৯০), গুলিয়েরমো ও ডোনেল অন্যতম। তাঁদের মতে, একটি দেশের এলিট গোষ্ঠী বা প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব যদি তাদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে নিজেদের মধ্যে সমঝোতায় পৌঁছাতে পারে এবং গণতন্ত্রের মূল নীতিমালা মেনে চলার অঙ্গীকার করে, তাহলে আর্থসামাজিক পূর্বশর্ত ছাড়াই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। ধারাটি ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত এবং মার্কিন ঠান্ডা যুদ্ধের সমাপ্তির পর গণতন্ত্রসংক্রান্ত গবেষণায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। ওই যুদ্ধ যখন শেষ হয় তখন বিশ্বের নানা দেশ পূর্বশর্তের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সে দেশগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল এককালের রাশিয়া, অন্য সোভিয়েত রিপাবলিকসমূহ, পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব এবং এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার বেশ কিছু দেশ। স্বৈরশাসন বা একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বদলে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার প্রথা ওই সব দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেকে সে কারণে ধরেই নিয়েছিল যে আর্থসামাজিক বা রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পূর্বশর্ত ছাড়াই একটি দেশ গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে যেতে পারে, যদি সেখানকার এলিট শ্রেণির মধ্যে গণতন্ত্রের প্রক্রিয়াগত বিষয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

উভয় দৃষ্টিভঙ্গির অভ্যন্তরীণ গলদ

এই দুই অবস্থানের কোনোটিকে ত্রুটিমুক্ত ভাবা যায় না। প্রতিটির মধ্যে রয়েছে অভ্যন্তরীণ গলদ। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পূর্বশর্ত পূরণের ওপর জোর দেয়। তত্ত্বটি আধুনিকায়ন এবং পুঁজিবাদী বিকাশের ওপর ভর করে গড়ে উঠেছে এবং সেখানে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ইউরোপের পুঁজিবাদী বিকাশকে। পূর্বশর্তটি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না, সে প্রশ্ন থেকে যায়। কারণ উপনিবেশ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে। কিন্তু গণতন্ত্রের সঙ্গে তাকে আরও সংগ্রাম

করতে হচ্ছে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্টে। তার মধ্যে একটি হলো জাতি গঠন। এসব দেশে জাতি বিভেদ এবং ধর্ম বা গোত্রের সামাজিক অবস্থান এবং ভূমিকা নিয়ে মতভেদ আছে এবং সেগুলো আজও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। সে কারণে একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজ গড়ে তোলার পথে তারা এখনো অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এরই সঙ্গে রয়েছে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নসংক্রান্ত নানা বাধা-বিপত্তি, আধুনিকায়ন এবং পুঁজিবাদী বিকাশের মতো কঠিন চ্যালেঞ্জগুলো। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শক্তির অধীনে থাকার কারণে এসব সমস্যা একসঙ্গে পুঞ্জীভূত হয়ে ছিল এবং তাদের প্রতিটিকে আজ সমান্তরালভাবে মোকাবিলা করতে হচ্ছে, তাদের প্রতিটির সমাধান খুঁজে বের করতে হচ্ছে। ইউরোপের ক্ষেত্রে পরিস্থিতিটি একেবারে ভিন্ন ছিল। তাদের ইতিহাসে তারা প্রথমে জাতি গঠনপ্রক্রিয়া শেষ করে ১৬৪৮ সালের দিকে। তিরিশ বছর (১৬১৮-১৬৪৮) ধরে চলে আসা নানা জাতির মধ্যে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ইউরোপের জাতিগুলো তাদের ভৌগোলিক সীমানা নির্ধারণ করে এক একটি রাষ্ট্রের অধীনে আসে। জাতি গঠনপ্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর ইউরোপ সামাজিক এবং কাঠামোগত পরিবর্তনে মনোযোগী হয়। পরে বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের উদারবাদী মনোভাব মানুষের মননে প্রভাব ফেলে এবং উদারনীতির বিকাশ নিশ্চিত করে। তৃতীয় পর্যায়ে শিল্পায়ন এবং বৈজ্ঞানিক বিপ্লব ঘটে। তার পরেই আসে গণতন্ত্র। এই সমস্যাগুলোর প্রতিটির সমাধান খুঁজে বের করতে ইউরোপের হাতে যথেষ্ট সময় ছিল। তাদের সে সমস্যাগুলো একসঙ্গে আসেনি, এসেছে পর্যায়ক্রমে, ধাপে ধাপে।

এই ধরনের সুযোগ আমাদের দেশের ভাগ্যে জোটেনি। যে সমস্যাগুলো ইউরোপ দীর্ঘ সময় ধরে এবং পৃথক পৃথকভাবে মোকাবিলা করেছে, সেই সমস্যাগুলো আমরা মোকাবিলা করছি একসঙ্গে। ফলে যে ধাপে ধাপে গণতন্ত্রের পথ চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ওপর তাকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, সেটি সঠিক নয়। সেটি ইউরোপীয় অভিজ্ঞতাপ্রসূত চিন্তা। আমাদের দেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, তার অতীত ঔপনিবেশিক ইতিহাস এই পূর্বশর্তের জন্য উপযোগী নয়। Maya Chadda নামের একজন গবেষক তাঁর *Building Democracy in South Asia* গ্রন্থে এ ধরনের পূর্বশর্ত চাপিয়ে দেওয়াকে যুক্তিসংগত মনে করেননি। আর্থসামাজিক পূর্বশর্তসংক্রান্ত তত্ত্বটি সব ক্ষেত্রে যে কার্যকরী নয়, সেটি ভারতের উদাহরণ থেকে দৃশ্যমান। ভারতে গণতন্ত্র টিকে রয়েছে প্রায় ৭০ বছর ধরে। ভারত গণতন্ত্রের বিচারে বিশ্বে একটি উদাহরণ। অথচ দেশটি আজও একটি অনুন্নত দেশ হিসেবে পরিচিত হয়ে আছে। সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৪৭ সাল থেকে কোনো অর্থনৈতিক বা সামাজিক পূর্বশর্ত পূরণ না করেই। চীনের উদাহরণও এই পূর্বশর্তকে ভুল প্রমাণিত করে।

সেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রবল গতি নিয়ে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু ওই উন্নয়নের কারণে সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি (de Mesquita, Bruce Bueno and George Downs. 2005: 77-86)। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ঢালাওভাবে গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত হিসেবে ভাবা সঠিক নয়।

এলিট সমঝোতা তত্ত্বেও বেশ কয়েকটি দুর্বল দিক লক্ষ করা যায়। প্রথমত, এই তত্ত্ব গণতন্ত্রকে নিছক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখে। সেখানে গণতন্ত্রের প্রক্রিয়াগত দিকগুলো পালন করা মুখ্য লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রক্রিয়াগত দিক বলতে সঠিক সময়ে নির্বাচন হচ্ছে কি না, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে কি না, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকৃত কি না, রাজনীতিতে আপামর জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত কি না ইত্যাদি বোঝায়। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু রাখতে হলে সমাজে ক্ষমতার নানা কেন্দ্রের মধ্যে সমঝোতার প্রয়োজন হয়। সমাজে ক্ষমতার কেন্দ্রগুলো নানা সময়ে নানা কারণে গড়ে ওঠে। যে এলিট গোষ্ঠী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে, তারা প্রতিনিয়ত উদীয়মান রাজনৈতিক এবং সামাজিক শক্তির মুখোমুখি হয় এবং আন্তদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। সেই দ্বন্দ্বের মীমাংসা যদি শান্তিপূর্ণভাবে সম্ভব হয়, তাহলে বিবাদরত ক্ষমতার কেন্দ্রগুলো নিজেদের মধ্যে সমঝোতায় পৌঁছাতে পারে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দেশ শাসনে একমত হয়। এভাবে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করে গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা বহাল রাখা সম্ভব হয়।

অবশ্য এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির সঙ্গে একটি ভিন্ন পূর্বশর্ত যোগ করা হয়। তা হলো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণকে সীমিত রাখা। দাবিটি সুম্পিটার নামের একজন বিশেষজ্ঞের ব্যাখ্যা থেকে এসেছে। সে ব্যাখ্যায় তিনি গণতন্ত্রের এক সরলীকৃত এবং উপযোগবাদী সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে, গণতন্ত্রকে এমন একটি ব্যবস্থা হিসেবে দেখতে হবে, যা কিনা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হবে মাত্র। সেখানে ক্ষমতার পদপ্রার্থীরা প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনে অংশ নিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করবে (taken from Larry Diamond, 1999, page 8)। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অংশগ্রহণ এবং তাদের ভূমিকা রাজনৈতিক দল এবং নেতৃত্বের তুলনায় ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা এ ক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয়। সুম্পিটারের ধারণায়, গণতন্ত্র কোনো আদর্শ নয়, কোনো তত্ত্ব নয়। গণতন্ত্র একটি রাজনৈতিক পদ্ধতি, একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। সে ব্যবস্থার উদ্দেশ্য একটি প্রশাসনিক কাঠামো দাঁড় করানো এবং রাজনৈতিক, আইনি এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগুলো সে ব্যবস্থার অধীনে গ্রহণ করা। সুম্পিটার (Schumpeter, 1943, p. 242) গণতন্ত্রকে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কোনো মাধ্যম হিসেবে ভাবেননি। জনগণের দায়িত্ব বলতে তিনি ভোট দেওয়াকে

বুঝেছেন। ভোটারদের দায়িত্ব বলতে তিনি দেখেছেন সবচেয়ে ভালো পণ্যটি কেনা—পণ্য বলতে এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতা বা ব্যক্তিকে বোঝায়। ফলে গণতন্ত্রকে একধরনের বাজারে পরিণত করা হয়, যেখানে রাজনৈতিক দলের কর্তব্য হচ্ছে ওই বাজারকেন্দ্রিক প্রতিযোগিতাকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং নেতা নির্বাচন করা। অনেকে এই তাত্ত্বিক কাঠামোকে 'Classical doctrine' হিসেবে আখ্যায়িত করে তাঁর ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন (Pateman, C 1970:2)।

নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় তো বটে, বিশেষ করে দৈনন্দিন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে গণমানুষের অংশগ্রহণকে কেন সীমিত রাখতে হবে, তার পক্ষে যুক্তি আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ থেকে দূরে রাখা সম্ভব হলে বড় ধরনের মতবিরোধ থেকে পুরো শাসনব্যবস্থাকে দূরে রাখা সম্ভব হয়। সেটি অবশ্য পুরোপুরি অসত্য যে তা নয়। অনেক রাজনীতি বিশেষজ্ঞ লক্ষ করেছেন যেসব দেশে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে স্বৈরাচারের শক্তি ভিত থেকে গেছে। জার্মানিতে ভাইমার রিপাবলিক তার একটি উদাহরণ। ভাইমার রিপাবলিক গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল। ওই ব্যর্থতার কারণে জার্মানিতে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যুক্তিটি আরব বসন্ত নামে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে যে গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে, সে ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আরব বসন্ত কীভাবে গণতন্ত্রের বদলে নতুন করে স্বৈরশাসন বা গোত্র বিভক্তি ও সংঘাতকে উসকে দিল সেটি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য ভাবা যায়। এখানে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে মানুষের অভূতপূর্ব অংশগ্রহণ সত্ত্বেও গণতন্ত্র আজও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই তাত্ত্বিক ধারার আরও একজন প্রবক্তা রবার্ট ডাল (Dahl) জনবিচ্ছিন্ন গণতন্ত্রের আরও একটি মডেল প্রস্তুত করেছেন। তিনি তাঁর A Preface to Democractic Theory and Hirarchy, Democracy and Bargaining in Politics and Economics (১৯৫৬) তে গণতন্ত্রকে পলিয়ারখি হিসেবে দেখার উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর যুক্তি হলো গণতন্ত্র একটি রাজনৈতিক পদ্ধতি, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সাজানো একটি ব্যবস্থা। ওই ব্যবস্থায় নির্বাচনী প্রক্রিয়া প্রধান, কিন্তু সেই প্রক্রিয়ায় খুব কম সংখ্যক নেতাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দেওয়া উচিত। সে ক্ষুদ্র সংখ্যক নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে নেতৃত্ব নির্বাচন হিসেবে দেখবে মাত্র।

গণতন্ত্রের এই ধারণাটি উত্তরঙ্কালিন গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে বিশেষভাবে জনপ্রিয় করার চেষ্টা নেওয়া হয়। সেখানে দাবি হলো কয়েক দফা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে এবং কিছু উদারনৈতিক (লিবারেল) নীতি বাস্তবায়ন করা গেলে ওই সব দেশে গণতন্ত্র স্থায়ী রূপ নেবে। যুক্তিটি যে সঠিক নয় সেটি নানা উদাহরণ থেকে দেখা যায়। নির্বাচনকেন্দ্রিক গণতন্ত্রের এই ধারণায় প্রথমে সংকটে পড়ে পাকিস্তান।

সেখানে নওয়াজ শরিফের সরকারকে উৎখাত করে জেনারেল পারভেজ মোশাররফ ১৯৯৯ সালে সামরিক শাসন প্রবর্তন করেছিলেন। আরব বসন্ত এবং নানা রংবেরঙের বিপ্লব থেকেও এই ব্যর্থতার কিছু উদাহরণ পাওয়া যায়। উত্তর আফ্রিকার অনেক দেশে (লিবিয়া, মিসর, তিউনিসিয়া, ইয়েমেন) কয়েক দফায় নির্বাচন হওয়ার পরও সেসব দেশে গণতন্ত্র পাকাপোক্ত হয়নি, বরং সংকটে পড়েছে। দক্ষিণ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ওই একই প্রক্রিয়া লক্ষ করি। সেখানে বিপ্লবী উত্তেজনা থিতিয়ে পড়ার পর গণতন্ত্রের সংকট দেখা দেয়। এমনকি কিছু দেশ স্বৈরশাসনের দিকেও ফিরে যায়। চেকোস্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া ওই সংকট এড়িয়ে গেলেও উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, বেলারুশ বা টোগোর গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। ডানকার্ট রস্টো নামের একজন গবেষকের লেখায় এই ব্যর্থতার একটি ব্যাখ্যা মেলে। সেখানে তিনি এসব দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকালে সামাজিক অবস্থানকে আমলে না নেওয়াকে বিশেষ কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর *Transition to Democracy: Towards a Dynamic model* নামের গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপকে হুবহু অনুকরণ করে কোনো দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যর্থ না হয়ে পারে না। যে পথ ধরে ইউরোপ এবং আমেরিকায় গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে, সে পথ সার্বজনীন পথ নয়। ওই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন এফ প্লাটার নামের আরও একজন বিশেষজ্ঞ। সমাজনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গির ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি তাকে 'The Genetic Question' হিসেবে দেখার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মতে, গণতন্ত্রের শুরু বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অবস্থায় হতে পারে (Tyranny of starting conditions)। সে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক অবস্থানকে আমলে না নিয়ে কেবল নির্বাচনকে উৎসাহিত করে গণতন্ত্রের সংগ্রাম সফল হয় না। এ দাবির গুরুত্ব আমরা আরও লক্ষ করেছি আরব বসন্ত নামে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর। সেখানে প্রতিটি দেশে গণতন্ত্রের সংকট প্রকট হয়ে দেখা দেয়, যেটি ওই সব দেশের আর্থসামাজিক, ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত। উদাহরণ হিসেবে তিউনিসিয়াতে সরকার উৎখাতের আন্দোলনে গণতন্ত্রীদের সশস্ত্র যুদ্ধ করতে হয়নি। লিবিয়াতে যুদ্ধ করতে হয়েছে। যুদ্ধ শেষে লিবিয়ায় অস্ত্রের ঝনঝনানি মারাত্মক রূপ ধারণ করে। সেখানে প্রবল গোত্র বিভক্তির কারণে গণতন্ত্রের সম্ভাবনা অনেক সীমিত হয়ে পড়ে। সেটি অন্য কোথাও লক্ষ করা যায়নি। মিসরে ঐতিহাসিকভাবে মানুষ সামরিক বাহিনীর প্রতি অনেক বেশি সহানুভূতিশীল। কিন্তু তিউনিসিয়ায় ব্যাপারটি ভিন্ন। সেখানে মানুষ সামরিক বাহিনীকে ঘৃণা করে। ফলে গণতন্ত্রায়ণের ক্ষেত্রে মিসরীয় সামরিক বাহিনী অনেক বেশি ভূমিকা রাখতে সক্ষম। অন্যদিকে মিসরের তুলনায় তিউনিসিয়ায় ইসলামপন্থী এবং ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির মধ্যে ভারসাম্য থাকায় গণতন্ত্রের সম্ভাবনা

সেখানে অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু মিসরে ওই দুই শক্তির মধ্যে বিভেদ প্রকট হওয়ায় এবং ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির অভ্যন্তরীণ বিভেদ অন্যান্য দেশের চেয়ে প্রবল হওয়ার কারণে মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রার্থী মুরসি মাত্র ২৬% ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তিউনিসিয়ায় বিরোধী দল এনাদা পার্টি অনেক বেশি পশ্চিমাপন্থী থাকায় মিসরের তুলনায় সেখানে অবস্থাটি ভিন্ন রূপ নেয়। এই আর্থসামাজিক এবং শ্রেণি ও রাজনৈতিক গ্রুপসংক্রান্ত বৈচিত্র্যের কারণে প্রতিটি দেশের গণতন্ত্র কিছু birth defect নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। সে কারণে গণতন্ত্রকে কেবল পদ্ধতি হিসেবে দেখা সমীচীন নয়। আর্থসামাজিক বাস্তবতাবর্জিত কোনো গণতন্ত্র সফল হতে পারে না।

এলিট সমঝোতা তত্ত্বে আরও একটি দুর্বলতা হলো—ওই তত্ত্বে গণতন্ত্রকে শিল্প প্রতিষ্ঠান, ট্রেড ইউনিয়ন, রাষ্ট্র এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মতো আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের আন্তসম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা হয়। সমাজের স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত থাকায় সমাজের অভ্যন্তরে যে পরিবর্তনগুলো এখনো স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারণ করেনি, সেগুলোর প্রতি অবহেলা দেখানো হয়। সে কারণে প্রথাগত সামাজিক উপাদানগুলোকে উপেক্ষা করার বিশেষ প্রবণতা স্থান করে নেয়। এই উপেক্ষার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকে ধর্ম, জাতি, বর্ণপ্রথা, ধর্মীয় বিভেদ, এমনকি এক ধর্মের অভ্যন্তরীণ বিভেদ বা জটিলতা। আধুনিক সমাজে প্রথাগত উপাদানের মূল্য নিতান্তই নগণ্য এবং সাময়িক বলে ধরে নেওয়া হয়। তার কারণ সেখানে এলিট প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। প্রথাগত প্রতিষ্ঠানকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হয় না। মনোযোগটি থাকে নেতার ওপর, নেতৃত্বের ওপর এবং প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর। অথচ ওই প্রথাগত পরিবর্তনগুলো গণতন্ত্রের পথকে প্রসারিত করা অথবা বাধাগ্রস্ত করার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড ক্ষমতা রাখে।

পূর্বশর্তসংক্রান্ত যে দুটি তত্ত্ব এখানে আলোচনা করা হলো সে দুটি তত্ত্ব বাংলাদেশের বাস্তবতায় উপযোগী ভাবা কঠিন। তার দুটি কারণ রয়েছে। একটি কারণ হলো বাংলাদেশ আর্থসামাজিক পূর্বশর্তের কোনোটিই পূরণ করে না। রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক এলিট শ্রেণিও এমন পরিপক্ব কোনো শক্তিতে পরিণত হয়নি যে নিজেদের মধ্যে তারা সমঝোতা করে গণতন্ত্রের প্রাথমিক পূর্বশর্তগুলো বাস্তবায়নে উদ্যোগী হবে। দ্বিতীয় কারণ হলো, উভয় তত্ত্বের কোনোটিকে পৃথক পৃথকভাবে বাংলাদেশে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক এবং আর্থসামাজিক পূর্বশর্তকে গণতন্ত্রের একমাত্র পূর্বশর্ত ভাবা যায় না। আবার পাশ্চাত্য দেশের নির্বাচন পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাস্তব কোনো দিকনির্দেশক হতে পারে না। গণতন্ত্রকে অর্থবহ এবং কার্যকর করতে হলে দেশীয় আর্থসামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বাস্তবতাকে

উপেক্ষা করে বা তার শূন্যতায় গণতন্ত্র নিয়ে চিন্তা করা অবাস্তব। আবার গণতন্ত্রকে অর্থবহ করতে গেলে শুধু ওই আর্থসামাজিক এবং ঐতিহাসিক দিকের ওপর গুরুত্ব দিয়ে গণতন্ত্রের মৌলিক দিকগুলোকে উপেক্ষা করাও যুক্তিযুক্ত নয়। প্রয়োজন দুইয়ের ভারসাম্যপূর্ণ সমন্বয়। এখানে এই পূর্বশর্তের সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

প্রথম পূর্বশর্ত : আর্থসামাজিক এবং সাংস্কৃতিক

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে আর্থসামাজিক পরিবেশের কথা বলা হয় এবং তার পূরণকে পূর্বশর্ত হিসেবে ধরা হয় সে ধরনের পরিবেশ বাংলাদেশে বহুলাংশে অনুপস্থিত আছে। সে পূর্বশর্তগুলো পুরোপুরি পূরণ করতে গেলে বাংলাদেশকে আরও অনেক বছর অপেক্ষা করতে হবে। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে ধ্রুপদি পুঁজিবাদের এবং সে কারণে ধ্রুপদি গণতন্ত্রের সম্পর্ক নেই। ইউরোপীয় গণতন্ত্র যে ভিত বা সামাজিক কাঠামোর ওপর গড়ে উঠেছিল, সে ধরনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতা আমাদের এখানে অনুপস্থিত। যেটুকু পুঁজিবাদ আমাদের দেশে গড়ে উঠেছে তার অনেকটাই রাষ্ট্রের সহায়তায়। পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক পুঁজির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে এখানে পুঁজিবাদের প্রাথমিক কাঠামোটি গড়ে ওঠে। সেই অপরিপক্ব অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর একটি আধুনিক শাসনব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল স্বাধীনতার পর পরই। আজও বহুলাংশে একটি কৃষিভিত্তিক অনুন্নত সমাজ হিসেবে এখানে নাগরিক চেতনার প্রবল অভাব রয়েছে। গোষ্ঠী চেতনাভিত্তিক গ্রামীণ সমাজ পুরোনো আচার এবং ধর্মীয় চেতনা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। শিল্পায়ন এবং আধুনিকায়ন ঘটলেও তার সুফল গোটা সমাজে পৌঁছাতে পারেনি। মানুষের চেতনায় পরিবর্তন আনা দীর্ঘমেয়াদি এক ব্যাপার। এখানে নগরায়ণ যথেষ্ট দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হচ্ছে। কিন্তু নগরায়ণ এবং শিল্পায়ন যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম দিচ্ছে তাদের মন-মানসিকতায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বা আধুনিকতার প্রভাব তেমন পড়েনি। নগরায়ণের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের নিকট যোগসূত্র থাকে। স্বাধীনতার পর গ্রাম থেকে লাখ লাখ মানুষ শহরে এসে বাস করতে শুরু করে। হাজার হাজার মানুষ বড় শহরগুলোতে ভিড় জমায়, সেখানে আশ্রয় নেয় বেকারত্বের বোঝা লাঘব করতে। ১৯৭৪ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে এ দেশের শহুরে জনসংখ্যা বছরে ১০.৯% হারে বৃদ্ধি পেয়ে এসেছে (Eusuf 1996: 11)। ১৯৯৬ সালের হিসাবমতে, শহরের জনসংখ্যা আজ বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ২২.৪৫ (Eusuf 1996:20) শতাংশে পৌঁছেছে। এই প্রবৃদ্ধির শতকরা ৫৮ ভাগই গ্রাম থেকে আসা মানুষ (Islam 1996:55)। সাইক্লোন, বন্যা, নদীভাঙনের মতো

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং কর্মসংস্থানের আকর্ষণে গ্রাম ত্যাগ করে শহরে আশ্রিত এই লাখ লাখ মানুষ এক নতুন শ্রেণির জন্ম দিচ্ছে। রাজধানী এবং দেশের প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা ১৯৭৪ সালের মধ্যেই প্রায় ২ মিলিয়নে (Eusuf 1996:20) পৌঁছে গিয়েছিল। ১৯৯১ সালে সেটি আরও বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪ মিলিয়নে (Eusuf 1996:20)। এই প্রবৃদ্ধির প্রবণতা শহরের জনসংখ্যাকে মোট জনসংখ্যার ২১ শতাংশে নিয়ে পৌঁছে দেয়। অভিবাসনের ফলে বাংলাদেশের ৪০ শতাংশ নগরায়ণের উন্নতি ঘটেছে ১৯৭৪ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে। এক ঢাকা শহরেই নগরায়ণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৪%। চিটাগাং ৪৩%, খুলনা ৭৩%, নারায়ণগঞ্জ ১৭%, ময়মনসিংহ ২৫% এবং রাজশাহী ৩৬% (নজরুল ইসলাম ২০০৩, পৃষ্ঠা ১৩০)। কিন্তু শহুরে মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক ও মনস্তত্ত্বগত বিবর্তন এই পরিবর্তনের সঙ্গে সমানতালে চলেনি।

বেশ কয়েকটি কারণে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে গণতন্ত্রের যোগসূত্র থাকে। অর্থনৈতিক অগ্রগতি শিক্ষিত পেশাজীবী মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। সেটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। এখানে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, মানুষ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু গণতন্ত্রের মর্মবাণী উপলব্ধি করার সুযোগ আজও সীমিত হয়ে আছে। শিল্পায়ন জাতীয় সম্পদ উৎপাদনের প্রধান মাধ্যম না হলেও অর্থনীতি চাঙা থাকার কারণে মানুষের হাতে অর্থ সঞ্চিত হচ্ছে। জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম হচ্ছে। কিন্তু শহরে যারা নাগরিক জীবন যাপন করে তাদের মন-মানসিকতায় যে ধরনের কসমোপলিটান বা উদার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার কথা সেটি স্থানীয় নানাবিধ কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংগঠন করার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হওয়ার ফলে মধ্যবিত্তের মানসিক ক্ষুধা পূরণের যে প্রেক্ষাপট তৈরি হয় সেটি এখানে এখনো অনেকটা সুপ্ত। রাজনৈতিকভাবে মানুষ সচেতন হলেও গণতন্ত্রের দাবি আদায়ে, দেশকে নৈতিকভাবে শাসনের প্রয়োজনসংক্রান্ত চেতনাগত দিকগুলো রাজনৈতিক দলের মানসিক পশ্চাৎপদতা এবং সংঘাতপ্রবণতার কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

যে উদার দৃষ্টিভঙ্গি গণতন্ত্রের পথকে সুগম করে সেটি ঐতিহাসিক কারণে সামনে এগিয়ে যেতে পারেনি। আমাদের অবস্থাটি ভারতের সঙ্গে তুলনা করে কিছুটা হলেও বোঝা সম্ভব। ভারত স্বাধীন হয়েছে পাকিস্তানের সঙ্গেই, বস্তুত পাকিস্তানের এক দিন পরে। কিন্তু পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ উভয়েই দীর্ঘ সামরিক শাসনের অধীনে কাটিয়েছে। আজও তারা প্রকৃত গণতন্ত্রে পৌঁছাতে পারেনি। ভারত পেরেছে। ভারতে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক শ্রেণি উদারনীতিবাদের ওপর গড়ে ওঠে। সেখানকার রাজনীতিবিদদের অনেকেই ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করেছেন।

তাঁরা উপনিবেশব্যবস্থাকে অবৈধ মনে করলেও তাকে ধ্বংসের লক্ষ নিয়ে রাজনীতি করেননি। তার সংস্কারের পক্ষে মত দিয়েছেন। তাকে দেশীয় রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সেকালের ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে দুটি ধারা ছিল। একটি উদারনীতিবাদী, অন্যটি উগ্র। ব্রিটিশ শাসকেরা ভারতে উদারনীতিকে প্রশ্রয় দিয়েছে। উগ্র ধারাকে নিপীড়ন করেছে। সে কারণে পাড়া-মহল্লা পর্যায়ে ভারতে স্থানীয় গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছিল। ব্রিটিশেরা ওই সব প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভর করে উগ্রবাদী জাতীয়তাবাদকে ঘায়েল করার সহজ পথ গ্রহণ করেছিল। তাতে করে ওই সব সংগঠনকে আধুনিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল। সেখানে সদস্যপদের ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক উপায়ে কর্মকর্তা নির্বাচনের ঐতিহ্য অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিল।

একই সঙ্গে গণতন্ত্রের সঙ্গে উদারনীতিবাদী দর্শনের যে যোগসূত্র থাকে তার অন্তত কিছুটা বাংলা যে শেখেনি তা নয়। সেটি ঘটেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে, রেনেসাঁ আন্দোলনের সময়। ওই সামাজিক এবং দার্শনিক আন্দোলন মানুষের মধ্যে সম-অধিকারের দাবির স্বীকৃতি দিয়েছিল। অবিভক্ত বাংলা কিছুটা শিখলেও ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ইংরেজি শিক্ষা থেকে নিজেকে দূরে রাখার কারণে মুসলমান সম্প্রদায় ওই আন্দোলনের মর্মবাণীকে আত্মস্থ করেনি। ফলে গোষ্ঠী হিসেবে ওই আধুনিক জ্ঞানপ্রবাহ তার ওপর বিশেষ কোনো প্রভাব ফেলেনি। ওই আধুনিক গণতান্ত্রিক চিন্তা পুরোটাই আত্মস্থ করেছিল বাংলার হিন্দু সমাজ। ইংরেজি শাসকদের সহায়তায় রাজা রামমোহন রায়ের মতো মানুষ সতীদাহ নিবারণ করেছিলেন। তাদেরই প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্য ও দর্শনে উদারনীতির নানা ধারা এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতি স্থান করে নিয়েছিল। দার্শনিক বা রাজনৈতিক দর্শনের ক্ষেত্র হলেও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে এই ব্যক্তিস্বাধীনতার মন্ত্র, যা উপনিবেশ প্রভুর কাছ থেকে শেখা, স্বাধীনতার দাবিকে যৌক্তিক রূপ দিতে সাহায্য করেছিল। ব্রিটিশ উপনিবেশ শাসকেরা বাংলাকে যা শিখিয়েছে, তা দিয়েই বাংলা ব্রিটিশ শাসনকে ভারতবর্ষ থেকে বিদায় দিয়েছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি অনুগত থেকে। অথচ মুসলিম সমাজকে গণতান্ত্রিক এবং উদারনীতিভিত্তিক করে গড়ে তোলার জন্য যেসব সংস্কারের প্রয়োজন (নারীর অধিকার) ছিল, সেগুলো না করে মোগল সাম্রাজ্যের পতনে অশ্রু বিসর্জন করেই মুসলমান সমাজ সময় কাটিয়েছে। অর্থাৎ গণতন্ত্রের সঙ্গে বাংলার পরিচিতি উপনিবেশ প্রভুদের থেকে, নিজের উৎস থেকে আসেনি যদিও, সেই পরিচিতির জগৎটি খণ্ডিতভাবে হিন্দু সম্প্রদায়কে উপকৃত করেছে। সমস্যাটা ওখানেই রয়ে গেছে। বাংলাদেশে এমন একটি সমাজবাস্তবতা গড়ে উঠেছে, যেখানে গণতান্ত্রিক আদর্শের আধ্যাত্মিক বা মানসিক ভিত অনুপস্থিত।

তবে এখানে উদারনীতিবাদ যে একেবারে বিকশিত হয়নি, সেটি সঠিক নয়।

একটি বিশেষ ক্ষেত্রে ওই উদারনীতি বাস্তবায়নের সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সেটি ঘটেছে কেবল অর্থনীতিতে। প্রবণতাটি অনেকটা লাতিন আমেরিকার মতো করেই বাংলাদেশে ঘটেছে। অ্যাডাম স্মিথের পরামর্শে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরকারের হস্তক্ষেপ এড়িয়ে যাওয়ার কথা রয়েছে, শিল্প উৎপাদনকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখতে হবে, বাণিজ্যে কোনো বাধা থাকবে না, শুল্কের ঝামেলা থাকবে না। মুক্ত বাণিজ্য বা ফ্রি ট্রেড বিশেষ গুরুত্ব পাবে। এই মুক্ত প্রতিযোগিতা, মুক্ত বাণিজ্য এবং মুক্ত উৎপাদনের পরিবেশ সৃষ্টি করে পুঁজিপতিরা প্রচুর মুনাফা লাভ করতে সক্ষম হয়। বিগত বছরে বিশ্ব অর্থনীতিতে এই ধরনের একটি অর্থনৈতিক কাঠামো দৃঢ়ভাবে স্থান করে নিয়েছে। নিও লিবারেল অর্থনীতির চমকে লাতিন আমেরিকায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে। সেখানে শিল্পের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার জন্য deregulate-এর কথা বলা হয়েছিল। উপদেশ ছিল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে ব্যক্তি খাতকে যতদূর সম্ভব মুক্ত রাখা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং বিনিয়োগকে উদার করা, মূল্য নিয়ন্ত্রণ থেকে দূরে থাকা, পুঁজির স্বাধীন এবং বাধাহীন বিকাশ নিশ্চিত করা ওই উদারনীতিকরণের প্রধান প্রধান দিক। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে শিল্পপ্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর করা, সামাজিক সংযমের কথা বলে শ্রমকে নিয়মনীতির বাঁধনমুক্ত করে তাকে পুঁজিপতি এবং বহুজাতিক করপোরেশনের ওপর নির্ভরশীল করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই প্রবণতা আজ সারা বিশ্বে ঘটে চলেছে। চিলির আলেন্দে সরকারকে উৎখাত করার পর জেনারেল পিনোচেট বিখ্যাত নব্য লিবারেল এবং বাজার অর্থনীতির বিশেষ প্রবক্তা মিলটন ফ্রিডম্যানকে সে দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ অবশ্য অত বড় মাপের কোনো অর্থনীতিবিদকে আনেনি। কিন্তু উভয় দেশেই সামরিক শাসন ওই নব্য উদারনীতি বাস্তবায়ন করেছে জাতীয় অর্থনীতির প্রধান কৌশল হিসেবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালের সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষণকে বাতিল করে নিও লিবারেল নীতিতে দেশকে টেনে আনার জন্য সামরিক অভ্যুত্থানের প্রয়োজন হয়েছিল। এই সামরিক শাসন বিভিন্ন ধারায় ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত টিকে থাকে। এই সময়কালে দেশের অর্থনীতি ধীরে ধীরে বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। পর্যাপ্ত পরিমাণ সস্তা শ্রমের কারণে এ দেশে পোশাকশিল্প গড়ে ওঠে। সে সঙ্গে অন্যান্য শিল্প রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়। সেগুলো পর্যায়ক্রমে ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর করা হয়। ১৯৭৭ সাল থেকে শুরু করে পোশাকশিল্প এক বিশেষ শিল্পে পরিণত হয়। এই নিও লিবারেল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অর্থনীতিকে উদার করলেও বাকি সমাজে উদার মনোভাবের বিস্তার ঘটেনি। বরং অর্থনীতির সঙ্গে মানুষের মূল্যবোধগত অসামঞ্জস্য আরও প্রকট হয়েছে।

পরিণতিতে এখানে জন্ম নিয়েছে ক্রনিক ক্যাপিটালিজম। এই বিশেষ পুঁজিবাদের অধীনে এসে রাজনীতি সংঘাতের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্র রাজনৈতিক দল, দলীয় আনুগত্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে সমাজের মূল্যবোধকে ধ্বংস করছে। এ ধরনের আর্থসামাজিক পরিবেশ গণতন্ত্রের জন্য উপযোগী না হওয়ায় বাংলাদেশ গণতন্ত্রের ওই পূর্বশর্ত পূরণ করে না।

দ্বিতীয় পূর্বশর্ত : এলিট সমঝোতার তত্ত্ব

বাংলাদেশের এলিট শ্রেণি আজও সমঝোতার রাজনীতিতে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেনি। সে কারণে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আজও এখানে শক্ত ভিতের ওপর স্থানীভাবে দাঁড়াতে সংগ্রাম করছে। দেশে নিরপেক্ষ নির্বাচনপদ্ধতি গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। এলিট শ্রেণির নিজস্ব অপারগতার পাশাপাশি কিছু ঐতিহাসিক কারণও রয়েছে। ওই ঐতিহাসিক কারণের মধ্যে গণতন্ত্রের স্থায়ী ঐতিহ্যের অভাবকে উল্লেখ করা যায়। দেশ বিভাগের আগে ইংরেজের অধীনে বাংলায় দু-একটা নির্বাচন হয়েছে, যদিও সেগুলো স্থানীয় পর্যায়ের ছিল। ১৮৮০ সাল থেকে ব্রিটিশ শাসন আংশিকভাবে হলেও স্থানীয় পর্যায়ে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করেছিল। ১৯৩৬ সালে ভারতের ১১টি প্রদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই প্রদেশগুলোর মধ্যে বাংলা অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে নির্বাচনে কংগ্রেস পার্টি সবচেয়ে অধিক সংখ্যক আসন দখল করে। এরপর ১৯৩৫ সালের নির্বাচন এবং সবশেষে ১৯৪৬ সালে আরও একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সাল এবং ১৯৪৬ সালে কংগ্রেস পার্টি স্থানীয় পর্যায়ের শাসন অভিজ্ঞতাকে প্রাদেশিক পর্যায়ে উন্নীত করে। এই নির্বাচন ও গণতন্ত্রায়ণকে কংগ্রেস দল গুরুত্ব দিয়ে দেখেছিল। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক চালু করা প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানগুলোকে তারা ভারতীয়করণ করে, রাজনৈতিক দল গঠন করে, পার্লামেন্টে পিটিশন জমা দেওয়া, ব্রিটিশ প্রদত্ত কাউন্সিলগুলোতে অংশগ্রহণ করা, আইনের প্রতি সম্মান দেখানো—এসবই ভারতীয় কংগ্রেস দলকে গণতন্ত্রের দীক্ষায় দীক্ষিত করতে সাহায্য করে। গান্ধীর নেতৃত্ব এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। তিনি ব্রিটিশ প্রদত্ত আইন বাতিল দাবি করেননি, যদিও তাকে লঙ্ঘন করেছেন।

অবিভক্ত ভারতের অধীনে থেকেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই ঐতিহ্য তেমন কোনো প্রভাব রাখেনি। পাকিস্তানের অধীনে এসে ওই ব্যবস্থার বরং ক্ষয় লক্ষ করা গেছে। শুরু থেকেই পাকিস্তানে গণতন্ত্র নিয়ে অন্ধকার আবছায়া পরিবেশ বিরাজ করেছে। ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হয়েছিল বটে। কিন্তু তার ফলাফল পাকিস্তানি শাসকদের কাছে জুতসই মনে না হওয়ায় খোঁড়া অজুহাত

দেখিয়ে তার ফলাফল বাতিল করা হয়। এরপরের অবস্থা আরও নিদারুণ। শাসনতন্ত্র স্থগিত রেখে সামরিক শাসন আসে। আইয়ুব খানের বনিয়াদি গণতন্ত্র চালু হয়। এসব ওলটপালট দেখতে দেখতে আমাদের স্বাধীনতা এসে যায়। স্বাধীন হয়েও বাঙালির ভাগ্যে গণতন্ত্র মেলেনি। তিন বছর যেতে না যেতেই একদলীয় শাসন প্রবর্তন হয়। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত বিভন্ন ফ্রেমে সামরিক শাসন বজায় থাকায় সে সময় গণতন্ত্র বিকশিত হয়নি। সামরিক বাহিনীর অধীনে নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা নিতান্তই নগণ্য ছিল। প্রায় এক যুগ ধরে টিকে থাকা জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসনের পতন ঘটার পর ওই সালে নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে সতেরো বছর ধরে টিকে থাকা অগণতান্ত্রিক রাজনীতির (১৯৭৫-১৯৯০) সমাপ্তি ঘটে। জেনারেল এরশাদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের শর্ত মেনে নেয়। ১৯৯১ সালে সুস্থ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৬ এবং ২০০১ সালেও একইভাবে সফল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ২০০৭ সালে নির্বাচনপূর্ব ব্যাপক বিশৃঙ্খলার কারণে সেনাশাসিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহন করে। অবশেষে ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ সালে নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এসবের পরও নিরপেক্ষ নির্বাচনসংক্রান্ত জটিলতা কাটেনি। নির্বাচনী নিরপেক্ষতা নিয়ে ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা এবং সহিংসতা দেখা দেয়। তার একটি কারণ ছিল পঞ্চদশ সংশোধনী। ওই সংশোধনী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগের নীতি বাতিল করে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সেটি সংসদে পাস করা হয় বটে। কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের অধীনে নির্বাচন কতটুকু নিরপেক্ষ হতে পারে তা নিয়ে জনমনে সন্দেহ থেকে যায়। স্বাধীন হওয়ার পর যে চার দশকেরও বেশি সময় কেটে গেছে সে সময়টি ঐতিহাসিক বিচারে স্বল্প হতে পারে। কিন্তু তা হলেও এই নির্বাচনসংক্রান্ত ব্যর্থতার কারণে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে গণতন্ত্রের গ্রে এরিয়া বা ধূসর অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

এলিট সমন্বয় গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে আরও একটি বড় বাধা হচ্ছে জাতীয় ঐক্য। রাজনৈতিকভাবে দ্বিধাবিভক্ত এবং সে কারণে ঐক্যহীন হয়ে এলিট শ্রেণি এবং রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব এখানে ঐক্যবদ্ধ কোনো রাজনৈতিক সমাজ গড়ে তুলতে পারেনি। জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এলিট শ্রেণির সামনে তিনটি পথ খোলা ছিল। একটি পথ জাতীয়তাবাদী আদর্শকে ব্যবহার করা। স্বাধীনতার প্রাক্কালে ওই আদর্শ জাতীয় ঐক্যের একটি ভিত তৈরি করে দিয়েছিল। কিন্তু ওই ঐক্য পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক ঐক্যে পরিণত হয়নি। ১৯৬৫ থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে দুই অর্থনীতি ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ আমাদের সংস্কৃতিকে ঘিরে শক্তিশালী হয়। সেখানে বাংলা ভাষা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

ভাষাসৈনিকদের অবদানকে কাজে লাগিয়ে বাঙালি জাতির মনে আবেগ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। সেই আবেগ বাঙালি জাতিকে অনুপ্রাণিত করে। ঐক্য এবং প্রতিরোধের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে আরও বিশেষ ভূমিকা রাখে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলার বীরত্বের গাথা, প্রীতিলতার আত্মদান, খুদিরামের বীরগাথা, জাতির অতীত ইতিহাস, পৌরাণিক গল্প, বীরত্ব অর্থাৎ আমাদের পূর্বপুরুষদের অতীত ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের সাহিত্য এখানে কম ভূমিকা পালন করেনি। এসব মিলিয়ে এখানে সৃষ্টি হয়েছিল জাতীয় ঐক্য। কিন্তু ওই ঐক্য বেশি দিন টেকেনি। একই সঙ্গে মুজিববাদ নামে এক রাজনৈতিক তত্ত্ব দিয়ে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ার চেষ্টা হয়। সেটি ব্যর্থ হয়। শেখ মুজিবের পর যারা ক্ষমতায় আসে তারাও ১৯৭৫ থেকে ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে আদর্শের ওপর ভর করে নানা প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। কিন্তু সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। জেনারেল জিয়াউর রহমানের বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে ওই একই পরিণতি ঘটে। ১৯৮১ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে স্বৈরশাসনের সময়কালে কোনো আদর্শিক নকশা জাতিকে উপহার দেওয়া না গেলেও জেনারেল এরশাদের মূল লক্ষ্য ছিল একটি ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক গোষ্ঠী গড়ে তোলা। অন্যান্য উপনিবেশশাসিত দেশেও এভাবে রাজনৈতিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। আফ্রিকায় তাঞ্জানিয়ার প্রেসিডেন্ট (১৯৬১-১৯৮৫) নিয়েরেরে উজামা সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে ওই ধরনের রাজনৈতিক সমাজ গঠন করতে চেয়েছিলেন। কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট জোমো কেনিয়াত্তা (১৯৬৩-১৯৭৮) হারাম্বি (Harambee) নামে একটি আদর্শ দিয়ে ওই রাজনৈতিক বাঁধন সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। কঙ্গোর প্রেসিডেন্ট মবুতু (১৯৬৫-১৯৯৭) তাঁর দেশে 'authenticite' নামে এক আদর্শের সহায়তায় ওই একই প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন। একটি সাহিত্যিক এবং রাজনৈতিক আদর্শ হলেও আফ্রিকায় আরও অনেক রাষ্ট্রপ্রধান Negritude নামের আদর্শ দিয়ে ওই একই প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক সমাজ গড়ার বদলে প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মতো করে তারা একধরনের কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র (monopoly state) গড়ে তোলেন।

জাতীয় ঐক্যের লক্ষ্যে বাংলাদেশ আরও একটি ব্যর্থ পথ অনুসরণ করে। সেটি ছিল দেশটিকে একটি আধুনিক সমাজে পরিণত করা, আধুনিকায়নকে ব্যবহার করে একধরনের নতুন সামাজিক সংহতি গড়ে তোলা। কিন্তু সেটিও সফল হয়নি। আদর্শতাড়িত এবং অর্থনৈতিকভাবে অকার্যকর হওয়ায় বাংলাদেশের এলিট শ্রেণি এ ক্ষেত্রেও ব্যর্থ হয়। এরই পাশাপাশি নব্য মার্ক্সবাদী চিন্তার সহায়তায় রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা হয়। সেখানে বাংলাদেশকে তার পূর্বের ঔপনিবেশিক শক্তি ব্রিটেন, আমেরিকা বা পাকিস্তানের বাঁধন থেকে মুক্ত করা এবং স্বনির্ভর শিল্পায়নের পথনির্দেশ করা হয়। ওই শিল্পায়ন দিয়ে নতুন সংহতি গড়ে তোলার

প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

জাতীয়তাবাদের এই ব্যর্থতার কারণে এখানে ধর্মের আশ্রয় নিয়ে একটি গোষ্ঠীর উত্থান ঘটে। তারা প্রথম থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে দ্বিমত পোষণ করে তার বিরোধিতা করে এসেছে। তাদের সংহতি ছিল ঔপনিবেশিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি অনুগত এই শক্তি পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা এবং স্বাধীনতাকে ঘোর বিরোধিতা করে এসেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাদের কার্যকলাপ কিছুটা স্তিমিত থাকলেও পরবর্তী সময়ে ধর্মকে মূলধন করে পুনরায় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ শুরু করে। এর ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিপরীতে মুসলিম জাতীয়তাবাদের সংঘর্ষপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে জাতীয় ঐক্য ব্যাহত হয়েছে।

রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলার জন্য একটি পথ হলো সমগ্র জাতিকে একটি বিশেষ শাসনকাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা এবং সেই কাঠামোর ন্যায়সংগত তা প্রমাণ করে জাতীয় মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত করা। সে ধরনের ঐক্য সম্ভব ছিল রাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতিতে নিরপেক্ষ গণপ্রতিনিধি নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে সন্দেহমুক্ত রাখা। গণমানুষের প্রতিনিধিত্ব কতটুকু নিশ্চিত হচ্ছে, ওই প্রতিনিধিত্বের কাজটি কতটুকু সুস্থভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হচ্ছে বা সেটি কতটুকু কার্যকর বা সমস্যামুক্ত, সেটি গুরুত্বপূর্ণ। তার অর্থ হলো সময়মতো নির্বাচন হচ্ছে কি না, সব মানুষের ভোট দেওয়ার অধিকার নিশ্চিত হলো কি না, নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ কি না, মানুষের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে কি না, মানুষ বিনা দ্বিধায় সংগঠিত হতে পারে কি না, ইচ্ছা অনুযায়ী রাজনৈতিক সংগঠনে যোগ দিতে পারে কি না, রাজনৈতিক দল তাদের মেনিফেস্টো প্রচারে বাধার সম্মুখীন হয় কি না, বিচার বিভাগ স্বাধীন কি না ইত্যাদি শর্তকে ধরে নিয়ে গণতন্ত্রের সাবলীলতাকে বিচার করা হয়। এগুলো যদি পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হতো, তাহলে ওই রাজনৈতিক ঐক্যের প্রধান একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করা সহজ হতো। কিন্তু নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রশ্নে রাজনৈতিক এলিট ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৯১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের পর পর দুটি নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় নির্বাচন আপেক্ষিক অর্থে নিরপেক্ষ হলেও সংকট শুরু হয় ২০০৭ সাল থেকে। বিধি অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হন রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি। কিন্তু ২০০৭ সালের নির্বাচনের ঠিক আগমুহূর্তে এমন একজন প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করা হয়, তিনি ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রতি অনুগত ছিলেন। নির্বাচন কমিশনের প্রধানের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। প্রশ্ন ওঠে ভোটার তালিকা নিয়ে। বিভিন্ন জেলা প্রশাসকের পদে দলের প্রতি সহানুভূতিশীল এমন

লোকদের নতুন দায়িত্ব দেওয়ার প্রশ্নে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। ভোটার তালিকায় ভুয়া ভোটারের সংখ্যা কয়েক কোটিতে দাঁড়ায়। এসব কারণে বিরোধী দলের নেতৃত্বে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। সামরিক বাহিনীর সহায়তায় এক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাকে পাশ কাটিয়ে সামরিক শাসনের অধীনে ২০০৭ সালে নির্বাচন হয়। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ সরকার দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা ব্যবহার করে জাতীয় সংসদে সংবিধানের ১৫তম সংশোধনী আনে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করা হয়। নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সবচেয়ে কার্যকর পথ কোনটি, তা নিয়ে আজও বিতর্কের শেষ হয়নি। ৫ জানুয়ারি ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ওই নিরপেক্ষতার প্রশ্ন পুনরায় উত্থাপিত হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পুনঃপ্রবর্তন এবং তার অধীনে নির্বাচনের দাবিতে বিরোধী দল নির্বাচন বয়কট করে। সেই উত্তেজনা ও সংঘাতপূর্ণ মানসিকতা আজ দেশের পরিস্থিতিকে জটিল করে রেখেছে। নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে। রাজনৈতিক ঐক্যের কোনো ভূমিতল তৈরি হয়নি।

সেই সঙ্গে তৃতীয় পথ ছিল রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাকে গণমুখী করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশে জনসেবার প্রশ্নটিকে কখনো গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়নি। সে কারণে গণপ্রতিনিধিদের দৃষ্টি জনকেন্দ্রিক নয়, বরং তা থেকে দূরে। জনগণের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক কেমন হবে, তার অনেকখানি নির্ভর করে দেশের আমলাতন্ত্রের ওপর। তারাই সরকারের নির্বাহী ক্ষমতা বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকে এবং তারা সরকারের নীতি বাস্তবায়ন করে। কিন্তু বিগত বছরগুলোতে জনগণ ও সরকারের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐক্য গড়ে ওঠেনি। সেটি কেন হলো তার একটি কারণ নির্বাচিত প্রতিনিধির সঙ্গে অনির্বাচিত আমলাতন্ত্রের আন্তসম্পর্কের ধরনে নিহিত। বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয়, তখন দেশ আমলাতন্ত্র এবং সামরিক বাহিনীর হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে। সদ্য স্বাধীন একটি দেশে আমলাতন্ত্র এবং সামরিক বাহিনী তুলনামূলকভাবে সংগঠিত শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক দুরবস্থা, সংগঠনের অভাব, নেতা-কর্মীর নৈতিক স্খলন, লুটপাট এবং সম্পদ আহরণ মুখ্য তৎপরতায় পরিণত হওয়ায় জনগণ থেকে সরকার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীও তাদের দক্ষতা, বিচারবুদ্ধি এবং সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। এসব কারণে দেশীয় অনভিজ্ঞ বুর্জোয়া বা ভূস্বামী শ্রেণি রাষ্ট্রের উপরিকাঠামোর সবচেয়ে দুর্বল অংশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং অতিমাত্রায় উন্নত উপরিকাঠামোর বাকি অংশের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে। উপনিবেশ-উত্তর সমাজে উপরিকাঠামো কেন শক্তিশালী ও অগ্রসর হয়, তার একটি ব্যাখ্যা হামজা আলাভির রচনায় পাওয়া যায়। সেখানে তিনি ঔপনিবেশিক শাসনের চরিত্রকে দায়ী করে

দেখিয়েছেন শোষণযন্ত্রকে চালু রাখার জন্য ওই শাসন একটি উন্নত আধুনিক উপকরণে সজ্জিত রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলে। শোষণ-প্রক্রিয়াকে সুসংগত করা, শোষণের শাখা-প্রশাখাগুলোকে অভিন্ন এক নেটওয়ার্কের আওতায় আনার দায়িত্ব সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের ওপর ন্যস্ত হয়। সামরিক বাহিনী জনগণের ক্ষোভকে নিয়ন্ত্রণে রেখে শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করে, অন্যদিকে শোষণের ধারাবাহিকতাকে প্রশাসনিক উপায়ে টিকিয়ে রাখা, তাকে যৌক্তিক রূপ দেওয়ার দায়িত্ব পড়ে আমলাতন্ত্রের ওপর। ওই শাসন থেকে মুক্ত হয়ে যখন নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়, তখন আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনী দক্ষতা এবং সাংগঠনিকভাবে সবচেয়ে গোছালো শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্র বা সামরিক বাহিনী কী অবস্থান দখল করবে, সমাজের বাকি শ্রেণিকাঠামো থেকে নিজেকে কতটুকু পৃথক করে স্বাধীনভাবে তার অবস্থানকে সুসংগত করবে, তা বুর্জোয়া শ্রেণির আপেক্ষিক শক্তি কতটুকু তার ওপর নির্ভর করে। নির্ভর করে নিজের অবস্থানকে পাকাপোক্ত করতে সে কতটুকু পারদর্শী, আমলাতন্ত্র ও সামরিক শক্তিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে কতটুকু সক্ষম।

বাংলাদেশে অনির্বাচিত আমলাতন্ত্রের সঙ্গে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির সম্পর্ক অধস্তনের। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশ শাসনে কতটুকু উপযোগী, সেটি আমলাতন্ত্রের কাছে প্রশ্ন হিসেবে রয়ে গেছে। যারা রাজনীতির সঙ্গে আজ যুক্ত আছেন, তাঁদের অধিকাংশ কেবল শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে নয়, দেশ শাসনে অকার্যকর, দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, অদক্ষ, ধোঁকা দেওয়ায় পারদর্শী। সে কারণে এখানে নির্বাচিত প্রতিনিধি ও আমলাতন্ত্রের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষমতাগত ভারসাম্য নির্বাচিত প্রতিনিধির বদলে আমলাতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়লে গণতন্ত্রের বিকাশ সেসব দেশে বাধাগ্রস্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। সামুয়েল হান্টিংটন দেখিয়েছেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ইরাক, ইরান, সৌদি আরব, লিবিয়া বা ওমানের অর্থনীতি তেল রপ্তানির ওপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে সেখানে রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের ভূমিকা ও প্রভাব প্রবল। সে কারণে সেখানে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটেনি, জন্ম হয়েছে আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের। পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার ভিত্তিতে পরিচালিত অর্থনীতির মূল কান্ডারি আমলাতন্ত্র। সেখানেও গণতন্ত্রের অভাব রয়েছে (Sameul Huntington 1991:1)। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি অনির্বাচিত আমলাতন্ত্রের ওপর কতটুকু নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে, সেটি আরও নির্ভর করে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের কর্মদক্ষতা ও জনসমর্থনের ওপর। সেদিক থেকে ভাবলে রাজনৈতিক দলের ইতিহাস, তার গণমুখী চরিত্র, মাঠপর্যায়ে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের ধরন কেমন তার ওপর নির্ভর করে গণতান্ত্রিক বিকাশের প্রকৃতি এবং আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ ও গণমুখী করার ক্ষমতা।

ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের একটি তুলনা এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। ওই দুই দেশের গণতান্ত্রিক ভাগ্যের ক্ষেত্রে মৌলিক পার্থক্যটি রয়ে গেছে মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেস পার্টির মধ্যে আমলাতন্ত্রকে কে কতটুকু নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছিল তার ওপর। অখণ্ড ভারতে মুসলিম লীগ ব্যাপক জনসমর্থিত কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না। এ দলটি গড়ে উঠেছিল এলিট শ্রেণি থেকে আসা প্রতিনিধি দিয়ে। সে কারণে জনসংযোগের ক্ষেত্রে মুসলিম লীগের যথেষ্ট দুর্বলতা ছিল। এমনকি যেসব প্রদেশ এবং আঞ্চলিক এলাকায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা লক্ষ করা গিয়েছিল, সেখানেও মুসলিম লীগের গণভিত্তি দীর্ঘকাল অনুপস্থিত ছিল। কংগ্রেস সে তুলনায় ভিন্ন চরিত্রের একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পেরেছিল। জাতি, বর্ণ, প্রদেশ এবং আঞ্চলিকভাবে বিভক্ত হলেও ভারতীয় কংগ্রেস নিজেকে সব ধরনের জনগোষ্ঠীকে অভিন্ন ভারতের (রাজনৈতিক ও ভৌগোলিকভাবে) প্রতিনিধি হিসেবে পরিচিত করে। ফলে দেশ বিভাগের পর কংগ্রেসের পক্ষে কিছুটা হলেও আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীর ওপর একধরনের কর্তৃত্ব স্থাপন করা সহজ হয়েছিল। ফলে ভারতে স্বৈরতান্ত্রিক আমলাতন্ত্রের বিশেষ কোনো প্রভাব লক্ষ করা যায়নি। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ভিন্ন ছিল। সেখানে সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র গণপ্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ করেছে। ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্র সামরিক আমলাতন্ত্র দিয়ে পরিচালিত হয়েছে। গণতন্ত্র সেখানে শক্ত ঘাঁটি গড়তে পারেনি। সমস্যাটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও কিছুটা প্রাসঙ্গিক।

একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণে আমলাতন্ত্রকে সবচেয়ে দক্ষ ও উপযোগী একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে আমলাতন্ত্র এই ধারায় বিকশিত হতে পারেনি। এ ধারায় বিকশিত হওয়া হয়তো বা কোথাও, কোনো দেশেই শতভাগ সম্ভব হয় না। গোড়া থেকে সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের ছত্রচ্ছায়ায় বেড়ে ওঠার কারণে আমলাতন্ত্রের নিরপেক্ষতার প্রশ্নটি বাংলাদেশে কোনো সরকার গুরুত্ব দিয়ে দেখেনি, বরং দলীয়করণ করে প্রতিটি সরকার আমলাতন্ত্রকে তাদের অধীনে রাখার চেষ্টা করেছে। এ কারণে নিয়মনীতির প্রতি আনুগত্য না দেখিয়ে সেখানে গোষ্ঠী বা দলীয় আনুগত্য প্রাধান্য পেয়েছে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে (সরকারি আমলাতন্ত্রে) গণতন্ত্র বিকশিত হয়নি। জনগণের সেবক হিসেবে আমলাতন্ত্র নিজেকে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে জনগণ ও সরকারের মধ্যকার আন্তসম্পর্কে কোনো ঐক্য বা বন্ধন গড়ে ওঠেনি।

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পথ কী?

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের গুণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে দুটি স্বতঃসিদ্ধকে গুরুত্ব দিয়ে

দেখা প্রয়োজন।

প্রথম স্বতঃসিদ্ধ

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংগ্রাম কেবল গণতন্ত্রেরই সংগ্রাম নয়। তার সঙ্গে আরও যুক্ত রয়েছে আত্মপরিচয়ের সংগ্রাম, সমাজকে আধুনিক করা এবং সমাজজীবনে উদারনীতির বিকাশ নিশ্চিত করার সংগ্রাম। আরও রয়েছে অগ্রসর অর্থনীতি এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনিক কাঠামো গড়ার চ্যালেঞ্জ। সে কারণে বিশুদ্ধ অর্থে গণতন্ত্র অর্থাৎ মেয়াদান্তে নির্বাচন এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন শেষকথা নয়। স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দেশের ওপর একই সঙ্গে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, আধুনিকায়ন, পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতি গড়ে তোলার মতো কাজগুলো একসঙ্গে সম্পন্ন করার কঠিন দায়িত্ব পড়ে। ফলে ইউরোপের মতো প্রথমে জাতিগঠন, পরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সবশেষে গণতন্ত্র—এই ছকটি আমাদের পক্ষে পালন করা কঠিন। এখানে সে কারণে বিশুদ্ধ অর্থে ইউরোপীয় মানদণ্ডের পরিমাপে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। গণতন্ত্রের সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থাকবে জাতিগঠন, স্বাধীনতার শত্রু-মিত্রের সমস্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধের সাজা ইত্যাদি। দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্র কোনো সামাজিক ও ঐতিহাসিক শূন্যতার মধ্যে জন্ম নিতে পারে না। গণতন্ত্র মানে বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক গ্রুপের কেবল সমন্বয় বোঝায় না, তার সঙ্গে তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের ব্যাপারটাকে আমলে নিতে হবে।

জাতিগত আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রে আমাদের দেশ বাঙালি জাতি এবং তার সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে স্বাধীন হয়েছে। অথচ জাতির অস্তিত্বসংক্রান্ত প্রশ্নগুলো, জাতির ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলো দুঃখজনকভাবে আমাদের দেশে আজও অমীমাংসিত, দ্বিখণ্ডিত হয়ে আছে। বাঙালি সংস্কৃতি এবং জাতিপরিচয়কে ধর্মীয় পরিচিতির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উপস্থাপনের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। বাঙালি আত্মপরিচয়কে রক্ষা করা গণতন্ত্রের সংগ্রামে অন্যতম উপাত্ত বিষয় হিসেবে দেখতে হবে। এখানে নির্বাচন কেবল সঠিক এবং যোগ্য ব্যক্তি বা দলের নির্বাচনকে বোঝায় না। যেসব জাতীয় প্রশ্ন বাঙালি জাতির অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত, সেগুলো গণতান্ত্রিক সংগ্রামের কর্মসূচির বাইরে রেখে গণতন্ত্রচর্চা সম্ভব নয়। রাজনীতি বা নির্বাচনে আজ অংশ নিচ্ছে এমন অনেক দল, যেসব দলে রয়েছে এমন সব ব্যক্তি বা গোষ্ঠী, যারা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। যারা দেশের উন্নতি বলতে বোঝায় পশ্চাৎপদ মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণার বাস্তবায়নকে। জাতিপরিচয় এবং তার ইতিহাসকে বিকৃত করে জাতীয় ঐতিহ্যের প্রধান স্তম্ভ স্বাধীনতা দিবস, ভাষাশহীদ দিবস, বিজয় দিবসের ধারণাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে না, যেগুলো জাতি পরিচিতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। দেশটির

ইতিহাস, বিভিন্ন নেতার অবদানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে দেশের স্বাধীনতাকে অবমূল্যায়ন করার লক্ষ্যে।

বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রধান দিকনির্দেশক হলো মুক্তিযুদ্ধ। তার প্রতি এবং সেই অর্থে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি আনুগত্য প্রধান শর্ত। পশ্চিমা বিশ্ব এই দিকটির প্রতি মনোযোগ দেয় না, যদিও এই বিভেদটি গুরুতর। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে, নজরুল-রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, মুজিব-জিয়ার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে বাঙালি ও ইসলাম ধর্মকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখার সংস্কৃতির অবসান প্রয়োজন। মুসলিম, হিন্দু বৌদ্ধ, খ্রিষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠানগুলো আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। বাঙালির জাতিগত ঐক্যের অভ্যন্তরে ফাটল সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। জাতীয় সার্বভৌমত্বকে বিতর্কিত করা হয় জাতির পিতা শেখ মুজিব সম্পর্কে নানা কটূক্তি করে।

ফলে আমরা এক বিশেষ ডিলেমার মুখোমুখি হই। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে এমন শক্তির ক্ষমতায় আসাকে বাতিল করা যায় না, যারা দেশকে মধ্যযুগীয় পশ্চাৎপদতার দিকে টেনে নিতে পারে, যারা বাঙালি জাতির চেতনার পরিপন্থী পথ গ্রহণে, যারা সার্বভৌমত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে দেশকে মেলাতে পারে কোনো আন্তর্জাতিকতাবাদের সঙ্গে, ধর্মীয় বা ভিন্ন কোনো আদর্শকেন্দ্রিক মতবাদের সঙ্গে। সে ধরনের অভিজ্ঞতা ইতিহাসে রয়েছে। ১৯৩৩ সালে হিটলারের নির্বাচনে বিজয়ের কথা উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে। যদি সে ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাহলে জাতির অস্তিত্বের সংকট নিয়ে ভাবতে হবে। সে কারণে গণতন্ত্রকে নির্বাচনসর্বস্ব প্রক্রিয়া হিসেবে ভাবা আমাদের দেশের ক্ষেত্রে কঠিন। গণতন্ত্রকে কেবল প্রক্রিয়া হিসেবে দেখার উপদেশ আমাদের নিজস্ব ধারণা থেকে আসেনি। এসেছে পশ্চিমা বিশ্ব ও বিশ্বপুঁজির সঙ্গে যুক্ত সংগঠনগুলো থেকে। বিগত তিন দশকে আমাদের অর্থনীতি পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। যারা ওই কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রক, তারা গণতন্ত্রের পদ্ধতি অনুকরণের কথা বলে, তারা জানে পুঁজির বিকাশ ও প্রসার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ছাড়া সম্ভব নয়। সে কারণে তাদের দাবি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু করা, সমাজকে শান্ত রাখা, রাজনৈতিকভাবে উৎপাতহীন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা, যা ওই পুঁজির বিকাশকে নিশ্চিত করবে। তা ছাড়া আরও রয়েছে ১৬০ মিলিয়ন মানুষের এই দেশ, বাজার অর্থনীতির দিক থেকে যার গুরুত্ব বিশ্বপুঁজির কাছে কম নয়। এই পুঁজির ওপর ভর করে এখানে জন্ম নিয়েছে দেশীয় বুর্জোয়া ও রাজনৈতিক এলিট শ্রেণি। এই পুঁজির সঙ্গে নানাভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে আমাদের নাগরিক সমাজ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এই পুঁজির দিকে তাকিয়ে তারা কথা বলে। তাদের আচরণের গণ্ডিকে সুনির্দিষ্ট করে। এই পুঁজি থেকে আসে তাদের অর্থ এবং কর্মস্পৃহার চালিকাশক্তি। সেদিক থেকে ভাবলে গণতন্ত্রের দাবিটি

আমাদের দেশীয় বাস্তবতা থেকে পুরোপুরি আসেনি। দাবিটি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যে ধরনের গণতন্ত্র ওই বিশ্বপুঁজি আমাদের দেশে দেখতে চায়, সে গণতন্ত্র এক বিশেষ ধরনের গণতন্ত্র। সেখানে মেয়াদান্তে নির্বাচন হবে। এটুকুই। শাসক পাল্টাবে। তাদের কাছে এই নিয়মতান্ত্রিকতাটুকু প্রয়োজন। গণতন্ত্রের সারবস্তুর প্রতি, আর্থসামাজিক বাস্তবতা, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে তারা ভ্রূক্ষেপ করে না। এই ধাঁচে আমাদের দেশীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা কঠিন।

দ্বিতীয় স্বতঃসিদ্ধ

গণতন্ত্র বিকাশের প্রশ্নে আমাদের মূল দৃষ্টি রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর নিবদ্ধ রাখতে হবে দুটি কারণে। প্রথমত, বাংলাদেশে আর্থসামাজিক পরিবেশ গণতন্ত্রের জন্য উপযোগী নয়। আর আর্থসামাজিক পরিবেশ কবে উন্নত হবে, তার অপেক্ষায় অনির্দিষ্টকালের জন্য সময় ব্যয় করা যুক্তিযুক্ত নয়। দ্বিতীয়ত, জাতীয় সংসদে জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। কে নির্বাচিত হবেন, কে হবেন না, তার বিচারক জনগণ। জনগণই আবার জনপ্রতিনিধিদের কাজের মূল্যায়ন করেন। তার ওপর ভিত্তি করে জনগণ পরবর্তী নির্বাচনে কাকে নির্বাচিত করবেন, কাকে করবেন না, সেটি নির্ধারণের সুযোগ পান। সে কারণে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে জনগণের ভূমিকা যেমন প্রধান, তেমনি নির্বাচিত হয়ে যাঁরা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাঁদের বিচারবুদ্ধির ওপর, সচেতনতার ওপর গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। জনগণের সচেতনতার দিকটি উন্নত গণতন্ত্রে লক্ষ করা গেলেও বাংলাদেশের মতো অনুন্নত সমাজে জনগণ এক অদ্ভুত সমষ্টি হিসেবে রয়ে গেছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, বাংলাদেশের জনগণ বুদ্ধিমান এবং রাজনীতির ব্যাপারে খোঁজখবর রাখে, দেশীয় রাজনীতি সম্পর্কে তাদের মতামত আছে। কিন্তু জনগণের যে ৮০ শতাংশ গ্রামে বাস করে, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় কৃষক, না হয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, উকিল, মোক্তার, স্কুল, কলেজের শিক্ষক। এদের অধিকাংশ অশিক্ষিত। রাষ্ট্রপরিচালনার নীতির মতো জটিল বিষয় নিয়ে তারা ভাবে না। ভাবার সময় নেই বা সামর্থ্য নেই। সকাল থেকে বিকেলে তারা মাঠে সময় কাটায়। সন্ধ্যায় পাড়ার চায়ের দোকানে জটলা। টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রেখে দেশকে দেখা। পর্দায় ভেসে ওঠে নানা খবর, মুখ বা ঘটনা। সেগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে কিছু বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন আলাপে জড়িত হয়ে বুঝে না বুঝে ঘরে ফেরা। এই নিয়ে গড়ে ওঠে অধিকাংশ মানুষের সচেতনতার পরিধি। মেয়াদান্তে নির্বাচন আসে। তার সঙ্গে থাকে কিছু ক্ষণিক উত্তেজনা। নির্বাচনকেন্দ্রে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে ভোট দেওয়ার সুযোগ। কপাল মন্দ হলে সেটুকুও ভাগ্যে জোটে না। কেউ সে কাজটি ইতিমধ্যে হয়তোবা সম্পন্ন করে দিয়ে

গেছে। তা ছাড়া রয়েছে অর্থের বিনিময়ে ভোট ক্রয়ের সংস্কৃতি। বাংলাদেশে গণতন্ত্রচর্চার এই হলো হাল-হকিকত, সচেতনতার পরিধি। এরাই সেই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস, যাকে ঘিরে গড়ে ওঠে গণতন্ত্রের বাকি অংশ—নেতা এবং রাজনৈতিক দল। তারা এই জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হয়ে দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতিনিধি হয় এবং দেশ শাসন করে।

জনগণের সচেতনতার ক্ষেত্রে আশু পরিবর্তন সম্ভব নয়। সে কারণে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য রাজনৈতিক দলের গুণগত পরিবর্তন বিশেষভাবে কাম্য। সাধারণ জনগণের বুদ্ধিমত্তার অভাব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অদক্ষতা যদি বাংলাদেশের বাস্তবতা হয়ে থাকে, তাহলে গণতন্ত্রকে সজীব ও কার্যকর করার যে একমাত্র পথটি বাকি থাকে, তা হলো রাজনৈতিক দলের অগ্রণী ভূমিকা। রাজনৈতিক দল জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। দলের প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশ নিয়ে জনগণের সমর্থনে জনমানুষের প্রতিনিধি হিসেবে গণতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। সে কারণে এখানে দলীয় সদস্যদের গুণগত মানের দিকটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ দলীয় নেতৃত্বের প্রশ্ন। রাজনৈতিক দলের গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে গণমুখী নীতি, ওই নীতি বাস্তবায়নে আধুনিক আমলাতন্ত্র গড়ে তোলা এবং জনসেবাকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রশ্নগুলোর সমাধান সহজ হয়। রাজনৈতিক দলের প্রধান ভূমিকা নিশ্চিত করতে হলে দেখতে হবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রাজনৈতিক দল কতটুকু শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াতে পেরেছে। তৃতীয় বিশ্বের অন্য দেশগুলোর মতো বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠানগতভাবে দুর্বল। যেসব দেশে গণতন্ত্র দীর্ঘদিন ধরে টিকে আছে বা যাকে বলে সুপ্রতিষ্ঠিত, সেসব দেশে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠান হিসেবে অনেক বেশি শক্তিশালী। প্রতিষ্ঠান বলতে বোঝায়, রাজনৈতিক দলের আদর্শগত অবস্থান ও তার স্থায়িত্ব। জনগণ পার্টির ব্যবহার কী হবে, সে সম্পর্কে যদি নিশ্চিত থাকে, তাহলে দলের ওপর তাদের আস্থা জন্মায়। রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার ধরন সম্পর্কে জনসাধারণ নির্দিষ্ট ধারণা গড়ে তোলে। মানুষ যেহেতু পার্টির চরিত্র সম্পর্কে সঠিক ধারণা গড়ে তুলতে পারে, সেহেতু ওই পার্টির প্রতি তাদের আনুগত্য স্থায়ী হয়। রাজনৈতিক দলের গণভিত্তি গণতন্ত্রের জন্য জরুরি। সেই সঙ্গে দলীয় নেতৃত্বের প্রজ্ঞা ও দক্ষতাও গুরুত্বপূর্ণ। জনগণের স্বীকৃতি রাজনৈতিক দলের প্রাতিষ্ঠানিকতার একটি বড় দিক। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী দলে মুষ্টিমেয় কয়েকজন দলকে নিয়ন্ত্রণ করে না। দল তাদের হাতে নির্ভরশীল থাকে না। বরং দলের স্থানীয় পর্যায়ের সদস্যরা দলের মূল কণ্ঠ হিসেবে পার্টির ওপর প্রভাব বজায় রাখে। সে কারণে দলের নেতৃত্ব নির্বাচনে ও নেতৃত্ব পরিবর্তনে সাধারণ সদস্যের ভূমিকা মুখ্য থাকা প্রয়োজন এবং নেতৃত্ব নির্বাচন ও

পরিবর্তনকে নিয়মিতকরণ করা আবশ্যক। এ দিকটি বাংলাদেশে যথেষ্ট প্রশ্নবোধক হয়ে আছে।

কয়েকটি সিদ্ধান্ত

১। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল সংগঠনের চেয়ে একধরনের ব্যক্তিকেন্দ্রিক জনসমষ্টি, যারা ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে একটি রাজনৈতিক ধারা অনুসরণ করে। রাজনৈতিক দলকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ প্রথা শক্তভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রাজনৈতিক দলকে শক্তিশালী করতে হবে। দলের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রায়ণ নিশ্চিত করতে হবে। স্বচ্ছ নির্বাচনের মাধ্যমে দলের নেতৃত্ব নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারণ সদস্যের অধিকারকে মূল্য দিতে হবে।

২। রাজনৈতিক সংলাপের প্রয়োজন রয়েছে, যদিও দুই জোটের মধ্যে বিভেদ গুরুতর। বিএনপি যে অবস্থানে আছে তাতে করে সংলাপ কঠিন। বঙ্গবন্ধুকে রাজাকার বলে বা স্বাধীনতার স্থপতিকে অস্বীকার করে বাংলাদেশের প্রকৃত ইতিহাসকে গ্রহণ না করে সংলাপ হওয়া কঠিন। বাঙালি জাতি শেখ মুজিবকে স্বাধীনতার সমার্থক হিসেবে দেখে। এ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একটি মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং (Memorendum of Understanding বা MOU) জাতীয়ভাবে তৈরি করতে হবে, যার প্রতি প্রতিটি রাজনৈতিক দল অনুগত থাকবে এবং নিজ নিজ গঠনতন্ত্রে স্বীকৃতি পাবে। এর জন্য সব রাজনৈতিক দলকে নিয়ে জাতীয় সম্মেলনের প্রয়োজন। যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে, তাদের জাতিগঠন-প্রক্রিয়ায় রাখার কোনো প্রয়োজন দেখি না। বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সব কর্মকাণ্ড মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে পরিচালিত হবে, যে চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। এ বিষয়টি মেনে না নিয়ে কারও পক্ষে নৈতিকভাবে রাজনীতি বা সমাজনীতির ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা নীতিবিরোধী হবে।

৩। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে বাকি প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলো থেকে পৃথক হয়ে কেন্দ্র-ডানপন্থী (Centre right) দলে পরিণত হতে হবে। বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী দলের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু তার অভ্যন্তরে ডান এবং প্রতিক্রিয়াশীল যে প্রবণতা রয়েছে, তা থেকে তাকে দূরে সরে আসতে হবে। বিএনপিকে জামায়াত এবং অন্যান্য ইসলাম নাম ব্যবহারকারী দলের সঙ্গে সমর্থন ছেদ করতে হবে। বিএনপিকে উগ্র ডানের পরিবর্তে কেন্দ্র ডান পার্টি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। একইভাবে আওয়ামী লীগকে জিয়ার অবদানকে কোনো না কোনো মাত্রায় বা পর্যায়ে স্বীকৃতি দিতে হবে। আওয়ামী লীগের আদর্শিক অবস্থানে পরিবর্তনের প্রয়োজন তেমন নেই। যেহেতু তার অভ্যন্তরে কেন্দ্র বাম ঝোঁক সুপ্রতিষ্ঠিত।

৪। রাজনৈতিক দলের গণতন্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং সাংবিধানিক সংস্কৃতি জোরদার করা। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে জোরদার করা।

৫। নাগরিক সমাজের বিরাজনীতিকীকরণ আবশ্যক। তাকে সত্যিকার অর্থে রাজনীতি ও অর্থনীতির মধ্যবর্তী অবস্থান গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

৬। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। ছাত্ররাজনীতি আজ টেন্ডারবাজি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, হলের সিট বরাদ্দের ওপর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদিকে বোঝায়, যা গণতন্ত্রের বিকাশে বাধাস্বরূপ।

৭। আমলাতন্ত্রকে নিরপেক্ষ ও দলীয়করণের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পেশাদারি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড় করাতে হবে।

৮। সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। নিরপেক্ষ ন্যায়পালব্যবস্থা চালু করা, যারা নাগরিকদের বিভিন্ন অভিযোগের মীমাংসা করবে। এটি প্রতিটি সরকারি বিভাগের জন্য প্রযোজ্য হবে।

৯। জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা এবং নিরপেক্ষতার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। সংসদীয় কমিটিগুলোকে (ব্যয় হিসাব কমিটি, আইন কমিটি ইত্যাদি) কার্যকর করে গড়ে তুলতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

Alfred C. Stepan, Religion, Democracy, and the 'Twin Tolerations', *Journal of Democracy*, Volume 11, Number 4, October 2000, pp.37-57.

Aguero, Felipe and Jeffrey Stark (ed) *Fault Line of Democracy in Post-Transition Latin America*, North-South Centre Press, University of Miami, 1998.

Andreas Schedier, The Democratic Revelation, *Journal of Democracy*, Volume 11, Number 4, October 2000, pp. 5-19.

Betham, David, 1994, `Liberal Democracy and the Limits of Democratisation' in Held, David (ed). *Prospects for Democracy : Noth, South, East, West*. Stanford : Stanford University Press, 55-73.

Cardoso, Fernando Henirique, Democracy in Latin America, in : *Politics and Society*, 1986, 15 : 23.

Carothers, Thomas The `sequencing' Fallacy, *Journal of Democracy* Vol 18, Number 1, January 2007, pp. 12-27.

Carothers, Thomas, The End of Transition Paradigm, *Journal of Democracy* 13 (1) 2002, p.11.

Carothers, Thomas. The `Sequencing' Fallacy, *Journal of Democracy*, Volume 18, Number 1, January 2007.

Carole, Pateman *Particiption and Camocratic Theory*, Cambridge, Cambridge University Press, 1974.

Chadda, Maya, *Building Democracy in South Asia*, Lynne Rienner Publishers London, 2011.

Croissant, Aurel and Marco Bunte (ed) *The Crisis of Democratic Governance in Southeast Asia*, London, Palgrave macmillan,

Dahl, Robert A. *On Democracy*, New Haven and London : Yale University Press, 1998.

Diamond Larry and Others, Reconsidering the Transition Paradigm, *Journal of Democracy*, Volume 25, Number 1, January 2014.

Diamond, Larry, *Developing Democracy : Towards Consolidation*, Baltimore, John Hopkings University Press, 1999.

Diamond, Larry, The Spirit of Democracy : The Struggle to build free societies throughout the world, Henry Holt and Company, New York, 2008.

Fukuyama, Cardoso, Fernando Henrique *Democracy in Latin America*, Politics Society, 1986, 15:23

Guillermo O'Donnell, Horizontal Accountability in New Democracy, *Journal of Democracy*, 9.3 (1998) pp. 112-126.

Huntington, Samuel P. `Democracy for the Long haul, *Journal of Democracy*, 7, no. 2 (1996) : 5.

Huntington, Samuel P. *Democracy's Third Wave*, University of Oklahoma Press, 1991.

Huntington, Samuel P. Democracy's Third Wave, *Journal of Democracy* Vol. 2. No. 2, Spring 1991.

Jackson. Roy. *Nietzsche and Islam*, Routledge, London, 2007

Jaffrelot, Christophe, 2002. India and Pakistan : Interpreting the Divergence of Two political Trajectories, *Cambridge review of International Affairs* 15(2) : 251-267.

Jalal Ayesha, *Democracy and Authoritarianism in South Asia : A Comparative and Historical Perspective*, Cambridge : Cambridge University Press, 1995.

Kurt Weyland, Neopopulism and Neoliberalism in Latin America : how much affinity? *Third World Quarterly*, Vol. 24, No. 6, pp. 1095-1115.

King, Geoffrey D. *Varieties of Neoliberalism in Latin America*, paper presented at Integrative Exercise Winter conference, 2010.

Kurt, Weyland, Neopoulism and Neoliberalism in Latin America : how much affinity? In *Third World Quarterly*, Vol. 24, No. 6. pp. 1095-2003.

Islam, Nazrul (1999) Urbanisation Migration and Development in Bangladesh : recent Trends and Emerging Issues, Centre for Policy Dialogue (125-146).

Laurence Whitehead, Strrings of Mutual Recognition, *Journal of Democracy*, Volume 11, Nember 4, October 2000, pp. 65-79.

Lechner, Norbert (1998) The Transformations of Politics in : Felipe Aguero and Jeffrey Stark (ed) *Faultiness of Democracy in Post-Transition Latin America*, University of Miami, North-South Center Press.

Lipset, Seymour Martin. 1959. Some Social Prerequisite of Democracy : Economic Development and Political Legitimacy. *American Political Science Review*, 53 (March); 69-105.

Marwah, Fransis, Sanjay Dimension of Development, *Journal of Democracy*, Volume 11, Number 4, October 2000, pp. 80-94.

Moore, Barrington. Social Origin of Dictatorship and Democracy. London : Allen Lane, 1966.

Muhlberger, Steve, Democracy in Ancient India. downloaded from internet, 2015.

Muller, Jorgen and Svend-Erik Skaaning, The Third Wave : Inside the Numbers, *Journal of Democracy*, Volume 24, Number 4, October 2013.

New York Times March 23, 2009 NAFTA's Promise Unfulfilled

Phillp Oldenburg, India, Pakistan, and Democracy (Solving puzzle of divergent path) NY Routledge, 2010.

Plattner, Marc F. Populism, Pluralism, and Liberal democracy, *Journal of Democracy*, Volume 21, Number 1 Junuary 2010, pp. 81-92.

Patricio Aylwin, Democracy in the Americas, *Journal of Democracy*, 9.3 (1998), pp.3-6.

Raby, D.L. *Democracy and Revolution : Latin America and Socialism*

Today, London, Pluto Press, 2006.

Robert Goodin, Global Democracy : in the beginning, *International Theory* (2010) 2.2, pp. 175-209.

Schumpeter, Joseph. *Capitalism, Socialism and Democracy*. New York : harper Collins. 1975.

Shifter, Michael. 2011. Latin America : a Surge to the Center, *Journal of Democracy*, Volume 22, Number 1, January, 107-121.

Siegle, Joseph T. Michael M. Weinstein, and Morton H. Halperin. Why Democracy Excel, *Foreign Affairs*, September/October 2004.

Sorensen, George. *Democratisation in the Third World, The Role of Western Politics and Research*, Purdue University, West Lafayette, February 25-27, 1998.

Stern, Robert W. *Democracy and Dictatorship in South Asia : Dominant Classes and Political Outcomes in India, Pakistan and Bangladesh*, Westport, Connecticus, and London : Praeger, 2010.

Stockton, David *The Classical Athenian Democracy*, Oxford, Oxford University Press, 2002, Page 165.

Terry Lynn Karl (1990) `Dilemmas of Democratisation in Latin America', *Comparative Politics*, Vol 23, No 1, pp. 1-21.

Vali Nasr The Rise of `Muslim Democracy', *Journal of Democracy*, Volume 16, Number 2, April 2005.

Varshney. Ashutosh Why Democracy Survives, *Journal of Democracy* 9:3 (1998) 36-50.

Wittes, Tamara Cofman, Islamist Parties : Three Kinds of movements, *Journal of Democracy*. Vol. 19, Number 3, July 2008, pp. 7-27.

Wucherpfenning Julian and Deutsch Franziska. *Modernisation and Democracy : Theories and Evidence Revisited, Living Reviews in Democracy*, Vol 1 (2009).

প্রতি চিন্তা
জাতীয়তাবাদ

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠের আধিপত্য

লাইলুফার ইয়াসমিন

সারসংক্ষেপ

সংখ্যাগরিষ্ঠতার ওপর ভিত্তি করে 'অবস্থানগত আধিপত্য' কীভাবে বাংলাদেশের জাতীয় আদর্শ গঠনে সহায়তা করে, সেটিই এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। এর ফলে বিশেষ বাঙালি পরিচয়ভিত্তিক জাতীয় পরিচয়গঠন রাষ্ট্রের অন্যান্য পরিচয়সংক্রান্ত দাবি এবং আদিবাসীদের পরিচয়সংক্রান্ত দাবিকে অগ্রাহ্য করে থাকে। একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও বৃহত্তর পার্বত্য অঞ্চলে আদিবাসীদের ওপর বাঙালিদের সাংস্কৃতিক আধিপত্যের কারণে শান্তি অধরা রয়ে গেছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ : জাতি, নৃগোষ্ঠী, জাতীয়তাবাদ, বাঙালি, আদিবাসী, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, আধিপত্য ও পরিচয়।

প্রারম্ভিক কথা

যে ১১টি দেশ ২০০৭ সালে জাতিসংঘে গৃহীত আদিবাসীদের অধিকার-সংক্রান্ত ঘোষণায় স্বাক্ষর করেনি, বাংলাদেশ তার একটি। 'আদিবাসী' শব্দটি সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত না হওয়ার যুক্তিতে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করা থেকে বিরত থাকে।[১] এটি প্রমাণ করে যে বাংলাদেশের আদিবাসীদের চলমান সমস্যা রাষ্ট্র দ্বারা নিযুক্ত সংখ্যাগুরুর অবস্থানগত শক্তি সংখ্যালঘু আদিবাসী 'অন্যান্যদের' ভাগ্য নির্ধারণ করার ফলে বিরাজমান। 'প্রাতিষ্ঠানিক' জাতীয় পরিচিতি গঠনের বিষয়টি একটি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ নিয়ন্ত্রণ করে এবং এই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ সাধারণত ক্ষমতাবলে তাদের 'অবস্থানগত শক্তি'র ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে। অধিকাংশ জনগণ বা অন্তত এলিট জনগোষ্ঠী এ ধারণা তৈরিতে নেতৃত্ব দেয় এবং তাদের

'আদিবাসী অবস্থান' ও এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য বিশেষ অধিকার স্বীকৃতি দেওয়া বা না দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ইতিহাসে এমন অনেক উদাহরণ আছে, যেখানে আদিবাসী বা 'প্রথম মানুষ' হিসেবে তাদের অধিকারের স্বীকৃতি উপেক্ষিত হয়। এটি বিভিন্ন জায়গায় ঘটেছে। পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক ইতিহাসে আদিবাসীদের উচ্ছেদের অনেক উদাহরণ রয়েছে এবং অন্যদিকে স্বীকৃতি ও পুনর্মিলনের সাম্প্রতিক প্রবণতা, বিশেষত অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের কাছে 'ক্ষমা'র নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য উপনিবেশে আদিবাসী উচ্ছেদ ও আদিবাসী পরিচয় জোর করে মুছে ফেলার ঘটনাও কম নয়, যা তাদের জাতিগঠনের একটি বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। ঠান্ডা যুদ্ধকালে স্বাধীনতা লাভকারী ৪৪ বছর বয়সী বাংলাদেশের জাতিগঠনের ইতিহাসও ত্রুটিহীন নয়। বাংলাদেশিরা ভুলে যায় যে পশ্চিম পাকিস্তানি এলিটরা বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তাদের বাঙালি আত্মপরিচয় শান্তিপূর্ণভাবে মেনে নেয়নি।

বাঙালিরা নিজস্ব পরিচয়ের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানি এলিটদের (মিলিটারি জান্তার) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে নয় মাসের সহিংস যুদ্ধের পর স্বাধীনতা লাভ করে। বিজয়ী বাঙালিদের নতুন রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারী আদিবাসীরা স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে পড়ে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীও তাদের আত্মপরিচয়ের স্বীকৃতিপ্রত্যাশী। এ প্রত্যাশা বাংলাদেশকে শুরুতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি ও আদিবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতায় নিমজ্জিত করে, যা পরবর্তীকালে সামরিক দাঙ্গায় রূপান্তরিত হয়। এ সংকট ১৯৯৭ সালে আংশিক সমাধান হয়েছিল। কিন্তু সময়ে সময়ে তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের পূর্ববর্তী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, বাংলাদেশে কোনো আদিবাসী জনগোষ্ঠী নেই। এ দাবি আবারও বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও পরিচয়ের অধিকার নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্ক উসকে দিয়েছিল। এ লেখাটি এসব বিতর্কের ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক দিক নিয়ে একটি আলোচনা। লেখাটির যুক্তি হচ্ছে, অদিবাসীদের প্রতি বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের আচরণ বাঙালি পরিচয় প্রতিষ্ঠার ফলে সৃষ্ট অত্যাচারকে প্রতিভাত করে, যা আন্তর্জাতিকভাবেও বাংলাদেশ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা উপস্থাপন করে। আরও বিশেষভাবে নিবন্ধটি উত্তর-ঔপনিবেশিক দেশগুলোর নিজেদের জন্য 'আধুনিক' জাতীয়তার একটি ভ্রান্ত ধারণার প্রতিলিপির প্রয়াসকে তুলে ধরে, যা তাদের সমগ্র জনসংখ্যার ওপর সমগোত্রীয়তা আরোপে বাধ্য করার ক্ষেত্র তৈরি করে। এ জন্য বাংলাদেশ এ ধরনের সংকটের একটি উল্লেখযোগ্য নজির স্থাপন করেছে, যেখানে জাতীয়তার চাহিদা সমগোত্রীয়তার চাহিদা তৈরি করেছে,

যার ফলে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আদিবাসী অধিকার খর্বিত হয়েছে। এখানে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, অধিকাংশ উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোতে আদিবাসী সংস্কৃতি ও পরিচয় তদের অস্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল ভূমির সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে যুক্ত। এ আলোচনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যারা অবস্থানগত পরিচয়ের ফলে উচ্চতর রাজনৈতিক ক্ষমতাসীন এবং স্থানভিত্তিক আদিবাসী জনগণ যারা নৈতিক যুক্তিবলে এবং আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা সমর্থিত, তাদের আলাদা করে দেখা হয়েছে।

প্রবন্ধটিতে প্রথমে জাতি এবং জাতিগত কিছু তাত্ত্বিক পর্যালোচনা রয়েছে, যা দুটি আন্তসম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক ধারণার বিতর্কের ভিত্তি স্থাপন করে : আদিবাসী ও স্থানভিত্তিক পরিচিতি আর অন্যদিকে রাষ্ট্রভিত্তিক জাতীয়তার অবস্থানগত পরিচিতি, যা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার সমর্থনের জন্য এলিটদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এরপর এখানে 'সোনার বাংলা' পুরাণের ওপর ভিত্তি করে বাঙালি অবস্থানগত পরিচয়ের গঠন কীভাবে আদিবাসীদের অধিকার অস্বীকার করে সেটা আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে অপরিহার্যভাবে সাদৃশ্যের ওপর ভিত্তি করে আধুনিক রাষ্ট্রগঠন একটি প্রচলিত কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ ধারণা, যা বাংলাদেশি এলিটদের আদিবাসী জনগণের ওপর বাঙালি পরিচয় চাপিয়ে দিতে সচেষ্ট করেছে।

জাতি, নৃগোষ্ঠী ও আদিবাসী—কার দেশ/ কার জাতি?

জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে দেশের রাজনৈতিক রূপান্তর একই সঙ্গে একটি মানুষের মৌলিক পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং কোন গোষ্ঠী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলে। যেখানে মতাদর্শ হিসেবে জাতীয়তাবাদ হলো একটি দেশের রাজনীতি প্রতিষ্ঠার প্রকাশ, কিন্তু এন্থনি ডি স্মিথ যুক্তি দেন যে নৃগোষ্ঠীরাই একটি জাতির পরমাণু। পরিচয় ব্যাপারটি কাল্পনিক, যা ঐতিহাসিক স্মৃতি ও ভূখণ্ডের সঙ্গে জড়িত।[২]

একটি দেশের জাতিগত অতীত তার বর্তমানের ওপর অবস্থান করে, যা জাতিকে ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত করে এবং এর বৈধতা বাড়ায়। জাতিগত সমস্যা সাংস্কৃতিক গুণাবলি ও পূর্বপুরুষের অনুমানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একটি পরিচয়, যা দিয়ে উন্নত দেশের বিপরীতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অনেক রাজনৈতিক সমস্যা ব্যাখ্যা করা হয়। অনেক ইউরোপীয় দেশে বৈচিত্র্য দেখা যায়, কিন্তু একতাবদ্ধ জাতীয়তার ধারণা ইউরোপে সুপ্রতিষ্ঠিত। এশিয়া ও আফ্রিকাতে অনেক মানুষ, বিশেষত যারা 'উপজাতি' হিসেবে পরিচিত, একটি জাতীয় সার্বভৌম রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করার জন্য কিছু নির্দিষ্ট চিহ্নের সংমিশ্রণ ও স্বাধীনতার জন্য স্ব-আরোপিত 'জাতি' গঠনের চেয়ে তাদের ভূমি বা স্থানের জন্য

প্রবল আনুগত্য রয়েছে।[৩] 'উপজাতি' মানুষদের জন্য প্রথমে 'আদিম' এবং পরে 'আদিবাসী' শব্দটি কিছু নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর স্থানভিত্তিক সংযুক্তির উত্থান হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। এ ছাড়া তাদের শক্তি ও সম্পদের অভাব বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে তাদের আলাদা করে।

আদিবাসী ধারণাটি বলতে সাধারণত বংশানুক্রমিকভাবে বসতি স্থাপনকারী ভূমিকে বোঝায়। ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ ধরনের ভূমি 'টেরা নুলিয়াস' (terra nullius) বা শূন্য ভূমি হিসেবে গণ্য। এর ফলে ঔপনিবেশিক শক্তি আদিবাসীদের ভূমিকে 'বেওয়ারিশ' হিসেবে গণ্য করার বৈধতা পায় এবং এই এলাকাতে ঔপনিবেশিক শক্তির পদার্পণই 'প্রকৃতপক্ষে' প্রথম বলে গণ্য করতে সহায়তা করে। এভাবে ভূমির ওপর আইনি দাবি এবং মূল বাসিন্দাদের দাবি উপেক্ষা করে, এমনকি তাদের মর্যাদাহানিকর শব্দ যেমন 'ন্যাটিভ' হিসেবে অভিহিত করে, যদিও অন্য প্রেক্ষাপটে 'ন্যাটিভ' হিসেবে একজনের সঙ্গে তার ও তার পূর্বপুরুষদের জন্মস্থান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই আদিবাসী মানুষ তাদের নিজস্ব ভূমির আইনি বা রাজনৈতিক দাবি হারালেও তাদের পরিচয়ের অপরিহার্য উপাদান স্থানভিত্তিক অস্তিত্বের চেতনা চলে যায় না।

আদিবাসী ধারণাটি স্থানীয় জনগণের পরিচয়ের জন্য লড়াই এবং ঔপনিবেশিকদের শাসনের প্রত্যক্ষ পরিণতি হিসেবে এসেছে, যা ১৭ শতকে উত্তর আমেরিকাতে শুরু হয়ে পরে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের স্থানীয় জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।[৪] আদিবাসী ধারণাটি 'প্রথম মানুষদের' (first people) প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হিসেবে দেখা হয়।[৫] এটি শুধু নৃতাত্ত্বিক বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ আবিষ্কার বা কেবল একটি 'পুরোনো স্মৃতি জাগরণ নয়।[৬] এমন ধারণা ষাট ও সত্তরের দশক থেকে বিকাশ হয়েছে, যেখানে 'জায়গার সঙ্গে আবেগের সম্পৃক্ততা'র ওপর গুরুত্ব দিয়ে সাংস্কৃতিক ভূগোল ও পরিবেশগত মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্থানভিত্তিক পরিচয় বিশ্লেষণ করা শুরু হয়।[৭] এসব গবেষণায় দেখা যায়, একই ধরনের জাতীয় পরিচয়ের সঙ্গে স্থানভিত্তিক বন্ধনের প্রতিস্থাপন আদিবাসী জনগণের জন্য সন্তোষজনক নয়।

কার ভাবমূর্তি?

জাতি, নৃগোষ্ঠী এবং আদিবাসী আলোচনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এটি অন্তর্নিহিত শক্তির ধারণার সঙ্গে যুক্ত। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, কে জনগণের ভাবমূর্তি গঠন করে? জাতীয়তাবাদের ইতিহাস অনুযায়ী, জনগণের গতিশীলতা ও জাতীয় সংস্কৃতির প্রচারে সব সময় এলিট সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টা ছিল। যেহেতু ফরাসি ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুযায়ী 'জাতি' শব্দটি সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল এবং

সার্বভৌমত্বের ধারণা প্রথমত এলিটদের সঙ্গে যুক্ত, তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ক্ষেত্রেই জাতীয় সংস্কৃতির গঠন এলিট সম্প্রদায়ের দ্বারা হয়। ফরাসি বিপ্লবের সময় জনগণের শক্তি সামনে চলে আসে। আর্নেস্ট গেলনার আমাদের মনে করিয়ে দেন যে জাতীয় ভাবমূর্তি তৈরি করার ক্ষমতা হলো এলিটদের ক্ষমতা 'একটি সমাজের জন্য এটা অবশ্যই একক হতে হবে, যেখানে তারা সবাই একই ধারণার উৎপাদন করতে পারে এবং একই ধারণা ছড়িয়ে দিতে পারে। তাই এটি একটি একক সংস্কৃতি হতে হবে।[৮] বেনেডিক্ট এন্ডারসনও এদিকটায় জোর দিয়েছেন। তিনি ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদী মনোভাব ছড়ানোর ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের ভূমিকার পাশাপাশি 'জাতীয় বংশবৃত্তান্ত' গঠন করা, যা নির্দিষ্ট 'জাতীয় সম্প্রদায়' তৈরিতে সাহায্য করে, তার ওপরও গুরুত্বারোপ করেছেন। এসব ক্ষেত্রে একটি দেশ তার জাতীয়তা শক্তিশালী করার জন্য তার গৌরবগাথা মনে রাখে এবং অতীতের ভুলভ্রান্তি ইচ্ছাকৃতভাবে চাপা রাখে।[৯] যে অতীত প্রায়ই বিস্মৃত হয়, তা হলো একটি জাতীয় আদিবাসী ইতিহাসের অতীত।

জাতীয়তাবাদী ধারণা তৈরির ক্ষেত্রে এলিটদের ভূমিকা গবেষণা করার মতো বিষয়। পণ্ডিতেরা তুলে ধরেছেন যে জাতিগঠন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া সত্ত্বেও কীভাবে এলিটদের ধারণা বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা হতে পারে। মন্টসেরাট গাইবার্নু এ ক্ষেত্রে কীভাবে ফরাসি জনগণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত নিজেদের ফরাসি হিসেবে বিবেচনা করেনি, তা ইউজিন ওয়েবারের কাজ দেখিয়ে উদ্ধৃত করেছেন।[১০] একইভাবে কেনাল কার্পটি যুক্তি দেন, তুর্কিতে জাতীয়তাবাদের গঠনের একটি 'আত্মনিভৃত এলিটভিত্তিক' প্রকল্প রয়েছে।[১১] ভারতের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পরিচয় 'ভারতমাতা' তৈরি হিন্দু ধর্মভিত্তিক, যা অন্যান্য জাতি ও ধর্মের জনগণকে 'সঠিক' ভারতীয় হিসেবে অস্বীকার করে।[১২] মুসলিম ও আদিবাসী জনগণকে পৃথক্‌করণ করা হয়, যেখানে মুসলিমদের সামাজিকভাবে অচ্ছুত পরিচয় দেওয়া হয় এবং আদিবাসী জনগণের জমিতে উন্নয়ন প্রকল্পের নামে তাদের অধিকার সংকুচিত করা হয়।[১৩] আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো একটি জাতি আরেকটি জাতির প্রত্যুত্তর হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। যখন জাতিগুলো একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে নিজেদের সংগঠিত করে, যোগাযোগব্যবস্থার প্রসার এবং নতুন জায়গা আবিষ্কারের মাধ্যমে অন্যান্য জনগণের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে নিজেদের 'প্রথমত্ব' গঠন নিয়ে সচেতন হয়। ইংরেজদের নিজস্ব নৃজাতি সংহতিকরণ এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে দেখা যায়। তাদের জাতিগত পরিচয়কে তারা এ ধরনের রূপান্তরের যোগ্য হিসেবে মনে করে এবং দাবি করে যে সমৃদ্ধ ভাষা, চেহারা ও সংস্কৃতি তুলে ধরার মাধ্যমে ইংরেজি পরিচয় তৈরি করা সম্ভব।[১৪] 'গ্রেট ব্রিটেন'

ধারণাটি মধ্য উনিশ শতকে উত্থান হয়। এটি 'পৃথিবীর ইংরেজিতে কথা বলা মানুষদের' অন্য জাতির সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটা সত্ত্বেও ইংল্যান্ডের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক ও ভাষার মিল রয়েছে।[১৫]

জাতীয়তাবাদের আখ্যান আমাদের বলে যে এটি একটি নির্দিষ্ট সীমান্তের মধ্যে কিছু জনগণের কল্পনা, যেখানে এলিটরা সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব করে। এটা সব সময় পশ্চিমা ও অপশ্চিমা—দুই জায়গার দেশগুলোতে 'ওপর থেকে নিচ' অ্যাপ্রোচের অন্তর্গত। এস এন আইজেন্টাজের ভাষায়, তুর্কি এভাবে এলিটদের দ্বারা 'জনগণের জন্য, কিন্তু জনগণ ছাড়া' রাষ্ট্র হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়[১৬], ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু গোপনে বলেছেন, 'আমি ভারত শাসনকারী সর্বশেষ ইংরেজ।'[১৭] একটি রাষ্ট্রে প্রভাবশালী জাতি অবস্থানগত অস্তিত্ব ধরে রাখে রাষ্ট্রের ভেতর অন্যান্য স্থানভিত্তিক পরিচয়ের চাহিদাকে মোকাবিলা করার মাধ্যমে। ইটিনি বলিবারের মতে, 'সীমান্ত ধারণার ব্যাপ্তি' এমন একটি ধারণার তৈরি করে, যেটা একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে গ্রাসভূত করার শক্তি দেয়।[১৮] যদিও বলিবারের প্রধান রেফারেন্স পয়েন্ট ছিল ইউরোপ, একই 'ওপর থেকে নিচ' অ্যাপ্রোচ বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠদের অত্যাচার তৈরি করেছে, যেখানে এই জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আদিবাসী জনগণের পরিচয় দমন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভ করে। পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রের বিপরীতে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি মূলত দুটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল—পরিচয় ও ন্যায়বিচার। পাকিস্তান রাষ্ট্রটি ভারতের মুসলমানদের ভূমি হিসেবে কৃত্রিমভাবে গড়ে উঠেছিল, যা পূর্ব ও পশ্চিম—এ দুটি সেক্টরে বিভক্ত ছিল। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভাগের সময় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলা পশ্চিম বাংলা থেকে আলাদা হতে চেয়েছিল। তবে, দেশ বিভাগের পেছনে ধর্মীয় পরিচয়ের চেয়ে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের ধারণা ছিল মুখ্য।[১৯] এ ধারণা শেষ পর্যন্ত অর্জিত হয়েছিল বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, যার মূলে ছিল বাঙালি জাতিসত্তার স্ফুরণ।

পূর্ব বাংলার বাঙালিদের নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের আদিবাসী মানসের জাতীয় পরিচয়ের রূপান্তর ঘটিয়েছে বারবার—একবার তারা পাকিস্তানি রাষ্ট্র, আরেকবার তারা বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ অঞ্চলের আদিবাসী মানুষ যারা একত্রিতভাবে জুম্মা নামে পরিচিত, তারা বারবার রাষ্ট্রগৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের নামে বিভিন্ন রকম বঞ্চনার শিকার হয়।

জুম্মা—বাংলাদেশে আদিবাসী বলতে যা বোঝায়

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১ দশমিক ১৩ শতাংশ আদিবাসী।[২০] পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বেশির ভাগ আদিবাসী বাস করে, যেখানে ১৩টি বিভিন্ন গোষ্ঠীকে এ অঞ্চলের আদিম আদিবাসী হিসেবে গণ্য করা হয়।[২১] এসব জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি থাকায় এবং প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হওয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম বাঙালি জনগোষ্ঠী থেকে তারা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। এ অঞ্চল সাধারণত আদিবাসী-অধ্যুষিত হলেও সরকার-সমর্থিত উদ্দেশ্যমূলক নীতির মাধ্যমে আগে কিছু বাঙালি অভিবাসী গোষ্ঠীকে বসতি স্থাপন করিয়ে বাঙালি জাতির ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি ঘটানো হয়। বাংলাদেশি সরকার কর্তৃক ক্রমাগত অভিবাসী নীতি কার্যকর করার মাধ্যমে ২০০৩ সালে বাঙালি-আদিবাসী অনুপাত দাঁড়ায় ৫৩:৪৭। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সাল থেকে অনুসৃত নীতি এবং আশির দশকের পর থেকে এর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি এ অবস্থার সৃষ্টি করে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পরের অবস্থার একদম বিপরীত চিত্র এটি। তখনকার পার্বত্য অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার ৯৮% আদিবাসী ছিল।[২২]

চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল ১৬৬৬ সালে মোগল শাসনের অধীনে এবং ১৭৬০ সালে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আসে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে এটি সিএইচটি ম্যানুয়াল ১৯০০-এর আওতায় তার স্বায়ত্তশাসন বজায় রেখেছিল। এর দুটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—ব্রিটিশ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করা এবং বাঙালি অভিবাসনে বিধিনিষেধের মাধ্যমে আদিবাসী জনগণের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা। ব্রিটিশ অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার মধ্য দিয়ে মিয়ানমার ও চীনে পৌঁছানোর পরিকল্পনা প্রথম অনুসৃত হয় ১৭৬১ সালে। কিন্তু গত শতকের আশির দশকের গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলো এ ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। তারা মনে করে যে ব্রিটিশদের উদ্দেশ্যমূলে ছিল অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা নয়, বরং আদিবাসী ও বাঙালিদের পৃথক্করণের প্রচেষ্টা। কিন্তু আমরা যদি ইতিহাস পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখব যে এই ব্রিটিশ নীতির উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন, তার বাস্তবিক মূলে ছিল ১৮ শতকের শেষার্ধে চাকমা রাজার সঙ্গে করা শান্তি চুক্তি। এই শান্তি চুক্তি দুই পক্ষের মধ্যে কয়েকটি যুদ্ধের পর শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।[২৩] আশির দশকের পার্বত্য চট্টগ্রাম সংঘাত বিশ্লেষণ করে পরে গবেষকেরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে আদিবাসী জনগণকে রক্ষা করার জন্য ব্রিটিশদের বিকল্প উদ্দেশ্য ছিল, আর তা হলো বাঙালি ও আদিবাসীদের পৃথক্করণের প্রয়োজনীয়তা, যদিও ইতিহাসের পর্যালোচনা এ ধারণা সমর্থন করে না।[২৪]

১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভাগের সময় জুম্মা জনগণ ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা নীতিতে আকৃষ্ট হয়ে ভারতের অংশ হতে চেয়েছিল।[২৫] পার্বত্য

চট্টগ্রামকে প্রথমে ভারতের অধীনে দেওয়া হলেও রাজনৈতিক বিবেচনায় একটি শিখ-অধ্যুষিত এলাকাকে বদলে ভারতের নিকট থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের নিকট হস্তান্তর করা হয়।[২৬] ষাটের দশকে পাকিস্তান সরকারের স্থানচ্যুতি (Translocation) নীতির অধীনে বাঙালি জাতির আন্তপ্রবাহ শুরু হয়। এ অবস্থা চূড়ান্ত পর্যায়ে যায় ১৯৫৭-৬২ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের সময়। কাপ্তাই বাঁধ আদিবাসী জনগণের জন্য একটি 'মৃত্যুফাঁদ' ছিল, যা এ অঞ্চলে অনেক পরিবেশগত উদ্বাস্তু জন্ম দিয়েছে।[২৭]

আয়ত্তকরণকারী বাংলা নীতিবাক্য

ষাটের দশক থেকে আদিবাসীদের অবস্থান দৃঢ় হতে থাকে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে সত্তরের দশকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠনের মধ্য দিয়ে চরম মাত্রায় পৌঁছায়।[২৮] সমষ্টিগত সচেতনতা বৃদ্ধির প্রধান কারণ এবং নির্দিষ্ট প্রসঙ্গ বর্ণনার জন্য এই সময়কাল গুরুত্বপূর্ণ। শেন্ডেল বলেছেন, 'জুম্মার' সৃষ্টি একটি প্রত্যাখ্যানের প্রকাশ...অন্যদিকে এটা নৃগোষ্ঠীগত উদ্ভাবনের প্রকল্প ছিল, যা ক্ষমতা হ্রাসের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিণতি এবং রাষ্ট্র ও সাংস্কৃতিক প্রান্তিকীকরণের মোকাবিলার হাতিয়ার।'[২৯] এর কারণ হলো বাঙালি পরিচয়ের প্রকাশভঙ্গি, যা আদিবাসী পরিচয়কে বিলীন করে দেয়। এর ফলে প্যান আদিবাসী পরিচয় তৈরির প্রেক্ষাপট সুদৃঢ় হয়, যার মাধ্যমে ১৩টি জাতিগোষ্ঠী তাদের প্রাথমিক পরিচয় হিসেবে জুম্মা চেতনাকে গ্রহণ করে।

১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে 'স্বতন্ত্র এলাকা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ এলাকার মর্যাদা পরে সাংবিধানিকভাবে নেতিবাচক অবস্থায় পর্যবসিত হয় এবং 'উপজাতীয় এলাকা' হিসেবে অভিহিত হয়, যদিও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা ১৯০০ সালের সিএইচটি ম্যানুয়ালের অধীনেই শাসিত হতে থাকে। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গৃহীত বাংলাদেশ সংবিধান বাংলাদেশের সীমানার ভেতরে বসবাসকারী সব অধিবাসীকে 'বাঙালি' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছিল এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশে বসবাসকারী অন্য জাতিগোষ্ঠীর পরিচয়কে অস্বীকার করা হয়েছিল। সংবিধানের দ্বিতীয় অংশে রাষ্ট্রনীতির মূলতন্ত্রে বলা হয়েছে :

> বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি, যা তার ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে প্রস্ফুটিত এবং সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীন বাংলাদেশের অর্জিত স্বাধীনতাযুদ্ধের মাধ্যমে একতাবদ্ধ ও সুদৃঢ়, তা হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।[৩০]

সংবিধান গৃহীত হওয়ার আগে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের নিজেদের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার

নেতৃত্বে আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করেন। শেখ মুজিব তাঁদের দাবি প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন নিজস্ব পরিচয় ভুলে যেতে। এর সঙ্গে যোগ করে তিনি বলেন, 'বাড়ি যান, বাঙালি হয়ে যান।'[৩১] এভাবে সংবিধান অনুযায়ী আদিবাসী জনগণের ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের আইনগত নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিদর্শনের সময় শেখ মুজিব তাঁর অবস্থানের পুনরাবৃত্তি করেন এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে মূলধারার বাঙালি সংস্কৃতিতে যোগদানের আহ্বান জানান।[৩২]

১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে পরিবর্তনের কারণে মানবেন্দ্র লারমা ভারতে পালিয়ে যান। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই বলা প্রয়োজন যে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ভারতের মণিপুর ও ত্রিপুরা রাজ্য দুটির মধ্যবর্তী হওয়ায় এ অঞ্চলে ভারতের সহজ আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরাতে তাদের প্রধান কার্যালয় স্থাপনকারী শান্তি বাহিনীকে ভারত সামরিক সাহায্য প্রদান করে।[৩৩] ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ সরকার এবং শান্তিবাহিনীর মধ্যে যে সামরিক সংঘাত শুরু হয়, তা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ১৯৯৭-এর মাধ্যমে আপাতসমাধান হয়েছিল। এ চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার আদিবাসী জনগণের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে স্বীকৃতি দেয়। এ চুক্তির একটি বড় দিক ছিল ওই অঞ্চলে একটি বিশেষ শাসনব্যবস্থা চালু করা, যা ওই অঞ্চলের ভূমি বিরোধসংক্রান্ত সমস্যা, সামরিক ক্যাম্প প্রত্যাহার, আদিবাসী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করার কাজ করবে। তবে এর বেশির ভাগ বিধান এখন পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি; কিছু বিধান আংশিকভাবে সমাধান করা হয়েছে।

শান্তিপ্রক্রিয়া প্রসঙ্গ

১৯৮০ সালের দিকে আন্তর্জাতিক দাতাদের সমালোচনার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সশস্ত্র বিদ্রোহ সমস্যার সমাধান করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি সামনে আনার ক্ষেত্রে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের ভূমিকা প্রণিধানযোগ্য।

১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলসংক্রান্ত সব বিষয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে চলে আসে।[৩৪] সেই সঙ্গে বাংলাদেশ সরকার শান্তিবাহিনীকে মোকাবিলার জন্য সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা সুদৃঢ়ভাবে অনুভব করার কারণে এ অঞ্চলে সামরিক বাহিনীর কার্যক্রম বৃদ্ধি পায়।[৩৫] ইতিহাস পর্যালোচনা থেকে দেখা যায়, শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর ভারত শান্তিবাহিনীকে সাহায্য করেছিল বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার

জন্য।[৩৬] শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ভারত শান্তিবাহিনীর প্রতি তাদের সাহায্য প্রত্যাহার করে।[৩৭] অন্যদিকে কিছু আদিবাসী জনগোষ্ঠী জুম্মা সম্প্রদায়ের মধ্যে চাকমা আধিপত্য নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং এটিকে মোকাবিলা করার জন্য সর্বোচ্চ জুম্মা পরিচয়ের পরিবর্তে তাদের নিজস্ব আদিবাসী পরিচয়কে প্রাধান্য দেয়।[৩৮]

পার্বত্য চুক্তির স্বচ্ছতা পর্যবেক্ষকদের দ্বারা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। এই আপস-প্রক্রিয়া আওয়ামী লীগ অথবা তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতাদের জানা ছিল না। অভিযোগ রয়েছে, সামরিক বাহিনীর একটি অংশ রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের কাছে নিজেদের তৈরি করা আলোচ্য বিষয়বস্তু পর্যালোচনার জন্য প্রদান করে।[৩৯] যদিও সরকার দাবি করে থাকে যে পার্বত্য চুক্তির বেশির ভাগ ধারাই বাস্তবায়ন করা হয়েছে, কিন্তু সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও কর্মকাণ্ড প্রশ্নবিদ্ধ। বলা হয়ে থাকে যে যদিও ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তি বিদ্রোহ এবং সামরিক অপারেশন বন্ধ করেছে, তবুও এই চুক্তি এ অঞ্চলের ওপর থেকে সামরিক বাহিনীর কার্যত প্রভাব দূর করতে পারেনি।[৪০] সরকারি বাহিনী দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘন একটি উদ্বেগের কারণ হিসেবে এখনো রয়ে গেছে, যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে দেখানো হয়।[৪১] তা ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সম্প্রতি বৌদ্ধদের ওপর আক্রমণের পাশাপাশি বাংলাদেশি ও আদিবাসীদের মধ্যে সময়ে সময়ে সংঘর্ষ হয়েছে।[৪২] পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী এ অঞ্চল থেকে সামরিক বিস্তার কমানোর কথা ছিল, কিন্তু সেটা অব্যাহত রয়েছে। ধারাবাহিক সরকারগুলো জোর দিয়ে বলেছে যে বৃহৎ সামরিক উপস্থিতি এ অঞ্চলে সন্ত্রাস দমন এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন, যদিও সামরিক দাঙ্গা শেষ হয়েছে।[৪৩]

জাতীয়তাবাদ : বৈধতার হাতিয়ার

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে জাতিরাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ জাতিগত দ্বন্দ্ব সম্পদের সঙ্গে অনেকাংশে সম্পর্কযুক্ত।[৪৪] যেখানে সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও দ্বন্দ্বের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে, সেখানে পরিচয় ও স্বীকৃতির মতো বিষয়গুলো অনেকাংশে উপেক্ষিত থাকে। অ্যাক্সেল হনেথের গবেষণায় এর আভাস দেখা যায়। হনেথ বলেন, নৈতিক অশ্রদ্ধা এবং সামাজিক সংঘাতের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে।[৪৫] স্বার্থসংগ্রামের ওপর ভিত্তি করে হতে পারে, এ ধারণা মাথায় রেখে হনেথ মনে করেন যে সামাজিক দ্বন্দ্ব শুধু স্বার্থ দিয়েই চালিত হয় না, বরং এটি নৈতিক প্রতিক্রিয়া দ্বারাও চালিত।[৪৬] তাই সামাজিক সংঘাতকে আপাতদৃষ্টিতে সম্পদের ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা বা সম্পদের পুনর্বিন্যাস-সংক্রান্ত মনে

হলেও তার মূলে থাকতে পারে আত্মপরিচয়ের স্বীকৃতি না পাওয়ার বিষয়। এ সূত্র ধরে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা জাতীয়তাবাদ ও আদিবাসী পরিচয়ের বিষয়কে পর্যালোচনা করতে গেলে দুটি মতামত পেতে পারি। প্রথমত, বাঙালি পরিচয় প্রধানত পশ্চিম পাকিস্তানিদের সমগোত্রীয় ও ইসলামভিত্তিক জাতীয় পরিচয় আরোপের প্রতিক্রিয়া। দ্বিতীয়ত, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় আদিবাসীরা নিজেদের পরিচয়কে সংহত করতে চাওয়ার মূলে রয়েছে বাঙালিত্বকে রাষ্ট্রের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করা। শেন্ডেল সঠিকভাবে দেখিয়েছেন যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর যেভাবে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর উর্দু চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, শেখ মুজিব একই অনমনীয় জিনিসের পুনরাবৃত্তি করেন পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ওপর।[৪৭] পরিণামে বাঙালি পরিচয় চাপিয়ে দেওয়ার ফলাফল হিসেবে আদিবাসীদের নিজস্ব পরিচয় হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় এবং পরিণতিতে সহিংস সংঘাতের উৎপত্তি হয়।

বাঙালি পরিচয় গড়ে উঠেছে 'সোনার বাংলা' কল্পনার ওপর ভিত্তি করে তাদের নিজস্ব আলাদা পরিচয় অর্জন করার জন্য, যেখানে পাকিস্তানি এলিট তাদের ওপর ভিন্ন পরিচয় চাপিয়ে দিয়েছিল। এই সোনার বাংলা পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রিয় শিল্পকলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে গড়ে ওঠে।[৪৮] প্রাক্‌স্বাধীন রাজনৈতিক সমাবেশগুলোতে স্লোগান হিসেবে প্রশ্ন তোলা হতো, 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?'[৪৯] পূর্ব বাংলার মুসলিম বাঙালিরা 'বাঙালি মুসলিম' পরিচয় সৃষ্টি করে বাংলার ওপর তাদের ঐতিহাসিক দাবির ভিত্তিতে। সোনার বাংলা কল্পনা বলতে পুরো বাংলা গঠনকে বোঝায়, যদিও রাজনৈতিক বাস্তবতায় পূর্ব বাংলার জাতীয় দাবি শুধু পূর্ব বাংলার ওপর ভিত্তি করে জাহির করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই বাঙালি পরিচয় বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অন্য পরিচয়গুলোর অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যান করে।

বাঙালি পরিচিতির বিপরীতে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ধারণা মধ্য সত্তর দশকে বিএনপি (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল) প্রস্তাব করে। সংবিধান সংশোধনীতে 'বাঙালি' শব্দের স্থলে 'বাংলাদেশি' শব্দ প্রতিস্থাপন করা হয়। এটি এমন একটি জাতীয়তাবাদী ধারণা প্রদান করে, যা বাংলাদেশে বসবাসকারী সবাইকে একটি রাষ্ট্রের মধ্যে সমমর্যাদার অধিকারী করে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশি জাতীয়তা একটি বাংলাদেশি নাগরিকত্বভিত্তিক সামগ্রিক পরিচয় প্রদান করতে সচেষ্ট হয়, যা বাঙালি জাতীয়তাবাদ করতে ব্যর্থ হয়।

বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ইতিমধ্যেই বিদ্রোহ শুরু হয়ে যাওয়ার কারণে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের সর্বব্যাপকতা থাকা সত্ত্বেও তা আদিবাসীদের আকর্ষণ করতে পারেনি। একই সঙ্গে বিএনপি সরকারও নীতিগতভাবে আদিবাসীদের

দাবির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়। তারা দাবি করে যে ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চুক্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থ রক্ষায় এ পর্যন্ত অনেক ছাড় দেওয়া হয়েছে। ২০০৫ সালে ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় বিএনপি সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ভূমি দখল অব্যাহত রাখে। একই সঙ্গে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ২০১১ সালে সংসদে সন্তু লারমাকে 'সন্ত্রাসী' হিসেবে আখ্যা দেন।

'বাঙালিই প্রথম' ধারণার উদ্ভব

জাতীয় পরিচয়ের দাবির ক্ষেত্রে নতুন দিক উন্মোচিত হয়, যখন বাঙালিরা দাবি করে যে তারাই পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রথম বসবাস শুরু করে।[৫০] আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে এটি একটি নতুন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। 'বাঙালিই প্রথম' ধারণাটি একজন ঔপনিবেশিক প্রশাসকের লেখার ওপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়, যেখানে তিনি জোর দেন যে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগণ মূলত আরাকান অঞ্চল থেকে আসা অভিবাসী।[৫১] আরও বিশেষভাবে এটি ১৭৭৭ সালে ঔপনিবেশিক প্রশাসকের পার্বত্য উপজাতিদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।[৫২] কিছু গবেষণায় দেখা যায়, এ অঞ্চলের আদিবাসীরা ১৫ শতকের শুরুর দিকে মিয়ানমার থেকে এসেছে; যদিও এ অঞ্চলের মূল বসতি স্থাপনকারী কারা, সেটা নিয়ে এসব গবেষণায় কিছু পাওয়া যায় না।[৫৩] তবুও ঔপনিবেশিকদের তৈরি 'উপজাতিবাদ' এবং আদিবাসীদেরও মর্যাদাহানিকর জাতি, বিশেষত তাদের বন্য জাতি, হিংস্র, আদিম এবং অ্যাবরিজিনাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা অন্যদিকে বাঙালি উৎকর্ষকে তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে।[৫৪] অন্যদিকে সমভূমির মানুষের সঙ্গে উপজাতিদের যোগাযোগ ছিল কি না, তার চেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, এই এলাকার জলবায়ু সমভূমির মানুষের বসতি স্থাপনের উপযোগী ছিল না। এই ভৌগোলিক বিষয়টি তাদের এ অঞ্চলে অভিবাসনে ব্যাপকভাবে নিরুৎসাহিত করেছে।'[৫৫]

২০১১ সালের ৩০ জুন পঞ্চদশ সংশোধনীর প্রেক্ষাপটে ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরে আদিবাসী পরিচয়ের সমস্যাটি আবার সামনে আসে। এই সংশোধনী পঞ্চম সংশোধনীকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করে। 'বাংলাদেশের জনগণ বাঙালি হিসেবে পরিচিত হবে এবং তাদের নাগরিকত্ব হবে বাংলাদেশি।'[৫৬] প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয় সংসদে বলেন, 'নাগরিক হিসেবে আমরা বাংলাদেশি এবং আমাদের জাতীয়তা বাঙালি।'[৫৭] আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে 'বাঙালি' একটি মৌলিক মতাদর্শগত অবস্থান নিয়েছে, যদিও একই বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী যোগ করেন, 'বাঙালিদের মতো অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী যেমন : সাঁওতাল, চাকমা, গারো ইত্যাদির নিজস্ব পরিচয় থাকা উচিত।'[৫৮] এভাবে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের মধ্যে সব জাতিগোষ্ঠীর ওপর বাঙালিদের আইনি আধিপত্য আবার প্রতিষ্ঠিত হলো। একজন গবেষক বলেন :

> সংবিধানের ৬ নম্বর অনুচ্ছেদকে রাষ্ট্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ওপর নৃশংস নীতি-হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। যে আদিবাসী অবাঙালিরা সুপ্রাচীনকাল থেকে এ অঞ্চলে বসবাস করছে, এটি তাদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব রদ কর। এটি রাষ্ট্রের আমলা, আইন প্রণয়নকারী, বিশেষত সেনাবাহিনীর অফিসারদের পার্বত্য অঞ্চলে যুদ্ধের একটি ভয়ংকর 'আইনি নিদর্শন' প্রদান করে। 'আমরা' অন্যদের পরোয়া করি না।[৫৯]

সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনির বিবৃতি এটাই নির্দেশ করে, যখন তিনি জোর দিয়ে বলেন, পঞ্চদশ সংশোধনীর অধীনে বাংলাদেশে বসবাসরত অবাঙালিরা আদিবাসীও নয় পাহাড়িও নয়। বরং তারা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী। তিনি যুক্তি দেন যে 'আদিবাসী জনগণ' একটি ভুল নাম। দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশ এবং বাঙালি জাতিরাষ্ট্র প্রাচীন নৃতাত্ত্বিক ভিত্তি, ঔপনিবেশিক ইতিহাস এবং বাঙালি জাতিগত পরিচয় সম্পর্কে বৈশ্বিক ভুল ধারণার শিকার।[৬০] তিনি বলেন যে প্রত্নতাত্ত্বিক ফলাফল অনুযায়ী, বাঙালিরা বাংলাদেশের আদি বসতি স্থাপনকারী, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীরা এখানে পরে এসেছে এবং এভাবে তিনি বাঙালিদের 'বাঙালিই প্রথম' দাবিকে সমর্থন করেন।

এর প্রতিক্রিয়ায় চাকমা রাজা বলেন, যেহেতু বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনশনের ১০৭ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুমোদন দিয়েছে, তার মূলকথা অনুযায়ী আদিবাসী জনগণের কোনো ভূমিতে তাদের অধিকার দাবি করার জন্য একটি জায়গায় হাজার বছর ধরে বসবাস করার প্রয়োজন নেই।[৬১] একই সঙ্গে তিনি জাতিগোষ্ঠী হিসেবে আদিবাসীদের স্বীকৃতি দিলে ১ দশমিক ২ শতাংশ জনগণ বাকি ৯৮ শতাংশের ওপর আধিপত্য বিস্তার করবে বলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে আশঙ্কা করেছেন, সেই আশঙ্কাও অমূলক বলে মন্তব্য করেন। তা ছাড়া যদি অভিবাসনের প্রসঙ্গ সামনে আনা হয়, তাহলে বাংলাদেশের আদি বসতি কারা স্থাপন করেছে, সেই প্রশ্নটিও সামনে চলে আসে। এ ক্ষেত্রে বিতর্কিত প্রসঙ্গটি হবে যে বাংলাদেশে বসবাসকারী বাঙালিরা কোথা থেকে এসেছে? তারা কি আদৌ বাংলা ভাষাভাষী ছিল, নাকি উর্দুভাষী মুসলিম ছিল, নাকি বর্তমানকালের ভারত বা মিয়ানমার থেকে এসে এই সমতলভূমিতে বসতি স্থাপন করেছে?

একটি কৌতূহলোদ্দীপক প্রসঙ্গ হলো পররাষ্ট্রমন্ত্রী উয়ারী-বটেশ্বরের খননের ওপর ভিত্তি করে প্রত্নতাত্ত্বিক ফলাফলের মাধ্যমে 'বাঙালিই প্রথম' ধারণার যে দৃঢ়

উক্তি দিয়েছেন, তা পরবর্তী গবেষণার ফলে বাতিল হয়ে যায়।[৬২] উয়ারী-বটেশ্বরের খননকাজ যা বাঙালিদেরকে চার হাজার বছর ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাসিন্দা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি করে তার ভৌগোলিক সীমারেখা বাংলাদেশের বর্তমান ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। এ আবিষ্কার 'বাঙালিই প্রথম' ধারণার প্রতি একটি আঘাত হিসেবে আবির্ভাব হলেও রাজনৈতিকভাবে তা বেশি আমলে নেওয়া হয়নি। শাহবাগ আন্দোলনে দেখা যায়, ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে যে আন্দোলন হয়, তার একটি প্রেক্ষাপট ছিল বাঙালি পরিচয়কে প্রাধান্য দেওয়া। আদিবাসীরা যারা এখানে অংশগ্রহণ করেছিল, তারা বাঙালি আধিপত্য স্বীকৃতিকারী রাজনৈতিক স্লোগানের কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।[৬৩]

২০১৩ সালে পার্বত্য চুক্তির ১৬তম বার্ষিকী থাকলেও এর বাস্তবতা শুধু কাগজ-কলমে সীমাবদ্ধ রয়েছে। যেহেতু এটা আওয়ামী লীগ সরকারের সময় স্বাক্ষরিত হয়েছিল, সেহেতু বাস্তবায়নের দায়ভার তাদের ওপর অনেকাংশে বর্তায়। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে মাত্র দুবার ওই অঞ্চল সফরে যান। যদিও ২০০৮ সালের নির্বাচনে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন তাদের অন্যতম নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল, কিন্তু তাদের অঙ্গীকার অপূর্ণ থেকে গেছে।[৬৪]

শেষ কথা

এটা প্রমাণিত যে বাংলাদেশে পরিচয়ের রাজনীতি শুধু বাঙালি পরিচয়কেই প্রাধান্য দেয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের 'অবস্থানগত আধিপত্যকে' তুলে ধরে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে সংখ্যালঘুদের অধিকার খর্ব করেছে। বলিবার বলেছেন, এটা 'প্রক্ষিপ্ত' মতাদর্শ হিসেবে জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত ব্যবহার।[৬৫] একইভাবে আমরা হবসবামের যুক্তি দিয়ে বিচার করতে পারি কীভাবে একটি রাষ্ট্র জাতীয়তার বন্ধন দৃঢ় করতে জনগণকে উৎসাহিত করে এবং 'জাতীয়' প্রতিষ্ঠান তৈরি করে।[৬৬] গ্রামসীয় বিশ্লেষণ অনুযায়ী, আওয়ামী লীগ সাংস্কৃতিক কর্তৃত্বের একটি ক্লাসিক উদাহরণ স্থাপন করেছে, যেখানে রাজনৈতিক নাগরিক সমাজ তাদের নিজস্ব স্বার্থের কারণে সমাজের তত্ত্ব ও অর্থ সৃষ্টি করেছে।[৬৭] এভাবে বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠদের অধিকারই প্রধান হয়ে উঠেছে। বাঙালি আধিপত্যের কাছে সংখ্যালঘু আদিবাসীদের অবস্থানগত পরিচয় পুরোপুরি ম্লান হয়ে পড়েছে। সংখ্যালঘু আদিবাসীদের অধিকার ও অবস্থা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আদর্শের কোনো প্রভাব নেই বললেই চলে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. See Kawser Ahmed, 'Defining "Indigenous" in Bangladesh : International Law in Domestic Context,' *International Journal on Minority and Group Rights* 17: 47 (2010).

২. Anthony D. Smith, 'Nations and History,' in Montserrat Guibernau and John Hutchinson, eds., *Understanding Nationalism* (UK: Polity Press, 2001), 23.

৩. John Eade, 'Ethnicity and the Politics of Cultural Difference : An Agenda for the 1990s?,' in Terence Ranger, Yunas Samad, and Ossie Stuart, eds., *Culture, Identity and Politics : Ethnic Minorities in Britain* (UK : Ashgate, 1996), 58.

৪. John Brown Childs and Guillermo Delgado-P, 'On the Idea of the Indigenous,' *Current Anthropology* 40(2) : 211 (1999).

৫. Ibid., 211.

৬. Ibid., 211.

৭. M. Carmen Hidalgo and Bernardo Hernandez, 'Place Attachment : Conceptual and Empirical Questions,' *Journal of Environmental Psychology* 21: 274 (2001).

৮. Ernest Gellner, *Nations and Nationalism* (Ithaca, NY : Cornell University Press, 1983), 38.

৯. Benedict Anderson, *Imagined Communities : Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (London, UK : Verso, 2006), 201.

১০. Montserrat Guibernau, *The Identity of Nations* (UK : Polity Press, 2007), 17.

১১. Kemal H. Karpat, *The Politicization of Islam: Reconstructing Identity, State, Faith, and Community in the Late Ottoman State* (Oxford, UK : Oxford University Press, 2001).

১২. Manjusha S. Nair, 'Defining Indigeneity: Situating Transnational Knowledge,' World Society Focus Paper Series, January 2006, http://www.rci.rutgers.edu/?manjusha/ (accessed 13 June 2013).

১৩. Pankaj Mishra, *Temptations of the West: How to be Modern in India, Pakistan, Tibet, and Beyond*, Farrar, Straus, and Giroux, 2006; Sanjib Baruah, *India Against Itself: Assam and the Politics of Nationality* (Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 1999).

১৪. Robert J. C. Young, *The Idea of English Ethnicity* (UK : Blackwell Publishing, 2008), 2.

১৫. Ibid., 197.

১৬. S. N. Eisenstadt, 'The Kemalist Revolution in Comparative Perspective,' in Ali Kazancigil and Ergun Ozbudun, eds., *Ataturk : Founder of a Modern State* (London, UK : Hurst & Company, 1997), 140.

১৭. Fareed Zakaria, *The Post-American World* (New York, NY : W. W. Norton & Company, 2008).

১৮. Etienne Balibar, *Politics and the Other Scene*, trans. Christine Jones, James Swenson, and Chris Turner (London, UK : Verso, 2002).

১৯. Harun-Or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh : Bengal Muslim League and Muslim Politics 1906–1947* (Dhaka : The University Press Limited, 2003), 324.

২০. BANGLAPEDIA : National Encyclopedia of Bangladesh, http://www.banglapedia.org/HT/ P_0226.HTM, (accessed 6 June 2013).

২১. Amena Mohsin, 'Identity, Politics and Hegemony : The Chittagong Hill Tracts, Bangladesh,' *Identity, Culture and Politics* 1(1) : 82 (2000).

২২. Khairul Chowdhury, 'Politics of Identity and Resources in Chittagong Hill Tracts, Bangladesh : Ethnonationalism and/or Indigenous Identity,' *Asian Journal of Social Sciences* 36 : 62 (2008).

২৩. Capt. T. H. Lewin, *Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers Therein* (Calcutta : Bengal Printing Company Limited, 1869), 4.

২৪. The liberals have usually argued that the British policy was indeed used to segregate the Bengalis and the indigenous people, which could be interpreted as saying that had the British not created such a policy, the migration and settlement of Bengalis might not have assumed such a political issue in the present context. This has been one of the dominant views of Bangladeshi scholars writing on the CHT issue. For example, see Amena Mohsin, *The Politics of Nationalism : the Case of the CHT*, *Bangladesh* (Dhaka : The University Press Limited, 1997).

২৫. Mizanur Rahman Shelley, *The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh : The Untold Story* (Bangladesh : Centre for Development Research, 1992), 29.

২৬. Amena Mohsin, 'The Chittagong Hill Tracts/Bangladesh,' *Kreddha Autonomy Mapping Project*, http://kreddha.org/mapping/downloads/CHT.pdf (accessed 6 June 2013).

২৭. Eshani Chakraborty, 'Understanding Women's Mobilization in the Chittagong Hill Tracts Struggle : The Case of Mahila Samiti,' Conference Paper Presented at 15th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia, http://coombs.anu.edu.au/SpecialProj/ASAA/biennialconference/2004/Chakraborty-E-ASAA2004.pdf, 6 (accessed 17 June 2013).

২৮. Nasir Uddin, 'Politics of Cultural Difference : Identity and Marginality in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh,' *South Asian Survey* 17(2) : 290 (2010).

২৯. Wilhelm van Schendel, 'The Invention of the "Jummas" : State Formation and Ethnicity in Southeastern Bangladesh,' *Modern Asian Studies* 26(1) : 126 (1992).

৩০. *The Constitution of Bangladesh*, http://bdlaws.minlaw.gov.bd/sections_detail.php?id=367&sections_id=24557 (accessed 6 June 2013).

৩১. Subir Bhaumik, *Insurgent Crossfire : Northeast India* (New Delhi, India : Lancer Publishers, 2008), 86.

৩২. As cited in Willem Van Schendel, *A History of Bangladesh* (New Delhi, India : Cambridge University Press, 2009), 186.

৩৩. Shanti Bahini (Forces of Peace) was formed as early as 1973. See Iftekharul Bashar, 'Bangladesh's Forgotten Crisis: Land, Ethnicity, and Violence in Chittagong Hill Tracts,' *International Center for Political Violence and Terrorism Research*, 3(4) : (2011), http://www.hpu.edu/CHSS/History/ PapersCommentariesStudies/CTTA-April11.pdf (accessed 6 June 2013).

৩৪. 'Militarization in Chittagong Hill Tracts, Bangladesh : The Slow demise of the Region's Indigenous People,' IWGIA Report, May 2012, http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0577_Igia_report_14_optimized.pdf, 13 (accessed 6 June 2013).

৩৫. Amena Mohsin, 'The Chittagong Hill Tracts/Bangladesh.'

৩৬. Jenneke Arens and Kirti Nishan Chakma, 'Bangladesh : Indigenous Struggles in the Chittagong Hill Tracts,' *Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict*, http://conflictprevention.net/page.php?id=40&formid=73&action=show&surveyid=14 (accessed 13 June 2013).

৩৭. Amena Mohsin, 'The Chittagong Hill Tracts/Bangladesh.'

৩৮. Abul Hasnat Monjurul Kabir, 'Bangladesh : A Critical Review of the Chittagong Hill Tracts (CHT) Peace Accord' (Working Paper 2, The Role of Parliaments in Conflict and Post Conflict in Asia), http://www.academia.edu/2504753/Bangladesh_A_Critical_Review_of_the_Chittagong Hill_Tract_CHT_ Peace_Accord, 18 (accessed 6 June 2013).

৩৯. Abul Hasnat Monjurul Kabir, 'Bangladesh,' 19.

৪০. 'Militarization in Chittagong Hill Tracts, Bangladesh,' 8.

৪১. 'Implementation of CHT Peace Accord : Will They, Won't They?,' *Indigenous Research Quarterly* IV(1–2) : (2009), http://www.aitpn.org/IRQ/Vol-IV/issue_1-2/story04.html (accessed 6 June 2013).

৪২. Inam Ahmed and Julfikar Ali Manik, 'Attacks on Buddhist Temples : A Hazy Picture Arises,' *The Daily Star*, 3 Oct. 2012, http://archive.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=252212 (accessed 6 June 2013).

৪৩. Phil Humfhreys, 'Peace in Our Time?,' *The Dhaka Tribune*, 6 Dec. 2013, http://www.dhakatribune.com/bangladesh/2013/dec/06/peace-our-time (accessed 11 Dec. 2013).

৪৪. This was argued especially in case of ethnic conflicts taking place in Africa and Southeast Asia. See, for example, Solomon C. Madubuike, 'Ethnic Conflicts : Social Identity and Resource Control, Agitations in the Niger Delta,' *IFRA.com*, 2009, http://www.ifra-nigeria.org/IMG/pdf/Solomon_C-_MADUBUIKE__Ethnic_Conflicts_Social_Identity_and_Resource_Control_Agitations_in_the_Niger_Delta.pdf, (accessed 17 June 2013); Cyril Obi, 'Nigeria's Niger Delta: Understanding the Complex Drivers of Violent Oil-Oriented Conflict,' *Africa Development* XXXIV(2) : (2009); Peter Vandergeest, 'Racialization and Citizenship in Thai Forest Politics,' *Society & Natural Resources: An International Journal* 16(1) : (2011).

৪৫. Axel Honneth, *The Struggle for Recognition: TheMoral Grammar of Social Conflicts* (Cambridge : MIT Press, 1995), 162.

৪৬. Ibid., 165.

৪৭. Van Schendel, *A History of Bangladesh*, 186.

৪৮. B. K. Jahangir, *Nationalism, Fundamentalism and Democracy in Bangladesh* (Dhaka : International Centre for Bengal Studies, 2002), 99.

৪৯. Muhammad Ghulam Kabir, *Changing Face of Nationalism : The Case of Bangladesh* (Dhaka: The University Press Limited, 1995), 178.

৫০. Saila Parveen and I. M. Faisal, 'People Versus Power : The Geopolitics of Kaptai Dam in Bangladesh,' *International Journal of Water Resources Development* 18(1) : 201 (2002).

৫১. Lewin, *Hill Tracts of Chittagong*, 28.

৫২. Ibid., 21.

৫৩. Shelley, *The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh*, 26.

৫৪. Uddin, 'Politics of Cultural Difference,' 288.

৫৫. Lewin, *Hill Tracts of Chittagong*, 7.

৫৬. 'Fifteenth Amendment : All Citizens are Bengalees,' *The New Age*, 12 June 2011, http://www.newagebd.com/special.php?spid=5&id=22 (accessed 6 June 2013).

৫৭. 'Citizenship Bangladeshi, Nationalism Bengali : PM,' *BanglaNews24.com*, 28 March 2011, http://www.banglanews24.com/English/detailsnews.php?nssl=ee49fef85e1bed67b9f530391b9c74d9&nttl=2012072617585 (accessed 6 June 2013).

৫৮. Ibid.

৫৯. 'Fifteenth Amendment.'

৬০. '"Indigenous People" A Misnomer: Moni,' *bdnews24.com*, 26 July 26, http://dev-bd.bdnews24.com/details.php?id= 201888&cid =2 (accessed 6 June 2013).

৬১. 'Raja Devasish Rejects FM's Statement,' *The Daily Star*, 28 July 2011, http://archive.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=196091 (accessed 6 June 2013).

৬২. Rahnuma Ahmed, 'Bengalis are Indigenous to Their Lands : An Archaeologist Contends,' *The New Age*, 9 April 2012, http://www.newagebd.com/detail.php?date=2012-04-09&nid=6612 (accessed 10 June 2013).

৬৩. Pahari Promity, 'An Adivasi Speaks: What Brings Me to Shahbag, What Pulls Me Back from It,' in *Alal O Dulal*, http://alalodulal.org/2013/02/25/shahbag-what-pulls-back/ (accessed 10 June 2013).

৬৪. '6th Years of CHT Peace Accord : Govt Initiative Goes Against the Hill People : Sultana Kamal,' *The New Age*, 8 Dec. 2013, http://www.newagebd.com/detail.php?date=2013-12-08&nid=75933#.UqX0afQW02u (accessed 9 Dec. 2013).

৬৫. Balibar, *Politics and the Other Scene*, 58.

৬৬. Eric Hobsbawm, *Nations and Nationalism since 1780 : Programme, Myth, Reality* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1992).

৬৭. Antionio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*, ed. and trans. Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith (New York, NY: International Publishers, 1971).

অনুবাদ সহযোগীতায় : জোশিতা জিহান

গ্রামীণ নারীর পরিবেশ সচেতনতা ও পরিবেশ অবনয়নের প্রতিক্রিয়া

সাবেকুন নাজমুন

সারসংক্ষেপ

প্রাণিজগতের একমাত্র মানুষই পারে তার প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের জন্য পরিবেশ, প্রকৃতিকে পরিবর্তন কিংবা পরিবর্ধন করতে। চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে উন্নয়ন-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এ পরিবর্তন কিংবা পরিবর্ধন সম্ভব হয়। লক্ষণীয় যে এ উন্নয়নকৌশল গ্রহণ কিংবা পরিচালনায় স্থানীয় সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ সীমিত কিংবা নেই বললেই চলে। উপরন্তু এ উন্নয়ন অভিধায় পরিবেশ ও প্রকৃতির বিষয়টিও স্থান পায় না নিরপেক্ষভাবে। পুরুষতান্ত্রিকতার ফলে সৃষ্ট কাঠামো উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের নারীকে তার দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়ে অধিকতর প্রকৃতি-ঘনিষ্ঠ করায় নারীর বিপন্নতা অন্যদের তুলনায় বেশি। এসব অঞ্চলের গ্রামীণ নারীর প্রাত্যহিক খাদ্য, পানি, জ্বালানি ও পশুখাদ্য সংগ্রহের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা তৈরি হয়। এ নির্ভরশীলতা নারীকে পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। এ অবস্থায় নারী শুধু তাঁর জীবন-জীবিকা, পরিবার, সন্তান, গবাদিপশু ইত্যাদি রক্ষা নয়, পরিবেশ রক্ষার জন্য প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন; অনেক ক্ষেত্রে আন্দোলনেও অংশ নেন। পরিবেশসচেতনতা ও পরিবেশ অবনয়নের বিরুদ্ধে নারীর এ সাড়া প্রদান পরিবেশ আন্দোলন ও নারী আন্দোলনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ স্থাপন করে। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় কৃষিজমিকে চিংড়িঘেরে রূপান্তরিত করে চিংড়ি চাষ স্থানীয় পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করছে গত শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে। ফলে স্থানীয় গ্রামীণ জনগণ বাণিজ্যিক চিংড়ির পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাবের বিরুদ্ধে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ আন্দোলনে অংশ নেয়। এ আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ ও আন্দোলনে নারীর নেতৃত্বদান পরিবেশ রক্ষায় বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ: নারী ও প্রকৃতির আন্তসম্পর্ক, পরিবেশ নারীবাদী ধ্যানধারণা, পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো, বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ, উন্নয়নের নেতিবাচক চরিত্র, পরিবেশ অবনয়ন ও পরিবেশ রক্ষায় নারী।

ভূমিকা

নারীর জীবন-জীবিকার সঙ্গে পরিবেশ ও প্রকৃতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এ সম্পর্কের কারণে নারী তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশ অবনয়নের ক্ষেত্রে এ সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে পরোক্ষ এমনকি প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের মাধ্যমে। নির্দিষ্ট কোনো দূষণপ্রক্রিয়ায় যখন পারিপার্শ্বিক পরিবেশের অবনয়ন ঘটে, নারী তা অনুধাবন করতে পারেন সহজেই। পরিবেশদূষণের ফলে সাধারণত যে নেতিবাচক প্রভাব দেখা দেয়, তা হলো: নদীভাঙন, ভূমিক্ষয়, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, নদ-নদী, খাল-বিলে পানির প্রবাহ কমে যাওয়া, বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, মরুকরণপ্রক্রিয়া ইত্যাদি এবং এর ফলে প্রাণীবৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন হওয়া। পরিবেশদূষণের নেতিবাচক প্রভাব সবার ওপরই পড়ে। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোয় নির্ধারিত লৈঙ্গিক শ্রম বিভাজন নারীকে প্রকৃতি-ঘনিষ্ঠ করায় তাঁদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব তুলনামূলক বেশি। কেননা, নারী তার দৈনন্দিন কাজের জন্য পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। পরিবেশবাদী ওয়াগারি মাথাই বলেন,[১] 'The impact of environmental degradation hits our women and children most. They are the ones who remain in the villages struggling with it while the men flock to cities in search of jobs they may never find'. বিশেষ করে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের গ্রামীণ নারী প্রকৃতি থেকে খাদ্য, পানি, জ্বালানি ও পশুখাদ্য সংগ্রহ করে থাকেন, আবার অক্লান্তভাবে প্রকৃতির রক্ষণাবেক্ষণে যেমন বীজ ও খাদ্য সংরক্ষণ, পরিবেশবান্ধব জৈব সার, জ্বালানি তৈরি ইত্যাদির ক্ষেত্রে তার সহজাত জ্ঞান কাজে লাগান। তা ছাড়া নারীরা বৃক্ষরোপণ এবং পরিচর্যাও করে থাকেন। পারস্পরিক এ নির্ভরতার মধ্য দিয়ে প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে নারীর নিবিড় সাহচর্য গড়ে ওঠে। এ কারণে প্রকৃতির যখন অবক্ষয় ঘটে, অবনয়নের সম্মুখীন হয় পরিবেশ, তখন নারীর নিয়মিত জীবনধারা হয় বিঘ্নিত, ক্ষতিগ্রস্ত। এ বিপন্নতাকে প্রতিহত করার জন্য নারী প্রতিবাদমুখর হন এমনকি আন্দোলনেও অংশ নেন। ভারতের বিসনোই ও চিপকো আন্দোলন এর অন্যতম দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীর ক্ষেত্রেও বিষয়টি লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষের জন্য কৃষিজমিকে চিংড়িঘেরে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়ায় নারী ও পরিবেশের ওপর যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে, তার বিরুদ্ধে নিজেকে ও পরিবেশ রক্ষায় নারীর অগ্রগণ্য ভূমিকা লক্ষণীয়। আলোচ্য প্রবন্ধে পরিবেশ নারীবাদী ধ্যানধারণার আলোকে নারী ও প্রকৃতির আন্তসম্পর্ক, এর ফলে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বিষয়ে নারীর সচেতনতা এবং একটি নির্দিষ্ট এলাকায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিরূপ প্রভাবে স্থানিক পরিবেশের অবনয়নের বিরুদ্ধে নারীর সাড়া প্রদানের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশের খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও কক্সবাজার জেলার উপকূলীয় এলাকায় বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষের ফলে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাবের বিরুদ্ধে নারীর ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে।

নারী ও প্রকৃতির আন্তসম্পর্ক

নারীর পরিবেশ সচেতনতা, পরিবেশের রক্ষণাবেক্ষণে সহজাত প্রবণতা, পরিবেশ অবনয়নের প্রতি সাড়া প্রদান, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা প্রভৃতি নারী ও প্রকৃতির আন্তবিজড়িত সম্পর্ক নিয়ে চিন্তাভাবনার উন্মেষ ঘটায়। পরিবেশ নারীবাদীরা তাঁদের ধ্যানধারণার অন্যতম উপাদান হিসেবে নারী ও প্রকৃতির পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতাকে ব্যাখ্যা করেছেন। বিশেষ করে শেরি অর্টনার (১৯৭৪), এরিয়েল কি সালেহ (১৯৮৪), ভল প্লামউড (১৯৮৬), কারেন জে ওয়ারেন (১৯৮৭), বন্দনা শিবা (১৯৮৯), মারিয়া মিজ (১৯৯৩), বীণা আগারওয়াল (১৯৯৭), নোয়েল সাটারজিয়ন (১৯৯৭) প্রমুখ পরিবেশ নারীবাদী তাঁদের মতাদর্শিক অবস্থানের ভিত্তি হিসেবে নারী ও প্রকৃতির অন্তর্গত সম্পর্কের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেন। তাদের মতে, নারী ও প্রকৃতির আন্তসম্পর্ক পরিবেশ নারীবাদের কেন্দ্রীয় উপাদান। কারেন জে ওয়ারেন বলেন, 'Woman nature connections are the backbone of ecofeminism'।[২] পরিবেশ নারীবাদীরা প্রকৃতি ও নারীর মধ্যে নিবিড় যোগাযোগের ক্ষেত্রে জৈবিকতা, আধ্যাত্মিকতা, পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো, ধারণাগত কাঠামো, শোষণমূলক ব্যবস্থা, দ্বৈতবাদ, কর্তৃত্বের যৌক্তিকতা, বস্তুগত বাস্তবতা ইত্যাদি ক্রিয়াশীল বলে মনে করেন। শেরি অর্টনার, এরিয়েল কি সালেহ, জেমস লাভলক, সিলভিয়া ওয়ালবি প্রমুখ মনে করেন নারী ও প্রকৃতির সম্পর্ক জৈবিকতা ও আধ্যাত্মিকতা দ্বারা নির্ধারিত। নারীর জৈবিক নির্মাণ, গর্ভধারণ, সন্তান জন্ম, দুগ্ধদান, লালন-পালন ইত্যাদি বিশেষ ক্ষমতা নারীকে পুরুষ থেকে আলাদা করে। পাশাপাশি প্রকৃতির একই ধরনের ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে নারী ও প্রকৃতির মধ্যে আন্তবিজড়িত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এরিয়েল কি সালেহ বলেন, নারীর মাসভিত্তিক উর্বরতা চক্র, গর্ভাবস্থার মিথোজীবিত্ব, সন্তান প্রসবের বেদনা, শিশুর স্তন্যপানের আনন্দ—সবকিছুই নারীর চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং এ চেতনা প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত।[৩] প্রজনন সক্ষমতার দিক থেকে প্রকৃতির সঙ্গে রয়েছে নারীর সম্পর্ক। অর্থাৎ নারীর পুনরুৎপাদন ভূমিকার সঙ্গে প্রকৃতির একই ধরনের ভূমিকার সামঞ্জস্য রয়েছে বিধায় নারী প্রকৃতির প্রতিরূপে স্থাপিত হয়। বন্দনা শিবা ১৯৯২ সালে প্রকাশিত 'The Seed and the Earth: Women, Ecology and Biotechnology' প্রবন্ধে দেখান প্রকৃতির মধ্যে বীজ ও ভূমিকে বাদ দিয়ে জন্ম,

বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্ভব নয়। বীজ মাটি থেকে পরিপুষ্ট গ্রহণ করে পূর্ণতা লাভ করে, মাটি হলো সব সৃজনশীলতা ও জীবনের উৎস।[৪] শেরি অর্টনার মনে করেন নারীর এ পুনরুৎপাদন ভূমিকা নারীকে প্রকৃতির সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ করে এবং এ সংযোগই প্রসিদ্ধ ও বিকশিত সারসত্তা (essential) রূপে।[৫] প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সারসত্তামূলক অনুভূতিই সংস্কৃতিতে নারী ও প্রকৃতিকে মূল্যহীন এবং পুরুষকে মূল্যায়ন করার ক্ষেত্র তৈরি করে। শেরি অর্টনার ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ 'Is Female to Male as Nature is to Culture?'[৬]-এ দেখিয়েছেন সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিকভাবে পুরুষ কর্তৃক নারীর প্রতি অবদমন নারীকে প্রকৃতিঘনিষ্ঠ করেছে। তিনি বলেন, নারীর অবমূল্যায়নের উৎস হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে নারীর সংশ্লিষ্টতা, বিশেষ করে এ বিশ্বাস যে নারী পুরুষের তুলনায় প্রাকৃতিক জগতের নিকটস্থ, তাঁরা প্রকৃতিকে অতিক্রম করতে অপারগ। অর্টনার প্রকৃতির সঙ্গে নারীর সংশ্লিষ্টতার তিনটি দিকের উল্লেখ করেছেন[৭]: প্রথমত, নারী আগামী প্রজন্মের জন্মদাত্রী। নারী মনুষ্য জাতিকে পুনরুৎপাদন করেন। এ কাজটি পুনরাবৃত্তিমূলক। পক্ষান্তরে, পুরুষ উৎপাদন করেন সংস্কৃতি, তিনি প্রযুক্তি ও প্রতীকের সাহায্যে নতুনত্ব উৎপাদন করেন। দ্বিতীয়ত, নারী ঘর ও গৃহী চক্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। স্তন্যদানের কারণে, মনুষ্য সন্তানের বেড়ে উঠতে অনেক সময় লাগার কারণে, মা ও শিশুর সম্পর্ক কেবল জন্মদানে সীমাবদ্ধ নয়। এবং সর্বশেষ, নারীর মনোজগৎ হচ্ছে প্রকৃতির কাছাকাছি, পুরুষেরটি নয়—বিষয়টিকে এভাবে দেখা হয়। তিনি আরও মনে করেন, নারীর মনোজগৎ পুরুষ থেকে ভিন্ন। তবে সেটি কোনো জৈবিক কিংবা শরীরগত কারণে নয়, এটি ভিন্ন সামাজিকীকরণের কারণে। উল্লিখিত ভাবনা অনুযায়ী প্রতীকীভাবে সব সমাজে নারীকে পুরুষের বিপরীতে দাঁড় করিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করে দেখা হয়।

সুদূর অতীত থেকে নারীর আধ্যাত্মিক শক্তির ওপর গুরুত্ব প্রদান করে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কের যৌক্তিকতা খোঁজার চেষ্টা লক্ষ করা যায়। যেমন ইউরোপের বিভিন্ন ধর্মীয় পুরকথায় মাতৃদেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। গাইয়া, ডায়ানা, আইসিস, ভেনাস, লিলিথ, মারিয়া, সেরোন প্রমুখ মাতৃদেবী কিংবা গডেজের (Goddess) সৃষ্টিশীলতা, আধ্যাত্মিকতা, জীবনদায়ী ভূমিকা ইত্যাদির সঙ্গে নারীর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। জেমস লাভলক (James E. Lovelock) ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত *Gaia: A New Look at Life on Earth* গবেষণা গ্রন্থে গাইয়া দেবীর প্রাণজ শক্তিকে পরিবেশবাদী মডেল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।[৮] লিন্ডা মেরিনা (Linda Marina) ২০০২ সালে প্রকাশিত 'Woman and the Land' প্রবন্ধে ইরকুইজ নারীদের ভূমির মালিকানা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাদের ভূমি দেবীর অনুসরণের বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, পুরাণ অনুযায়ী ইরকুইজ নারীরা ভূমির মালিক হয় যা তাকে

প্রকৃতির সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করে।[৯] ক্রিস্ট (Carol P.Crist) বলেন, জৈবিক জন্মদানে গডেজের সৃষ্টিশীলতা সীমিত নয়, গডেজ সভ্যতার সব কলার (arts) স্রষ্টা, উপশমকারী, লেখক এবং আইনদাতা।[১০] এভাবে গড বা স্রষ্টা রূপে প্রকৃতির সঙ্গে নারীর ধারণাগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ক্যারোলিন মার্চেন্ট ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত *Earthcare* গ্রন্থে গ্রিক পুরাণের দেবী গাইয়া (Gaia), খ্রিষ্টধর্মের ঈভ (Eve) ও মিসরের জীবনদায়ী দেবী আইসিসকে (Isis) প্রকৃতির মূর্তকল্প হিসেবে আখ্যায়িত করে তাঁদের সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে নারীর সৃষ্টিশীলতার তুলনার মাধ্যমে নারী ও প্রকৃতির সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করেন।[১১] বন্দনা শিবা[১২] ভারতের প্রেক্ষাপটে নারীর সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ককে অরণ্য সংস্কৃতির আলোকে বিশ্লেষণ করেন। তিনি মাতৃরূপী নারীকে মাটিরূপী ধরিত্রীর মূর্ত চিত্রকল্প হিসেবে দেখান। তিনি আরও বলেন যে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিতে নারীর সঙ্গে প্রকৃতির রয়েছে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। লোকমানুষ যে দেবীকে পূজা করত, তার নামও অরণ্য দেবী। এভাবে নারী ও প্রকৃতি অবিচ্ছেদ্য হিসেবে মূর্ত হয়।

আধ্যাত্মিকতা ও জৈবিকতা দ্বারা নির্ধারিত নারী ও প্রকৃতির এ রকম সম্পর্কের দরুন নারীর প্রতি শোষণ ও প্রকৃতির প্রতি শোষণের আদর্শগত অভিন্ন ভিত্তি তৈরি হয় মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও বিভিন্ন ব্যবস্থায়, যা নারী ও অমানবীয় প্রকৃতিকে ক্রমান্বয়িকভাবে পুরুষের নিচে স্থাপন করে। ভল প্লামউড বলেন, যুক্তির নির্মাণ থেকে প্রকৃতি বিচ্যুত ও মূল্যহীন হয়ে আবেগ, শরীর, পশুত্ব, আদিম অথবা অসভ্য সমাজ, অ-মানবীয় প্রকৃতি ইত্যাদির সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়, যেখানে যুক্তি থাকে অনুপস্থিত।[১৩] এভাবে দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক অনুশীলন নারী ও প্রকৃতিকে একত্র করে অবদমনের অভিন্ন সূত্রে। অর্থাৎ উভয়ই পুরুষতন্ত্র, লৈঙ্গিক সংস্কৃতি এবং এর প্রতিষ্ঠানসমূহ, মূল্যবোধের মাধ্যমে শোষিত ও নিগৃহীত হয়। কারেন জে ওয়ারেন এ অবস্থাকে পীড়নমূলক ধারণাগত কাঠামো (oppressive conceptual framework), মারে বুকচিন লিঙ্গভিত্তিক শোষণ (gender based exploitation), ভল প্লামউড দ্বৈতবাদী (dualism) ভাবনার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা কর্তৃত্বের যৌক্তিকতা (logic of domination) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। পীড়নমূলক ধারণাগত কাঠামো কিংবা কর্তৃত্বের যৌক্তিকতা দ্বারা গড়ে ওঠা বিভিন্ন শোষণমূলক ব্যবস্থা যেমন : পুঁজিবাদের অধীনে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, বস্তুগত বাস্তবতা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নারী ও প্রকৃতির মধ্যে আন্তসম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাঁরা নারী ও প্রকৃতির এ সম্পর্ককে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোয় অবদমনমূলক মতাদর্শিক কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোয় আধিপত্যবাদের অধীনে ক্রমোচ্চভিত্তিক অবস্থায় নারী ও প্রকৃতির অবস্থান পুরুষের তুলনায় নিচুতে হওয়ায় প্রকৃতি ও নারীর ওপর নিপীড়ন যৌক্তিকতা পায়। ওয়ারেন

পীড়নমূলক ধারণাগত কাঠামোর কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন,[১৪] যেমন: এটি কোনো অবস্থা ও শ্রেণির মাঝে স্তরভেদ সৃষ্টি ও ক্রমোচ্চ কাঠামো প্রদানের মাধ্যমে পার্থক্য তৈরি করে। সমাজে কিছু দ্বৈত ধারণা প্রচলিত আছে, যেখানে মানের স্তরভেদ খুবই প্রকট হওয়ায় একটি থেকে আরেকটি অধস্তন হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে যৌক্তিক ভিত্তি পায়। যেমন: পুরুষেরা উচ্চমানের অধিকারী, যুক্তি ও বুদ্ধি প্রয়োগে সক্ষম, শক্তিধর; অপর দিকে নারী নিম্নমানের অধিকারী, আবেগপ্রবণ, দুর্বল। এ কাঠামো কতগুলো ধারণাকে মূল্যবোধ হিসেবে যৌক্তিকতা দিয়েছে, যা গভীরভাবে সমাজে প্রোথিত। ফলে সমাজে একধরনের দ্বৈততার সৃষ্টি হয়েছে। পীড়নমূলক ধারণাগত কাঠামোর ফলেই পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুরুষ সাপেক্ষে নারী ও মানুষ সাপেক্ষে প্রকৃতি নিচু, হীন ও অধস্তন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

অর্থাৎ পীড়নমূলক ধারণাগত কাঠামোর অধীনে সমাজে নারী ও প্রকৃতির প্রতি শোষণের অভিন্ন ভাবনা তৈরি হয়। শোষণের অভিন্ন মাত্রার মধ্য দিয়ে নারী ও প্রকৃতির মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। ভল প্লামউড নারী ও প্রকৃতির প্রতি অবদমনকে জেন্ডার, রেস, ক্লাসের ভিত্তিতে আলোচনা করতে চান।[১৫] তবে তিনিও কারেন জে ওয়ারেনের মতো পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষ দ্বারা 'প্রকৃতি' এবং পুরুষ দ্বারা 'নারীর' ওপর কর্তৃত্ব করার প্রয়োজনে নির্দেশিত কর্তৃত্বের যৌক্তিকতার (logic of domination) ভূমিকা আলোচনা করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি পশ্চিমা যুক্তিবাদের সমালোচনা করে বলতে চান, পশ্চিমা বিশ্বের যৌক্তিকতাবাদ তত্ত্বে নারী ও প্রকৃতির সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। যেটি দীর্ঘ স্থিতিকাল দার্শনিক ঐতিহ্য তৈরি করে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করে মানব/প্রকৃতি দ্বি-বিভাজন এবং এ দ্বি-বিভাজন অন্যান্য দ্বৈততার (পুরুষ/নারী, যুক্তি/আবেগ ইত্যাদি) সঙ্গে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করে। ফলে এ ধারণার জন্ম হয় যে, মানবগোষ্ঠীর মধ্যে পুরুষ অন্যদের চেয়ে আলাদা (অন্যরা হলো নারী, প্রকৃতি, পশু ইত্যাদি)। এভাবে যৌক্তিকতাবাদ নারী ও প্রকৃতির অধস্তনতাকে ভিত্তি প্রদান করে।[১৬] অর্থাৎ পাশ্চাত্য সমাজের এ আন্তবিজড়িত দ্বৈততা (interwoven dualism) চরমভাবে আন্তবিজড়িত অবদমন যৌক্তিকতার সঙ্গে অভিন্ন সূত্রে গাঁথা। মারিয়া মিজ এ দ্বৈতবাদী দর্শনের শোষণমূলক দিকটিকে ব্যাখ্যা করে বলেন, নারীর ওপর পুরুষাধিপত্যের চর্চা প্রকৃতির ওপর পুরুষের প্রভুত্ব স্থাপনের ক্ষেত্র নির্মাণের মধ্য দিয়েই দ্বৈতবাদী বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে নারী প্রকৃতিরূপে ও পুরুষ মানবরূপে আখ্যায়িত হয়।[১৭]

বন্দনা শিবা ও বীণা আগারওয়াল প্রমুখ অবদমনের অভিন্নসূত্রে সৃষ্ট নারী ও প্রকৃতির এ সংযোগকে পুরুষতন্ত্রের নির্মাণ হিসেবে দেখতে চান। বীণা আগারওয়াল বলেন, 'there are important connections between the domination and oppression of women and the domination and exploitation of nature'.[১৮] তিনি বলেন, উন্নয়নশীল বিশ্বে পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় জেন্ডার-নির্দিষ্ট পথে। এখানে নারী ও প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় বস্তুগত বাস্তবতার ভিত্তিতে। উন্নয়নশীল দেশের কৃষি নারী ও পাহাড়ি নারীর প্রসঙ্গ এনে বীণা আগারওয়াল বলেন, এ নারীরা খাদ্য, পানি, জ্বালানি ও গো-খাদ্যের জোগানদাতা। ফলে যখন পরিবেশ অবনয়ন ঘটে, তখন তারা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একইভাবে দৈনন্দিন মিথস্ক্রিয়ার কারণে এ নারীরা বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করে। এভাবে তারা প্রকৃতি ও পরিবেশের রক্ষণাবেক্ষণে পরম্পরায় অবগত হয়।

বন্দনা শিবার মতে, পশ্চিমা সংকোচনবাদী উন্নয়ননীতি উন্নয়নশীল দেশের নারীর কাজ ও জ্ঞানকে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে সম্পদ বাড়ানোর ভাবনা করতে ব্যর্থ। অর্থাৎ পশ্চিমা মডেলের উন্নয়ন-প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদের অবাধ ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে উন্নয়নশীল দেশের নারী তার দৈনন্দিন জীবনের কাজ হারায়, বিকল্প কাজের ক্ষেত্রে আন্তক্রিয়ার পর্যায়ে নারী শারীরিক ও মানসিক অবসাদ ও অসুস্থতার সম্মুখীন হয়, যা তাকে মানবগোষ্ঠীর মধ্যে প্রান্তিক অবস্থান গ্রহণ করতে বাধ্য করে। বীণা আগারওয়াল যুক্তি দেখান মানব শরীরের ওপর পরিবেশ ক্ষতির প্রভাব জেন্ডার নিরপেক্ষভাবেই ঘটে থাকে। কিন্তু নারী তার পুনরুৎপাদনমূলক ভূমিকার জন্য বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শুধু তা-ই নয়, নারীর ক্ষীণ স্বাস্থ্যও এর অন্যতম কারণ।[১৯] বন্দনা শিবা ও মারিয়া মিজও মনে করেন শিল্পায়নের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয় মানবদেহ হিসেবে নারী ও পুরুষ উভয়কেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। যদিও তাঁরা বলতে চান যে নারী অধিকতর প্রকৃতির কাছে থাকে পুরুষের তুলনায় এবং অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের নারীরা তাদের দৈনন্দিন কাজের প্রয়োজনে উন্নত দেশের শহুরে ধনী ও মধ্যবিত্ত নারী ও পুরুষের চেয়ে বেশি প্রকৃতিঘনিষ্ঠ হয়। এ কারণে এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক বিপর্যয় নারীকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে পুরুষের তুলনায়।

নারী ও প্রকৃতির সম্পর্ক বিশ্লেষণে নারীর জৈবিক নির্মাণ, আধ্যাত্মিক অনুভূতি, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, বিশ্বাস, পুরুষতন্ত্র, শ্রম বিভাজন, শ্রেণি, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ইত্যাদি ভেদে ভিন্নতা, সামরিকায়ন, যৌনবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, গোষ্ঠীবাদ, অবদমনমূলক কাঠামো, দ্বৈতবাদী চিন্তাভাবনা প্রভৃতি আলোচনায় স্থান পাওয়ায় তাত্ত্বিকদের মধ্যে মতদ্বৈধতা লক্ষণীয়। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে নারী ও প্রকৃতির সম্পর্ক যে রূপেই নির্মিত হোক না কেন তা সভ্যতার সংকটের প্রতি সাড়া প্রদান করে এর অন্তর্গত শোষণমূলক ক্ষমতাকাঠামোয় বিদ্যমান জেন্ডার

সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়।[২০] তবে নারী ও প্রকৃতির আন্তসম্পর্ক নির্ণয় সাপেক্ষে পরিবেশ নারীবাদীরা প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় নারীর অগ্রগণ্য ভূমিকার অবতারণা করেছেন। তাঁরা নারীকে 'প্রকৃতিসুলভ' ও প্রকৃতিকে 'নারীসুলভ' হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন।[২১] তাঁরা মনে করেন, প্রকৃতির বিপন্নতা রোধে নারী ভূমিকা পালন করার মাধ্যমে নিজের প্রতি শোষণ, অবদমনও অবসান করতে পারবে। অবশ্য বীণা আগারওয়াল প্রকৃতি, পরিবেশ রক্ষায় নারীর জ্ঞান উন্নয়নের বিকল্প অ্যাপ্রোচ (approach) হতে পারে বলে মনে করেন।[২২]

বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশের উপকূলীয় গ্রামীণ নারী ও প্রকৃতির পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা, নিয়মবহির্ভূতভাবে চিংড়ি চাষের দরুন সৃষ্ট পরিবেশ অবক্ষয়ে নারীর বিপন্নতার স্বরূপ এবং পরিবেশ ও নিজের বিপন্নতাকে প্রতিহত করার জন্য নারীর ভূমিকাকে বিশ্লেষণের জন্য প্রকৃতি ও নারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে জৈবিকতা, মতাদর্শিক ও বস্তুগত বাস্তবতা উভয় আলোচনাকে গ্রহণ করা হয়েছে।

এক গবেষণায় দেখা যায়, প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা নারীকে পরিবেশ ব্যবস্থাপক হিসেবে গড়ে তোলে।[২৩] প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে নারী সম্পৃক্ত থাকায় পরিবেশের অবনয়ন যখন ঘটে, তখন নারীর ওপর এর প্রভাব পড়ে।[২৪] এমতাবস্থায় প্রতিবাদের মাধ্যমে নারী নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি পরিবেশের অবনয়ন রোধে কার্যকর ভূমিকা পালন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লক্ষণীয় এবং বাংলাদেশেও দৃশ্যমান হয়েছে। বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলে উন্নয়নের নামে চিংড়িঘের স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হলে গ্রামবাসীরা বাণিজ্যিক চিংড়ির পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনে অংশ নেয়। এ আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ ও আন্দোলনে নারীর নেতৃত্বদান পরিবেশ রক্ষায় বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

উপকূলীয় গ্রামীণ নারী দৈনন্দিন খাদ্য, পানি, জ্বালানি ও পশুখাদ্য সংগ্রহ, বৃক্ষরোপণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল হয়। এ নির্ভরশীলতা নারীকে পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। এ সচেতনতার ফলে নারী সহজেই প্রকৃতি ও পরিবেশের সুস্থতা রক্ষায় উদ্যোগী হয়। গড়ে ওঠে নারী ও প্রকৃতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। গ্রামীণ নারীরা দৈনন্দিন গৃহস্থালি কাজ ও পানের জন্য প্রয়োজনীয় পানি সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করে থাকে। গৃহস্থালির কাজে পানি সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রায় সব নারী পুকুর/ডোবা, নদীনালা কিংবা পুকুর ও নদী উভয় উৎস থেকেই পানি সংগ্রহ করে থাকে। উল্লেখিত এলাকায় লবণাক্ততার কারণে স্বল্পসংখ্যক টিউবওয়েল রয়েছে, যেগুলো থেকে নারীরা সুপেয় পানি সংগ্রহ করে থাকে। সুপেয় পানির টিউবওয়েলগুলো গ্রামের নারীদের নিজ গৃহ থেকে বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত।

পরিবারের সদস্যসংখ্যা ও চাহিদার ওপর নির্ভর করে দুই বা ততোধিকবার পানি সংগ্রহ করতে যেতে হয়। অথাৎ এ নারীদের দৈনন্দিন কাজের একটি বৃহৎ সময় সুপেয় পানি সংগ্রহে ব্যয় হয়। শুধু পানি নয়, জ্বালানি সংগ্রহ ও তৈরিতেও গ্রামীণ নারীদের প্রচুর সময় ও শ্রম ব্যয় করতে হয়। ইশরাত শামিম ও খালেদা সালাউদ্দিন এক গবেষণায় দেখান, বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে জ্বালানি ও সুপেয় পানির ঘাটতি এবং এ ঘাটতির ফলে গ্রামীণ পরিবারগুলোয় নারীদের অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতে হয়।[২৫]

গ্রামের নারীরা রান্নার কাজে মাটির তৈরি একধরনের চুলা ব্যবহার করে থাকেন। শুকনা ছোট ডালপালা, খড়ি, লতা-পাতা, কচুরিপানা, শণ (শুকনা ধানগাছ), ঘুসে (গোবর দিয়ে চ্যাপ্টা করে বানানো যা কয়েক দিন রোদে শুকিয়ে জ্বালানি হিসেবে সংরক্ষণ করে ব্যবহার করা হয়), বইড়ে (এটিও গোবর দিয়ে হাতে তৈরি জ্বালানি, পাঠখড়ি কিংবা চিকন ডালের মধ্যে পুরো করে গোবর মাখিয়ে শুকিয়ে ব্যবহার করা হয়) ইত্যাদি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গৃহে জ্বালানি তৈরি ও সংগ্রহের কাজ সাধারণত নারীরাই করে থাকে। ভারতের প্রেক্ষাপটে এক গবেষণায় দেখা যায়, যেখানে মরুকরণের ফলে গাছ জন্মায় না সেখানে নারীরা জ্বালানির জন্য গোবরের ওপর নির্ভরশীল।[২৬] শুধু তা-ই নয়, গবাদিপশুর খাদ্য সংগ্রহেও নারীরা প্রচুর শ্রম ও সময় দিয়ে থাকে।[২৭] অর্থাৎ গবাদিপশু পালনে জ্বালানিপ্রাপ্তির বিষয়টি সম্পৃক্ত হওয়ায় নারীরা এ কাজকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে। নারীদের নিজ গৃহ থেকে অনেক দূরে গিয়ে গবাদিপশু চরানোর মাঠ থেকে গোবর সংগ্রহ করতে হয়। তা ছাড়া গোবর থেকে জ্বালানি তৈরির কাজটি সময়সাপেক্ষ। কেননা গোবর থেকে ঘুটে ও বইড়ে তৈরি করে রোদে শুকানোর পর তা ব্যবহার উপযোগী হয়।

এক গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বন্যা, নদীভাঙন, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে নারী খাদ্য, জ্বালানি, বস্ত্র, চুলা ইত্যাদি সংরক্ষণ করে থাকে জরুরি প্রয়োজন মেটানোর জন্য।[২৮] পরিবারের বৃদ্ধ, যুবা, শিশু থেকে শুরু করে সব সদস্যের খাদ্য ও পানীয় জল সরবরাহের কাজ নারীর শ্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে যাতে তাৎক্ষণিক খাদ্য ও জ্বালানিসংকটে পড়তে না হয় কিংবা দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে পুনর্বাসিত হওয়ার সময় পরিবারের সবার খাদ্যনিরাপত্তার বিষয়টি নারীর কার্যক্রমে প্রাধান্য পায়। এ সময় তারা বস্তা কিংবা প্লাস্টিকের ব্যাগে চাল, চিঁড়া, মুড়ি, ডাল, চিনি, গুড় ইত্যাদি ভরে শক্ত করে বেঁধে ঘরের শুকনো স্থানে রেখে দেয়। তা ছাড়া গ্রামীণ নারী বস্তায় ভরে ঘুসে কিংবা বইড়ে সংরক্ষণ করে থাকে। দুর্যোগের সময় নারীর এ ভূমিকার ফলে পরিবারের অন্য সদস্যরা সংকটকালীন তাৎক্ষণিক সহায়তা পেয়ে থাকে, যা তাদের

মানসিকভাবে সবল করে তোলে।[২৯] কিছু ক্ষেত্রে ভিন্ন দৃশ্য লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে সন্তানসম্ভবা থাকলে, শিশুসন্তান থাকলে, অসুস্থ থাকলে ইত্যাদি সাময়িক অবস্থায় পুরুষ সদস্যরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় খাদ্য ও জ্বালানি সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

খাদ্য, জ্বালানি, পশুখাদ্য, অর্থপ্রাপ্তির অন্যতম উৎস গাছগাছালি। গ্রামের নারীরা মনে করে গাছ তাদের খাদ্য (ফল, শাকসবজি) সরবরাহ করে, ওষুধের জোগান দেয়, গৃহনির্মাণের জন্য কাঠ ও রান্নার জন্য জ্বালানির জোগান ইত্যাদি দিয়ে থাকে। উল্লেখ্য, উপকূলীয় এলাকায় সব ধরনের গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মায় না। এ কারণে যেসব গাছগাছালি জন্মায় সেগুলোর ওপর উপকূলীয় নারীদের নির্ভরতা বেশি পরিলক্ষিত হয় এবং এসব গাছ, লতা-পাতার যত্নও নিয়ে থাকে নারীরা। সাধারণত শাকসবজি, ফলমূল, কাঠ/জ্বালানি, ঔষধি ইত্যাদি সব ধরনের গাছই তারা লাগিয়ে থাকে। এদের অনেকের পরিবারের শাশুড়ি কিংবা বয়োজ্যেষ্ঠ নারী সদস্যদের লাগানো ফলের গাছের সংখ্যা পর্যাপ্ত হওয়ায় তারা শুধু গাছগুলোর পরিচর্যা করে থাকে। সহজে জ্বালানিপ্রাপ্তির জন্যও অনেকে গাছ লাগিয়ে থাকে। মান্দার, ধইঞ্চা, কাইফলা ইত্যাদি বিভিন্ন গাছ, যেগুলোতে ফল হয় না কিংবা কাঠও হয় না, এ ধরনের গাছ জ্বালানি হিসেবে যথেষ্ট উপযোগী। তাই নারীরা জ্বালানিপ্রাপ্তির জন্য এ ধরনের গাছ লাগিয়ে থাকে। গাছ লাগানোর পেছনে অনেকেরই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কাজ করে। সন্তানের লেখাপড়ার খরচ নির্বাহ, বিয়ে দেওয়া, স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়, গৃহনির্মাণ, গৃহ সংস্কার, গৃহস্থ আসবাব তৈরি ইত্যাদি কারণে নারীরা প্রতিনিয়ত গাছ লাগিয়ে থাকে। গ্রামীণ নারীরা অসুখবিসুখে গাছগাছালির ওপর নির্ভর করে। যাদের নামের সঙ্গে কবিরাজ রয়েছে, তারা মূলত বংশপরম্পরায় বিভিন্ন অসুখবিসুখে হারবাল চিকিৎসা দিয়ে থাকে। ডায়রিয়া, পেটে ব্যথা, পেট খারাপ, আমাশায়, ধাতু ভাঙা, বাচ্চার দুধবমি ইত্যাদি অসুখে গাছগাছালির ওপর নির্ভরতা বেশি লক্ষ করা যায়। এ ধরনের অসুখে কলা পাতা, শতমূল, থানকুনি পাতা, সফেদা, বেল পাতা, কচি আনারস, জার্মানি লতা, পেয়ারা পাতা ইত্যাদির ঔষধি গুণ সম্পর্কে নারীরা সচেতন।

অর্থাৎ গ্রামীণ নারী দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে সহজাতভাবেই প্রকৃতি ও পরিবেশের সংরক্ষক হয়ে ওঠে। উপকূলবর্তী এলাকার পানি লবণাক্ত হওয়ায় এখানে সুপেয় পানিপ্রাপ্তি শ্রম ও কষ্টসাধ্য এবং মাটিতে লবণের পরিমাণ বেশি হওয়ায় সব ধরনের গাছগাছালি না জন্মানোর কারণে গাছগাছালি থেকে জ্বালানি সংগ্রহ সম্ভব হয় না। উপরন্তু কৃষিজ ফসল উৎপাদন তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় এবং পানির অভাবে সেচব্যবস্থা না থাকায় বছরের অর্ধেক সময় কোনো ধরনের ফসল জন্মাতে পারে না। ফলে জ্বালানি হিসেবে ফসলের আগাছা ব্যবহার পর্যাপ্ত

নয় এ নারীদের কাছে। এ কারণে নারীরা জ্বালানির জন্য গোবরের ওপর নির্ভর করে। তবে চিংড়ি চাষের কারণে একরের পর একর ভূমি ঘেরে পরিণত হলে গবাদিপশু লালন-পালন সম্ভব নয় বিধায় নারীদের জ্বালানিপ্রাপ্তির প্রধান উৎস হুমকির সম্মুখীন। সুতরাং পরিবেশের প্রাকৃতিক উপাদানগুলোর সহজলভ্যতার অভাবে উপকূলীয় গ্রামীণ নারীকে অনেক বেশি শ্রম ও সময় দিতে হয় খাদ্য, পানি, জ্বালানি ও পশুখাদ্য সংগ্রহের কাজে।

বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ : বিপন্ন পরিবেশ ও বিপন্ন নারী

উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্রের লোনা জলের প্রাপ্যতাকে কাজে লাগিয়ে কৃষিজমিকে চিংড়িঘেরে রূপান্তরিত করে চিংড়ি চাষ অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হলেও তা স্থানীয় প্রকৃতি ও পরিবেশকে করেছে বিপন্ন। এ বিপন্নতার ফল ভোগ করতে হচ্ছে স্থানীয় জনগণকে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের নিমিত্তে উন্নয়ন ব্যবস্থাপত্র অনুসরণ করে চিংড়ি চাষের ফলে স্থানিক পরিবেশ ও নারীর বিপন্নতাকে বিশ্লেষণ করার আগে বাংলাদেশে চিংড়ি চাষের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, উপকূলীয় অঞ্চলকে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, লবণ-পানি থেকে মুক্ত করে কৃষিকাজের সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো ও খাদ্যচাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ১৯৬০-৭০ দশকে কোস্টাল এমব্যাঙ্কমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ করা হয় বৈদেশিক সহায়তা নিয়ে। এ বাঁধের মাধ্যমে পরিকল্পিত উপায়ে চিংড়ি চাষেরও চিন্তাভাবনা করা হয়, যেখান থেকে বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা হয়। উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে পরিবেশগত, অবকাঠামোগত ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি—এ তিনটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

অথচ স্বাধীনতা অর্জনের পর উপকূলীয় বাঁধ কেটে অধিক পরিমাণে সমুদ্রের লোনা জল প্রবেশ করিয়ে মুনাফালোভীরা একরের পর একর কৃষিজমিতে চিংড়ি চাষ শুরু করে। এটা ছিল 'এমব্যাঙ্কমেন্ট অ্যান্ড ড্রেনেজ অ্যাক্ট অব ১৯৫৩-এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। নব্বইয়ের দশকের শেষ নাগাদ কমপক্ষে ১ হাজার ১০০ স্থানে বেড়িবাঁধ কাটা হয়।[৩০] ফলে পরিবেশ, অবকাঠামো, শ্রম তিনটি ক্ষেত্রেই নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। যদিও ঘের মালিক এবং এর পৃষ্ঠপোষকেরা চিংড়ি রপ্তানি করে প্রচুর পরিমাণে অর্থ-বিত্তের অধিকারী হয়। চিংড়ি রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় বলে এ খাতকে জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে অন্যতম লাভজনক খাত হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। বর্তমানে আনুমানিক ১ লাখ ২৪ হাজার হেক্টর উপকূলীয় জমিতে চিংড়ি চাষ হচ্ছে কৃষিজমি ও ম্যানগ্রোভ বনকে চিংড়িঘেরে রূপান্তরিত করে।[৩১] অর্থনৈতিকভাবে প্রবৃদ্ধি অর্জনের এ প্রক্রিয়ায় নারী ও পরিবেশ ইস্যু

বিবেচ্য হয়নি অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পের মতো। বিশ্বব্যাংকের ১৯৯০ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায়, বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে নারী ইস্যু গুরুত্ব পায় না মানব উন্নয়নের প্রশ্নে।[৩২] অচিরেই এলাকাগুলোতে পরিবেশগত বিপর্যয় শুরু হলে এ উন্নয়নপ্রক্রিয়া প্রশ্নবিদ্ধ হয়। চিংড়িঘেরের লবণ-পানির ফলে আশপাশের কৃষি জোতগুলো লবণাক্ত হওয়ায় কৃষি উৎপাদন হুমকির মুখে পড়ে। ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষির জমির মালিকেরা ঘেরমালিকদের কাছে স্বল্পমূল্যে জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এভাবে ঘেরের আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে বিশাল এলাকাজুড়ে লবণাক্ততার সৃষ্টি হয়। কৃষিজমিসহ আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা লবণাক্ত হয়ে পড়ায় গাছগাছালি, লতা, গুল্ম তথা বনাঞ্চল বিলীন হয়। শুধু তা-ই নয়, মাটিতে বসবাসকারী বিভিন্ন পোকামাকড়ের অস্তিত্ব ধ্বংস হয়। লবণাক্ততার দরুন মিঠা পানির মাছসহ বিভিন্ন জলজ প্রাণী হুমকির সম্মুখীন হয়, যা জীব-বৈচিত্র্যকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। চিংড়ির পোনা ধরার জালে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ আটকা পড়ে। সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর চট্টগ্রাম কার্যালয়ের সহকারী পরিচালকের দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, একটি চিংড়ি পোনা সংগ্রহে ৯০টি অন্য মাছের পোনা মারা যায়।[৩৩] আরেকটি গবেষণায় দেখা যায়, বিশেষ জাল দিয়ে চিংড়ির একটি বাগদা পোনা ধরার সময় শিকারিরা ১৪টি অন্যান্য প্রজাতির চিংড়ির পোনা, ২১টি মাছের পোনা এবং ১ হাজার ৬০০ জুপস্ন্যাংকটন ধরে।[৩৪] শিকারিরা চিংড়ির পোনাটি রেখে বাকি সব আবর্জনা হিসেবে নদীর চরে ফেলে দেয়। এ ধারা অব্যাহত থাকলে অদূর ভবিষ্যতে বঙ্গোপসাগরসহ সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চল মাছশূন্য হয়ে পড়বে বলে ধারণা করা হয়। লবণাক্ততার প্রভাবে পর্যাপ্ত গো-খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। ফলে গবাদিপশু লালন-পালন বন্ধ হয়ে যায়। তা ছাড়া কৃষিজমি না থাকায় গবাদিপশুর চাহিদা কমে যায়।

গ্রামীণ নারীর জীবন-জীবিকা প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় উপরিউক্ত পরিবেশগত বিপর্যয়ে নারীর অবস্থা হয় বিপন্ন। এখানে কারেন জে ওয়ারেন নির্দেশিত লিঙ্গ-জেন্ডার পার্থক্যের মাধ্যমে নারী প্রকৃতির কাছে ভিন্নভাবে উপস্থিত হয়।[৩৫] অর্থাৎ ওয়ারেন নারীর জৈবিক অনুভূতিকে পুরুষের সঙ্গে পৃথক্করণের মাধ্যমে প্রকৃতির প্রতিরূপে নারীকে স্থাপন করেন। যেটিকে মারিয়া মিজ লৈঙ্গিক শ্রমবিভাজন হিসেবে উল্লেখ করেন।[৩৬] অর্থাৎ লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন নারীকে প্রকৃতিঘনিষ্ঠ করে। ফলে প্রকৃতির বিপর্যয় নারীর বিপর্যয় হিসেবে আবির্ভূত হয়। নারীর আর্থসামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, শারীরিক সংকট সৃষ্টি হয়। চিংড়িঘেরের জন্য জমি বিক্রির (কিংবা একধরনের দখলের সম্মুখীন হয়ে বিক্রি করতে বাধ্য হওয়া) প্রক্রিয়াটি শান্তিপূর্ণ নয়। ঘের মালিকদের সঙ্গে জমির মালিকদের কোন্দল সৃষ্টি হয়। কৃষিজমি জোরপূর্বক দখল কিংবা ভীতি প্রদর্শনের জন্য ঘেরের মালিকেরা

ভাড়াটে সন্ত্রাসী রাখে। সন্ত্রাসীরা অবশ্য ঘের-শ্রমিক কিংবা পাহারাদার হিসেবে থাকে। শহীদ সাংবাদিক মানিক সাহার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০০২ সালে চিংড়ি চাষকে কেন্দ্র করে ৪১টি সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে, যেখানে নিহত হয়েছেন ১২ জন ও আহত হয়েছেন ৬৮ জন।[৩৭] সন্ত্রাসীরা গ্রামের নারী, কিশোরী, তরুণীদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কৃষককে ভীতি প্রদর্শন করে এবং তাদের পরিবারের নারীদের অপমান, লাঞ্ছিত করে। সিডিপি-এসএসওকিউ পার্টনারশিপ রিপোর্ট ২০০৩ অনুযায়ী, ২০০৩ সালের জুন থেকে ডিসেম্বর এ ছয় মাসে খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট তিনটি জেলায় চিংড়ি চাষে যুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা ৩৪ জন নারী ধর্ষিত হয়েছেন।[৩৮]

উদ্ভূত পরিস্থিতি গ্রামের জনগণের প্রান্তিকীকরণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। জনগণের বিশাল অংশ কৃষিকাজ থেকে উৎখাত হওয়ায় আবহমান কাল ধরে পরিচালিত হওয়া তাদের কৃষিভিত্তিক জীবিকার বদল ঘটে। পুরুষেরা জীবিকার তাগিদে অ-কৃষি পেশায় নিযুক্ত হয়। নিকটবর্তী শহরে গিয়ে রিকশা-ভ্যানচালক, যানবাহনের শ্রমিক, দোকানের শ্রমিক ইত্যাদি কাজে তারা অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করে। অনেক সময় পুরুষেরা চিংড়িঘেরে শ্রমিক হিসেবেও কাজ করে থাকে। পরিবারের প্রধানের অন্যত্র গিয়ে বিকল্প কাজের সন্ধান নারীর জীবন-জীবিকার ওপর প্রভাব ফেলে। নারীকে তখন গৃহ ও গৃহসম্পৃক্ত সব কাজে অন্তর্ভুক্ত হতে হয়। নারীর শ্রম ও শ্রমঘণ্টা বেড়ে যায়।

এক গবেষণায় দেখা যায়, চিংড়ি চাষের ফলে সাধারণ মানুষ তাদের ভূমি, গবাদিপশু, মাছ, বৃক্ষ ইত্যাদির ওপর থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণ হারায়। ধনীকে আরও বিত্তশালী ও ক্ষমতাধর করে এবং সাধারণ সম্পদ ভোগের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে দরিদ্ররা আয়ের পথ থেকে বিতাড়িত হয়।[৩৯] অর্থাৎ উন্নয়নের নামে যে অর্থায়ন হয়, তা সাধারণ জনগণের জন্য কোনোভাবেই ইতিবাচক প্রভাব বয়ে আনে না, উপরন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব তৈরি করে।

পুরুষেরা বিকল্প পেশায় নিয়োজিত হলেও নারী পুরুষের মতো স্থানান্তরিত হতে পারে না। কারণ, পরিবারের শিশু, গবাদিপশু, গৃহস্থালি বিষয়াদির দেখাশোনার দায়িত্ব তাঁর। এ কারণে পুরুষের তুলনায় নারীর জীবন-জীবিকা বিপন্ন হয় বেশি। নারী তার পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানি, জ্বালানির সংকটে পড়ে। এগুলো সংগ্রহের জন্য তাকে অনেক সময় ও শ্রম দিতে হয়। শুধু তা-ই নয়, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি না থাকায় নারীর আয়ের পথ বন্ধ হয়। এক গবেষণায় দেখা যায়, স্থানান্তরিত নারীর কর্মসংস্থান সীমিত।[৪০] কেননা পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোয় নির্মিত শ্রমবিভাজনের ফলে নারীর জন্য নির্ধারিত কাজের বাইরে নারীকে একজন

শ্রমিক হিসেবে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত নয় সমাজ।

জীবিকার তাগিদে নারীরা চিংড়ি পোনা ধরে বিক্রি করে। দিনে আট-দশ ঘণ্টা নদীতে ঠান্ডা লোনা পানিতে দাঁড়িয়ে পোনা ধরার ফলে হৃদরোগসহ অন্যান্য শারীরিক অসুস্থতার সম্মুখীন হয়।[৪১] আবার নারীরা চিংড়ি কারখানায় নিম্নমজুরির বিনিময়ে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। এ ক্ষেত্রে শ্রমিকদের যথাযথ পোশাক না থাকায় তাদেরকে কেমিক্যালের ক্ষতিকর প্রভাব যেমন : মাথাঘোরা, চর্মরোগ, হাত ও পায়ের নখ ভাঙা, হৃৎপিণ্ডের অসুখসহ নানা ধরনের শারীরিক সমস্যায় পড়তে হয়। তা ছাড়া দৈনন্দিন গৃহস্থালির কাজের প্রয়োজনে লবণাক্ত পানি ব্যবহার করায় নারীকে বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগে ভুগতে হয়।

চিংড়ি চাষ নারীর আর্থসামাজিক, শারীরিক ও মানসিক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ প্রভাব স্থানিক জনগণের ওপর পড়লেও নারীর ভোগান্তি অন্যদের চেয়ে বেশি। চিংড়ি চাষের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগে নারী তার আবহমান কালের কাজ হারায়। বিকল্প কাজের সন্ধানে নারীকে মুখোমুখি হতে হয় বিভিন্ন মনোদৈহিক সমস্যার। ধনী চিংড়িঘেরের মালিকেরা চিংড়িবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানকারীদের মিথ্যা মামলায় আসামি করে এবং নারী ও শিশুদের নির্যাতন করে।[৪২] অনেক সময় আন্দোলনকারী নারীদের বিরুদ্ধেও মিথ্যা মামলা করে থাকে। শুধু তা-ই নয়, চিংড়িঘেরগুলোতে অন্য এলাকা থেকে আসা ভাড়াটে সন্ত্রাসীরা চিংড়ির মালিকের শক্তি হিসেবে থাকায় তারা গ্রামীণ নারীদের বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করে। তা ছাড়া চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় নারীশ্রমিকের যৌন হয়রানির ঘটনা অহরহই ঘটে থাকে।

নারীর প্রতিবাদ আন্দোলন : তাৎপর্য ও অর্জন

প্রবৃদ্ধি অর্জন তথা উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষের ক্ষতিকর প্রভাবের ফলে বৃহত্তর খুলনা বিভাগের খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা জেলার উপকূলীয় স্থানীয় জনগণ তাদের বিপন্নতা রোধে রুখে দাঁড়ায় নব্বইয়ের দশকে এসে। বিশেষ করে ১৯৯০ সালে সংঘটিত চিংড়িঘেরবিরোধী সর্বপ্রথম সক্রিয় আন্দোলনে উপকূলবর্তী বিভিন্ন গ্রাম যেমন : হরিণখোলা, নোয়াই, দারুণ মলিক, বিঘরদানা গ্রামের নারীরা 'ঘের করতে দিব না, লবণ-পানি ওঠানো যাবে না' স্লোগানকে ধারণ করে সমন্বিত আন্দোলনে অংশ নেয়। এ আন্দোলনে চিংড়িঘেরের মালিকদের সন্ত্রাসীদের গুলি ও বোমা হামলায় আন্দোলনে নারীনেত্রী করুণাময়ী সরদার নিহত হন এবং উর্মিলা সরদার, রূপজান বিবি, আনোয়ারা, রূপবান, রহিমা বেগমসহ অসংখ্য নারী আহত হন। শুধু তা-ই নয়, আন্দোলনকারী নারীদের অনেকের নামে মিথ্যা মামলা করা হয় এবং পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে এবং

জেলহাজতে পাঠায়। এ প্রতিবাদ আন্দোলনের ফলে ওই গ্রামগুলোতে সাময়িকভাবে ঘের তৈরি বন্ধ হয়। ঘেরের মালিকেরা সাধারণত সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যায় বলে এলাকার জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সরকারি প্রশাসন নির্লিপ্ত থাকে। তা ছাড়া চিংড়ি রপ্তানি অর্থনৈতিক আয়ের অন্যতম খাত হওয়ায় সরকারের পরিবেশ নীতিমালায় বিষয়টি সম্পর্কে গুরুত্ব প্রদান করে চিংড়ি চাষের বিরুদ্ধে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি। সরকারের জাতীয় চিংড়ি নীতি ২০০৯ (প্রস্তাবিত)-এ অনিয়ন্ত্রিত চিংড়ি চাষের নেতিবাচক আর্থসামাজিক ও পরিবেশগত বিপর্যয়ের কথা স্বীকার করা হলেও তা নিরসনকল্পে কোনো প্রস্তাব রাখা হয়নি। উপরন্তু অপরিকল্পিত চিংড়ি চাষের সম্প্রসারণের যৌক্তিকতায় চিংড়িকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পণ্য হিসেবে বিবেচনার প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে সম্প্রতি পরিবেশ সংগঠন বেলার দায়ের করা মামলায় ২০১০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্ট উপকূলীয় এলাকার কৃষিজমিকে চিংড়িঘেরে রূপান্তরিত করার ওপর নিষেধ আরোপ করে রায় প্রদান করেন।

পরিবেশ অবনয়নের বিরুদ্ধে নারীর সাড়া প্রদান প্রকৃতি, পরিবেশ তথা নারীর অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পরিবেশ রক্ষায় নারীর প্রতিবাদের ধরন ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে পরিবেশ রক্ষায় নারীর সম্ভাবনার যে কয়েকটি দিক লক্ষণীয় তা নিচে আলোচনা করা হয়েছে।

স্বতঃস্ফূর্ততা

গ্রামের নারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদ ও আন্দোলনে অংশ নিয়েছে বিভিন্ন মাত্রায়। সমর্থন দেওয়া, সংগঠিত করা, নেতৃত্ব প্রদান—সব স্তরেই নারীরা স্বতাগিদে ও স্বেচ্ছায় অংশ নিয়েছে। দারিদ্র্য ও প্রকৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ আচরণের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর নিরন্তর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে উপকূলবর্তী গ্রামীণ নারীর পরিবেশসচেতনতার পাশাপাশি পরিবেশ সংবেদনশীলতাও তৈরি হয়। ফলে তাদের কাছে জীবন-জীবিকা রক্ষা ও পরিবেশ রক্ষার তাগিদ সমান্তরালভাবেই উপস্থিত হয়। এ কারণে কোনো ধরনের সাংগঠনিক বিন্যাস ছাড়াই নারীরা সহজাতভাবে প্রতিবাদ আন্দোলনে অংশ নিয়েছে। উপকূলবর্তী বিভিন্ন গ্রাম যেমন : মধুখালী, পার মধুখালী, জকারওলা, রাধানগর, দিঘলিয়া ইত্যাদিতে ঘেরবিরোধী, লিজবিরোধী আন্দোলনে নারীরা সক্রিয় অংশ নিয়ে আসছে।

পরিস্থিতি উদ্ভূত নেতৃত্ব

জীবন-জীবিকা রক্ষার স্পৃহা নারীদের তাৎক্ষণিকভাবে পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনে নেতৃত্বদানে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। উল্লেখ্য, সরল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত গ্রামীণ নারীরা

পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা তথা পরিবেশ রক্ষার জন্য অন্য নারীদের সংগঠিত করে নেতৃত্বদানে অগ্রগামী হয়। হরিণখোলা গ্রামের করুণাময়ী সরদার, উর্মিলা সরদার, রহিমা বেগম প্রমুখ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নেতৃত্বগুণ ধারণ করেছেন, একজন নেতা হিসেবে চিংড়িঘের মালিকদের নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছেন।

সাংগঠনিক তৎপরতা

সংগঠিতভাবে পরিবেশ অবনয়নের বিরুদ্ধে নারীর সাড়া প্রদানকে প্রতিবাদের ভাষায় রূপ দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে আন্দোলনকে সংগঠিত করার পেছনে বেসরকারি সংগঠনের উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন : বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন 'নিজেরা করি' উপকূলবর্তী গ্রামের দরিদ্র নারী ও পুরুষদের নিয়ে ভূমিহীনদের সংগঠন তৈরি করে, যাতে তারা অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল হয়, জীবনমানের উন্নয়ন ঘটে। ভূমিহীনদের সংগঠনের নারীরা বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

প্রতিবাদের কৌশল

উপকূলবর্তী সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ নিজেকে ও পরিবেশকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য উদ্যোগী হয়। তাদের প্রতিবাদ আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে অহিংসভাবে। যখনই কৃষিজমিকে চিংড়িঘেরে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করা হয় তখনই স্থানীয় জনগণ ঘের খনন হবে এমন স্থানে মিছিল করতে গিয়ে সম্মিলিতভাবে অবস্থান নেয় এবং সভা করে যাতে ওই স্থানটি খনন করা সম্ভব না হয়। এভাবে দিনের পর দিন অহিংসভাবে আন্দোলন চলতে থাকে। হরিণখোলা, নোয়াই, বিঘরদানা প্রভৃতি উপকূলবর্তী গ্রামে কৃষিজমি খনন করে চিংড়িঘের স্থাপনের বিরুদ্ধে অহিংসভাবে আন্দোলন চলে আসছে।

আত্মত্যাগ

পরিবেশ রক্ষায় নারীর আত্মত্যাগের ইতিহাস অনেক পুরোনো। গাছ জড়িয়ে ধরে বিসনোই নারীর জীবন উৎসর্গ ইতিহাসে এখনো সমুজ্জ্বল। বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীও পরিবেশ রক্ষায় নিজের জীবন উৎসর্গ করতে দ্বিধা করেনি। আন্দোলনে চিংড়িঘের মালিকদের সন্ত্রাসীদের গুলি ও বোমা হামলায় হরিণখোলা গ্রামের করুণাময়ী সরদার নিহত হন এবং অসংখ্য নারী আহত হন।

নারীর অধিকার আদায়ের আন্দোলন

নারীর পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন নারীর অধিকার আদায়ের আন্দোলনে রূপ নেয়। এভাবেই পরিবেশবাদী আন্দোলনের সঙ্গে নারীবাদী আন্দোলনের সংযোগ ঘটে।

নিহত নারীনেত্রীর হত্যার বিচারের দাবি ও মিথ্যা মামলা থেকে মুক্তির দাবিতে গ্রামের নারীরা সংগঠিত হয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনের স্পৃহা গ্রামীণ নারীকে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোয় বিভিন্ন নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতেও সহায়তা করেছে। উপকূলীয় নারীরা যৌতুক ও পারিবারিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তা ছাড়া ২০০৪ সালে রহিমা নামের এক নারীকে মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করে হাজতে এক দারোগা নির্যাতন করলে সেই দারোগাকে অপসারণের জন্যও নারীরা আন্দোলন করে। পরে অবশ্য ওই দারোগাকে থানা থেকে প্রত্যাহার করে বদলি করা হয়। ২০০১ সালে বারোয়ারিয়া গ্রামে লোনা পানির ঘেরের পক্ষের লোকজন টাকা দিয়ে আর্মি ক্যাম্পের এক ক্যাপ্টেনকে দিয়ে গ্রামবাসীর ওপর নির্যাতন চালালে নারীরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনে অংশ নেয়।

সর্বজনীনতা

পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন একপর্যায়ে সবার আন্দোলন হয়ে ওঠে। অর্থাৎ পরিবেশ বিপর্যয়ে নারী সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বিপর্যয়ের প্রভাব সবার ওপরেই পড়ে। কেননা নারীর জীবন-জীবিকার অংশ তার পরিবার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা। সুতরাং নারীর জীবন বিপন্ন হলে এর প্রভাবে সবাই বিপন্ন হয়ে পড়ে। সংগঠিত প্রতিবাদ আন্দোলনে বিপুলসংখ্যক নারী-পুরুষ ধারাবাহিকভাবে অংশ নিলেও প্রতিবাদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আন্দোলনে নেতৃত্বদান, অংশগ্রহণ, সমর্থন করা—সর্বত্রই নারীর ভূমিকা অগ্রগণ্য।

তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ

মূলত পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো নারী ও প্রকৃতির ওপর দমন, শোষণের ক্ষেত্র তৈরি করে। সব সমাজেই কর্তৃত্বের মতবাদ (isms of dominations) ক্রিয়াশীল এবং কর্তৃত্বের মতবাদের ওপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠিত পীড়নমূলক ধারণাগত কাঠামোই পুরুষ কর্তৃক নারীর অধীনতাকে এবং মানব কর্তৃক প্রকৃতির অধীনতাকে বৈধতা দেয়।[৪৩] কারেন জে ওয়ারেনের মতে পুরুষতন্ত্রে ক্ষমতা প্রদর্শনে অধীনদের ওপর আধিপত্য বিস্তারের ফলে ক্ষমতার বিরুদ্ধে ক্ষমতা (power against power) সম্পর্ক নারী ও প্রকৃতির ওপর শোষণের নৈতিক ক্ষেত্র তৈরি করে। চিংড়িঘের অধ্যুষিত অঞ্চলে লক্ষ করা যায়, অধিপতিশীল ঘেরের মালিকদের সঙ্গে অধস্তন জনগোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব স্পষ্ট। এ দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের কারণ হচ্ছে আধিপত্য বিস্তারের মনোভাব, যা পুরুষতন্ত্র থেকে উৎসারিত। অধীনতার অনুশীলনের মধ্যদিয়ে নারী ও প্রকৃতি যুক্ত হয়। উন্নয়ন ও অধিক মুনাফার নামে মানব কর্তৃক প্রকৃতিকে শোষণ

করার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি চাষের মাধ্যমে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়, সেখানে নারীর অধস্তনতা ও বিপন্নতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ভল প্লামউড অবশ্য নারী ও প্রকৃতির অধস্তনতার পেছনে পশ্চিমা যুক্তিবাদী (western rationalism) ভাবনার দ্বৈতবাদকে (dualism) তাঁর আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করে বলেন, পুরুষ/নারী, সংস্কৃতি/প্রকৃতি, যুক্তি/আবেগ প্রভৃতির দ্বৈত ও বৈপরীত্য ভাবনায় পুরুষ, সংস্কৃতি, যুক্তি, শ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং নারী, প্রকৃতি, আবেগ, শ্রেষ্ঠের অধস্তন হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়।[৪৪] অধিক মুনাফা অর্জনের যুক্তিতে বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষের মধ্য দিয়ে যে উন্নয়ন সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে সেখানে নারী ও পরিবেশ অধস্তন হিসেবে বিবেচিত। পরিবেশ ও নারীর অবস্থান মূল্যায়িত না হওয়ার পেছনে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোয় দ্বৈতবাদী ভাবনার আলোকে কর্তৃত্বের যৌক্তিকতা (logic of domination) বিদ্যমান রয়েছে। একইভাবে বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ফলে যে উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে, সেখানেও প্রকৃতি এবং নারীর অবস্থা যথারীতি প্রান্তিক। কেননা এ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির অবনয়ন ঘটে, যা নারীর প্রান্তিকায়নকে ত্বরান্বিত করে। সম্পদ সৃষ্টিকারী এ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে বন্দনা শিবা অপ-উন্নয়ন (mal-development) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মারিয়া মিজ অবশ্য পুরুষতন্ত্র, বিজ্ঞান ও যুদ্ধ প্রযুক্তিকে মানব অস্তিত্বের হুমকিস্বরূপ আখ্যায়িত করে বলেন, এগুলোর অধীনে পরিচালিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শিল্পোন্নত ও শিল্পে অনুন্নত উভয় রাষ্ট্রেই নারীকে বিপন্ন ও প্রকৃতিকে ধ্বংস করে। আবার কারেন জে ওয়ারেনের মতানুযায়ী, মানুষ প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজনে পরিবর্তন করার সামর্থ্য রাখে। প্রকৃতিকে পরিবর্তন করার মধ্য দিয়ে যে অবদমনমূলক মনোভাবের জন্ম হয় তার সঙ্গে নারীর প্রতি পুরুষতন্ত্রের শোষণমূলক মনোভাবের সামঞ্জস্য রয়েছে। ফলে চিংড়ি চাষের মাধ্যমে নিজের প্রয়োজনে প্রকৃতি ও পরিবেশকে পরিবর্তন করার মনোভাবের সঙ্গে চিংড়ি চাষ এলাকার নারীদের অবদমন করার মনোভাবের মধ্যে মিল রয়েছে। অবদমনের এ মনোভাবের মধ্য দিয়ে নারী ও প্রকৃতির অবস্থান সমভাবে উপস্থিত হয় পুরুষতন্ত্রে। অর্থাৎ নারী ও প্রকৃতি পুরুষতন্ত্রের অধস্তন হিসেবে আবির্ভূত হয়। এভাবে সমাজে আধিপত্যের ধারণাগত কাঠামো বিদ্যমান। সেজন্য চিংড়ি চাষের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগে নারী ও পরিবেশ আধিপত্যের ধারণাগত কাঠামোয় আবদ্ধ হয়। এ কারণে চলমান আন্দোলনের ফলস্বরূপ কৃষিজমিকে চিংড়িঘেরে রূপান্তরিত করার ওপর আইনি নিষেধাজ্ঞা জারি হলেও, ভবিষ্যতে চিংড়ি চাষের সম্ভাবনা থেকে যায়। তবে পরিবেশ রক্ষা ও নারীর অধিকার রক্ষার মধ্যে সংযোগ স্থাপন কিংবা পরিবেশ ইস্যুতে নারীর সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে পরিবেশবাদী ও নারীবাদী আন্দোলনের অভিন্ন প্ল্যাটফর্ম সকল ধরনের শোষণমূলক কাঠামোকে বিনাশ করবে বলে

পরিবেশ নারীবাদীরা মনে করেন।

উপসংহার

অন্যান্য অনুন্নত বা উন্নয়নশীল সমাজের মতো বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীর প্রকৃতি সংশ্লিষ্টতা গড়ে ওঠে তার দৈনন্দিন গৃহস্থালির কাজের মধ্য দিয়ে। এ আন্তসম্পর্কের ফলে নারীর মধ্যে পরিবেশসচেতনতা ও সংবেদনশীলতা তৈরি হয়। এ কারণে পরিবেশের বিপন্নতায় নারীর জীবন-জীবিকাও বিপন্ন হয়ে পড়ে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য নারী প্রতিবাদী হয়, আন্দোলনে অংশ নেয়। পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনে গ্রামের নারীদের অংশগ্রহণ কিংবা নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি কাজ করেছে তা হচ্ছে, নিজ পরিবারের সদস্য ও গবাদিপশুর জন্য খাদ্য, পানি, জ্বালানি সরবরাহ করার জন্য পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ওপর নির্ভরতা। টিকে থাকার প্রশ্নে নারী ও প্রকৃতির স্বার্থ অভিন্ন হওয়ায় নারীর সাড়া প্রদান সহজাত হয়। নোয়েল স্টারজিওনের মতে, নারী বস্তুগত ও ঐতিহাসিক কাজের মাধ্যমে প্রকৃতির সঙ্গে একত্র হয়। যার ফলে যেকোনো পরিবেশগত সমস্যা নারীর দ্বারা দৃষ্টিগোচর হয় আগে, নারীর সংশ্লিষ্ট কাজের ওপর প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে।[৪৫] আলোচনায় দেখা যায়, চিংড়ি চাষ নারীর জীবন-জীবিকার হুমকিই তৈরি করে না, এটি নারীর শারীরিক ও মানসিক বিপর্যস্তার জন্য নেতিবাচক পরিবেশও তৈরি করে। বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষে ব্যবহৃত লোনা পানি বৃক্ষসহ অন্যান্য জীবজন্তুর জন্য হুমকিস্বরূপ, এ বিষয়টি নারীদের অজানা নয়। গ্রামীণ নারীদের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পেছনে অবশ্য বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন 'নিজেরা করি', 'উবিনিগ' প্রভৃতির ভূমিকাও রয়েছে। এ সংগঠনগুলো চিংড়িবিরোধী চলমান আন্দোলনে স্থানিক জনগোষ্ঠীকে আইনি সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি পরিবেশ সম্পর্কেও সচেতন করার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া চিংড়িঘেরবিরোধী চলমান আন্দোলনে নারীদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রেও বেসরকারি সংগঠনগুলোর কার্যক্রম লক্ষণীয়। পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনে নারীর সংগঠিত শক্তি এবং ভূমিকা বৃহত্তর পরিসরে নারীর অধিকার আদায়ের আন্দোলনের ভিত্তি হতে পারে। আবার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় নারীকে পরিবেশের সংরক্ষক ও ব্যবস্থাপক এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ধারক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পারে।

তথ্যসূত্র

১. Ishrat Shamim, and Khaleda Salahuddin, *Energy and Water Crisis in Rural Households Linkages with Women's Work and Time*, Dhaka, Women for Women, 1994, p.34.

২. Karen J. Warren, 'Introduction to Ecofeminism',

http://media.pfeiffer.edu/lridener/courses/ ecowarrn.html on 06-11-2010, p.4.

৩. Bina Agarwal, 'The Gender and Environment Debate: Lessons from India', Visvanathan, Nalini & et al. (eds.), *The Women, Development and Gender Reader*, London, Zed books, 1997, p.69.

৪. Vandana Shiva, 'The Seed and the Earth: Women, Ecology and Biotechnology', *The Ecologist*, Vol. 22, No. 1, Jan/Feb, 1992. p.4-8, http://www.theecologist.org/back_archive /19701999/ on 6-01-11.

৫. Feminist Studies, Vol. 1, No. 2, (Autumn, 1972), p. 5-31 http://www.students.sbc.edu/ watson08/ HNW /3177638.pdf on 20-12-2010.

৬. Sherry B. Ortner, 'Is female to male as nature is to culture?', in M. Z. Rosaldo and L. Lamphere (eds), *Woman, culture, and society,* Stanford, CA: Stanford University Press, 1974, p. 68-87.

৭. রেহনুমা আহমেদ, ও মানস চৌধুরী, *নৃবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ সমাজ ও সংস্কৃতি*, ঢাকা, একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ২০০৩, পৃ. ১৪৮।

৮. James E. Lovelock, *Gaia: A New Look at Life on Earth,* USA, Oxford University Press, 1979.

৯. Linda Marina, 'Woman and the Land', accessed at http://www.lancs.ac. uk/staff/twine/ ecofe m /linda.pdf.

১০. Sadeka Halim, 'Women's Affinity with Nature: Two Perspectives on Ecofeminism', *The Dhaka University Studies*, Journal of the Faculty of Arts, Vol. 55, No. 1, June, 1998, p. 194.

১১. Carolyn Merchant, *Earthcare:Women and the Environment*, New York, Routledge, 1995, Introduction-xvi.

১২. Vandana Shiva, *Staying Alive: Women, Ecology and Development in India*, London, Zed Books, 1989. p. 55.

১৩. Val Plumwood, *Feminism and the Mastery of Nature,* London and New York, Routledge, 1993, p. 20-21.

১৪. Karen J. Warren, 'The Power and the Promise of Ecological Feminism', in H. LaFollete, *Ethics in Practice,* London, Blackwell, 1997, p. 658.

১৫. Val Plumwood, *op.cit,* 1993, p. 1.

১৬. Val Plumwood, 'Nature, self and gender: feminism, environmental philosophy and the critic of rationalism', *Hypatia*, 1991.

১৭. Maria Mies, *Search for a New Vision*, Dhaka, Narigrantha Prabartana, 2005, p. 198.

১৮ . Bina Agarwal, *op.cit*, p. 68.

১৯. Sandhya Venkateswaren, *Environment, Development and the Gender Gap*, New Dehi/Thousand Oaks/London, Sage Publications, 1995, p. 198.

২০. Sadeka Halim, *op.cit*, p. 193.

২১. Karen J. Warren, *op. cit*, http://media.pfeiffer.edu/lridener /courses/ ecowarrn.html, p. 11.

২২. Bina Agarwal, *op.cit*, p. 74.

২৩. Salma Khan, 'The Impact of Environment on Women's Health Status', in Jahan, Roushan & et al. (eds.), *Environment and Development Gender Perspectives,* Dhaka, Women for Women, 1995, p. 60.

২৪. Sandhya Venkateswaran, *op.cit*, p. 12.

২৫. Ishrat Shamim, and Khaleda Salahuddin, *Energy and Water Crisis in Rural Households Linkages with Women's Work and Time*, Dhaka, Women for Women, 1994.

২৬. Sandhya Venkateswaran, *op.cit*, p. 45.

২৭. *Ibid*, p. 46.

২৮. Nilufar Ahmed, 'Environment Development and Women : Bangladesh Perspective', in Jahan, Roushan & et al. (eds.), *Environment and Development Gender Perspectives,* Dhaka, Women for Women, 1995, p. 25.

২৯. Israt Shamim, 'Women and Environment Disasters: Riverine Erosion and Displaced Women as Managers', in Jahan, Roushan & et al. (eds.), *Environment and Development Gender Perspectives,* Dhaka, Women for Women, 1995, p. 47.

৩০. সাজেদ রহমান, 'দক্ষিণাঞ্চলে চিংড়িঘের বঞ্চিত শ্রমিক, নির্বিকার সরকার', *সাপ্তাহিক*, ২৩ অক্টোবর ২০০৮, বর্ষ ১, সংখ্যা ২৩, পৃ. ৪১।

৩১. Nilufar Ahmed, *op.cit*, p. 31.
৩২. Israt Shamim, *op.cit*, p. 55.
৩৩. *কালের কণ্ঠ*, ৮ আগস্ট, ২০১০, রোববার, পৃ. ৪।
৩৪. 'বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ : খাদ্যনিরাপত্তা, সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব' শীর্ষক সেমিনার, এলজিইডি মিলনায়তন, ঢাকা, ২৯ আগস্ট, ২০০৯।
৩৫. Karen J. Warren, *op.cit*, http://media.pfeiffer.edu/lridener/courses/ecowarrn.html on 06-11-2010.
৩৬. Sandhya Venkateswaran, *op.cit*, p. 24.
৩৭. 'বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ : খাদ্যনিরাপত্তা, সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব' শীর্ষক সেমিনার, এলজিইডি মিলনায়তন, ঢাকা, ২৯ আগস্ট, ২০০৯।
৩৮. প্রাগুক্ত.
৩৯. Atiqur Rahman, `The Impact of Shrimp Culture on the Coastal Environment', in Rahman, Atiq, A. & et al. (eds.), *Environment and Development in Bangladesh*, Dhaka, UPL, 1994, p. 499.
৪০. Raana Haider, 'Women, Poverty and the Environment', in Rahman, Atiq, A. & et al. (eds.), *Environment and Development in Bangladesh*, Dhaka, UPL, 1994, p. 283.
৪১. Nilufar Ahmed, *op.cit*, p. 341.
৪২. *Ibid*, p. 34.
৪৩. Karen J. Warren, *op.cit*, 1997.
৪৪. Val Plumwood, *op.cit,* 1993.
৪৫. Noel Sturgeon, *Ecofeminist Natures*, London and New York, Routledge, 1997.

পুনর্মুদ্রণ

জন্মশতবার্ষিকীর শ্রদ্ধা

ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মন

আবদুর রাজ্জাক

[অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের (১৯১৪-১৯৯৯) বর্তমান লেখাটি তাঁর 'অবিভক্ত ভারতের রাজনৈতিক দল' শীর্ষক অসমাপ্ত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ থেকে নেওয়া হয়েছে। অধ্যাপক রাজ্জাক তাঁর এ গবেষণাকর্ম ১৯৫০-এর গোড়ার দিকে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেন। বর্তমান অধ্যায়টিতে যেমন তেমনি ওই গবেষণাগ্রন্থের অন্তর্গত অন্যান্য অধ্যায় যেমন : ভারতে ক্ষমতার প্রয়োগ এবং প্রয়োগ-পদ্ধতির পরিবর্তন প্রসঙ্গে; বেসরকারি ইউরোপীয় সম্প্রদায় : ভারতের রাজনৈতিক শ্রেণিসমূহ; সংবাদপত্র এবং তার তাৎপর্য; ভারতে সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা প্রভৃতি শিরোনামের আলোচনার মধ্যেও ঊনবিংশ শতকের সমাজ ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে অধ্যাপক রাজ্জাকের চিন্তাপূর্ণ বিশ্লেষণের পরিচয় রয়েছে। এটা দুঃখজনক যে অধ্যাপক রাজ্জাকের নিস্পৃহতার কারণেই তাঁর এই মূল্যবান গবেষণাকর্ম পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়নি। অনূদিত বর্তমান প্রবন্ধটির (বক্তব্য, প্রবন্ধ পত্রিকা, শ্রাবণ—আশ্বিন ১৩৮৪, সম্পাদক—মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর) মূল ইংরেজি ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল *নিউ ভ্যালু* সাময়িকীর নবম খণ্ডে, দ্বিতীয় সংখ্যায়, ১৯৫৭ সালে। ইংরেজি এই পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক প্রয়াত খান সারওয়ার মুরশিদ (১৯২৪-২০১২)। বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি ঐতিহাসিক অবদান ছিল। বিশেষত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যে সমাজ তৈরি হয়েছিল তার মনোজগতটি আবিষ্কারে সচেষ্ট হয়েছিলেন তাঁর এই অভিসন্দর্ভ-এর মাধ্যমে। সম্প্রতি পেরিয়ে গেল অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের জন্মশতবর্ষ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তিনি নানা কারণে হয়ে উঠেছিলেন তাঁর সমসাময়িককালে কিংবদন্তি। সংখ্যার বিচারে তাঁর লেখা খুবই কম। তবে পড়াশোনার পরিধি ও প্রজ্ঞা মুখ্যত কাজ করেছিল তাঁর এই কিংবদন্তি ইমেজ গড়ে ওঠার পেছনে।

স্বভাবগতভাবে তিনি ছিলেন ভাবুক ও দার্শনিক প্রকৃতির। তিনটি প্রজন্মকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট

তিন প্রজন্মের জ্ঞানচর্চায় তাঁর অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা ছিল তাদের পাথেয়। আমাদের জাতীয় জীবনের উত্থানপর্বের তিনি ছিলেন নিবিড় পর্যবেক্ষক ও ক্ষেত্রবিশেষে অভিভাবকস্থানীয়।

আবদুর রাজ্জাক তাঁর অভিসন্দর্ভ-এ যে দিকটি তুলে ধরতে সচেষ্ট ছিলেন তা হলো প্রথমত : স্বাধীনতা অর্জন সত্ত্বেও ১৯৪৭ সালে ভারত কেন খণ্ডিত হওয়ার ভাগ্য বরণ করল; আর ভারতেই এই বিভক্তি হয়েছিল মুখ্যত ভারতীয় ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেতৃত্বে দ্বিতীয়ত : তিনি ভারত বিভক্তির মূল কারণ খুঁজতে গিয়ে শিক্ষিত ভারতীয়দের চিন্তার আবহাওয়ার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আর এর অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি দৃষ্টি দিয়েছিলেন চিরন্তন অবদান বিধৃত ভারতের দুটি স্বদেশি সাহিত্যে—বাংলা ও উর্দুতে। এই দুই সাহিত্য ধরে রেখেছে উনিশ শতকের গোড়ায় সূচিত 'অন্তরের অনুসন্ধান'-এর ফলাফল। আবদুর রাজ্জাকের মতে, 'ভারত ভাগ হলো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগের আপসহীন বিরোধের পরিণাম'। তিনি আরও লিখেছেন 'ভারতে কংগ্রেস বা অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বাধীন আন্দোলনগুলোর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য থেকে ফুটে উঠেছে যে এসবের সর্বাত্মক নেতৃত্বে ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি'। আর এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি মুখ্যত ঔপনিবেশিক প্রয়োজনেই সৃষ্টি। সে পরিপ্রেক্ষিতে আবদুর রাজ্জাক জোরালোভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোর বৈশিষ্ট্যের ওপর শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাবের দিকটির প্রতি আলোকপাত করেছিলেন। তাঁর মতে, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পরিণতির শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সাধিত হয়নি। তাঁর পর্যবেক্ষণ হলো, ঔপনিবেশিক সরকার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি পরস্পরের ওপর যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভরশীল ছিল। তাঁর মতে, 'রাজনৈতিক আন্দোলনের চালিকাশক্তি ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে। এই শ্রেণিই ছিল মুখ্য। এদের মাধ্যমেই সরকার তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখত। সরকারের এই শ্রেণির গলা টিপে ধরার প্রশ্নই উঠত না; কারণ তা ছিল সরকারের নিজেরই গলা টিপে ধরার শামিল'। অধ্যাপক রাজ্জাকের এই বিশ্লেষণ, নয়া ঔপনিবেশিক—বিশ্বায়নের এই যুগেও—এই সম্পর্কের চিত্রটি অনেকটা সমমাত্রিক।

এই জ্ঞান সাধক আজীবনই কাটিয়ে গেছেন এক সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন। তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্য করে নতুন প্রজন্ম ও *প্রতিচিন্তার* পাঠকদের সামনে, তাঁর অভিসন্দর্ভ-এর অনূদিত অংশবিশেষ পুনর্মুদ্রণ করা হলো। আশা করি পাঠক এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাবেন]

সামাজিক অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণকারী নিমিত্তসমূহ থেকে আলাদা করে ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন প্রধানত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি-সম্পর্কিত। ইংরেজি জানা এই শ্রেণির সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব নিরূপণের জন্য এর সামাজিক সম্পর্ক নির্ণয় করা প্রয়োজন। এই শ্রেণির সদস্যরা যে পরিবেশে বসবাস করত তা স্মরণ রাখা এবং তাদের রাজনৈতিক ভূমিকা নির্ণয়ের জন্য তাদের আপ্তশিক্ষার আধেয় বিষয়সমূহের দিকেও লক্ষ করা দরকার। এই শিক্ষার স্বরূপ এবং রাজনৈতিক সম্প্রসারণে—বিশেষ করে রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহের ক্ষেত্রে—তার ভূমিকা এই প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ থেকে ভারতে কোম্পানির এলাকার উন্নত পদমর্যাদার সমস্ত স্তরবিন্যাস সাধিত হয়েছে তার শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে। ভারতীয় সমাজের প্রধান গোষ্ঠী সে সময় বিরাট বণিক এবং ব্যবসায়ীরা নয়। অভিজাত ভূস্বামীরাও নয়। কেননা সে সময় অভিজাত ভূস্বামী হওয়ার প্রধান সম্ভাব্য মাধ্যম ছিলেন কোম্পানির ক্ষমতাশালী কর্মচারীরা। কোম্পানির ভারতীয় কর্মচারীদের যে একটি শ্রেণি গড়ে উঠেছিল, তারা ছিল ভারতীয় সমাজের 'স্বাভাবিক' নেতা। সন্দেহ নেই কোম্পানিতে তাদের পদ ছিল সামান্য, তথাপি একটি শ্রেণি হিসেবে তারাই ছিল ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও অর্থবান। তাদের চাকরিদানের নিয়ম ও পদ্ধতি এবং সেই সঙ্গে তাদের শিক্ষার প্রণালি এবং বিষয়সমূহ আগন্তুক মধ্যবিত্ত শ্রেণির ইনটেলেকচুয়াল পরিবেশ নির্ধারণ করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত প্রধান ভারতীয় কর্মচারীরা ছিলেন কাজি এবং পণ্ডিতেরা, যাঁদের কাজ ছিল ইউরোপীয় বিচারকদের কাছে ভারতীয়—হিন্দু এবং মুসলিম—আইন ব্যাখ্যা করা।

কলকাতার মোহামেডান কলেজ এবং বেনারসের হিন্দু কলেজ স্পষ্টত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কোম্পানিকে হিন্দু এবং মুসলিম আইনে পারদর্শী কর্মচারী জোগান দেওয়ার জন্য।[১] রাজস্ব এবং আইন প্রশাসনের কর্মকাণ্ড ক্রমে হিন্দু ও মুসলিম আইনের বাইরে অধিকতর ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই দুই আইনে অনুশীলনপ্রাপ্ত কর্মচারীদের প্রয়োজন কমে আসতে থাকে। ইংরেজি জ্ঞান—কর্মচারীদের যা প্রয়োজনীয় দায়িত্ব সম্পাদনে এবং ইউরোপীয় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় সক্ষম করত—ছোট কিন্তু লাভজনক চাকরিতে যোগদানের যোগ্যতা হিসেবে ধীরে ধীরে বেশি করে স্বীকৃতি পেতে থাকে।

১৭৯৩ সালে মিশনারিরাও এসে যোগ দেয় ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে সহায়তা করার জন্য। কিন্তু ইংরেজি জ্ঞান সরকারি চাকরির একমাত্র যোগ্যতা নির্ধারিত হওয়ার আগে ১৮৬৪-তে কলকাতার মোহামেডান কলেজ বেনারসের হিন্দু কলেজ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্তরা (যদিও ১৮৩১ থেকে ক্রম হ্রাসপ্রাপ্ত সংখ্যায়) নিরবচ্ছিন্নভাবে চাকরি পেয়ে এসেছে। এই প্রতিষ্ঠান দুটিতে যে শিক্ষা দেওয়া হতো তার বিষয়সমূহ কী ছিল? মেকলে তাঁর এক প্রায়শ উদ্ধৃত উক্তিতে তখনকার সময়ের সঙ্গে এই শিক্ষার মারাত্মক অসংগতির বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই শিক্ষা ছিল হিন্দু এবং মুসলিম আইন শিক্ষাদানের জন্য পরিকল্পিত একটি পাঠ্যসূচি।[২] এই আইন ক্রমেই অপর এক আইন দ্বারা—যা এই দুই আইন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন—অপসৃত হতে থাকে।

হিন্দু এবং মুসলিম আইনের সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি জানা এই শ্রেণির মানুষ সামাজিক অবলুপ্তি অতএব অনিবার্য হয়ে পড়ে। ভারতের নবজাত মধ্যবিত্ত শ্রেণির অখণ্ড অংশ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে তারা ব্যর্থ হয়। আকস্মিকভাবে এখন থেকে ইংরেজি শিক্ষা সরকারি পদ লাভে ছাড়পত্র হয়ে দাঁড়ায়। ফলে যারা চিন্তাশূন্যভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল যে এই শিক্ষা তাদের এবং তাদের সন্তানদের পক্ষে যথেষ্ট মঙ্গলকর নয়, তাদের জন্য সমস্যার উদ্ভব হলো। এদিকে যত দিনে 'প্রাচ্যবাদী' 'প্রতীচ্যবাদী'দের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়, তত দিনে প্রাচ্যের ভাষায় প্রদত্ত শিক্ষা তখনকার সমাজের সঙ্গে এতটুকু সংগতির ছিটেফোঁটাও রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

ইংরেজির জন্য সংঘবদ্ধ প্রচার অভিযান শুরু হয় ১৭৯৩ সালে মিশনারিদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু অন্তত কলকাতায় ইংরেজি প্রচলন হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। কলকাতায় প্রথম থেকেই, ভারতের অন্যান্য জায়গার মতো কিছু লোক ছিল, যারা মোটামুটি ভালো ইংরেজি জানত এবং তারা ইংরেজ বণিক ও দেশীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যস্থ হিসেবে কাজ করত। ১৭৫৭ থেকে ইংরেজি জ্ঞানের মূল্য, বাণিজ্যিক বিনিময় হিসেবে, হঠাৎ বৃদ্ধি পায়। ১৭৫৭ থেকে ১৮১৬ এই সময়ের মধ্যে কেবল ইংরেজি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কলকাতায় বেশ কিছু স্কুলের পত্তনও ঘটে।[৩] তারপর ১৮১৩ সালে চার্টার অ্যাক্টের[৪] মাধ্যমে প্রয়োজনীয় শিক্ষা সম্প্রসারণ কোম্পানির জন্য বাধ্যতামূলক করা হলে ইংরেজি জ্ঞানের চাহিদা অসম্ভব বেড়ে যায়। কোম্পানির প্রধান কর্মচারীরা—বিশেষত প্রাচ্যবাদীরা— ইংরেজি শিক্ষা সম্প্রসারণের এই পরিকল্পনাকে বিশেষ সুনজরে দেখেননি। অতএব ইংরেজি শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রাথমিক দায়িত্ব এখন থেকে দুটি গোষ্ঠীর ওপর ন্যস্ত হয়, যত দিন না কোম্পানির প্রাচ্যবাদী কর্মচারীরা লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংকের আমলে পুরোপুরি পর্যুদস্ত হয়। অর্থাৎ ১৭৯৩-১৮৩১ এই সময় পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষার আধেয় আর কোম্পানির নয়, ব্যক্তির ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ১৭৯৩ থেকে ১৮৩১ এই সময়কে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: ১৭৯৩-১৮১৪ এবং ১৮১৪-১৮৩৩।

প্রথমোক্ত সময়কালে ইংরেজি শিক্ষা সম্প্রসারণে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় যতটুকু হয়েছে তা হয়েছে মিশনারিদের দ্বারা। প্রকৃতপক্ষে, প্রথম পর্যায়ে ইংরেজি প্রচারের মূল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের 'সত্য ধর্ম' বা 'ট্রু ফেইথ'-এ ধর্মান্তরে সহায়তা করা।[৫] এই কারণেই কোম্পানির কর্মচারীরা পরিকল্পনাটিকে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেনি। কারণ, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে, কোম্পানির কর্মচারীরা তাদের খ্রিষ্টীয় জীবনযাপন প্রণালির জন্য বিশেষ রকম

চিহ্নিত ছিল না। তা ছাড়া স্থানীয় শাসকেরা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করত, কোম্পানির যেকোনো ধর্মান্তরিতকরণ প্রচেষ্টা তাদেরই এত দিনকার লালিত রাজনৈতিক কাঠামোকে মারাত্মকভাবে বিপন্ন করবে। সে যা হোক, মিশনারিদের হয়তো ইংরেজি শিক্ষা একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াল। সেটি হচ্ছে, খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার সহায়ক হিসেবে জনগণের নৈতিক পুনর্জাগরণ। শিক্ষার বিষয়সমূহ, যা ইংরেজির মাধ্যমে কিংবা ইংরেজির সহায়তায় প্রচার করা হচ্ছিল, এই অতি-আবশ্যকীয় উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। ইংরেজি প্রবর্তনের প্রথম সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা এভাবে ধর্মান্তরিতকরণের মিশনারি লক্ষ্যের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু ১৮১৪ সালে, যে বছর রামমোহন রায় কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কলকাতার একটি ক্ষমতাশালী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ইংরেজি শিক্ষা সম্প্রসারণের পক্ষ সমর্থন। মিশনারিদের সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন রায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত এই গোষ্ঠী ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষা প্রসারের প্রশ্নটি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে। বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত ছিল ১৮৩১ সালের চার্টার অ্যাক্টে ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য সংরক্ষিত বার্ষিক এক লাখ টাকা। কিন্তু যদিও মিশনারিরা এবং রামমোহন গোষ্ঠী উভয়েই ইংরেজি শিক্ষার পক্ষ সমর্থন করে, তথাপি দুই দলের স্থিরীকৃত উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।

মিশনারিরা তাদের অনিয়ন্ত্রিত ও অপরিণামদর্শী উৎসাহের বশে বস্তুত যা করতে সমর্থ হয় তা তাদের লক্ষ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। ধর্মসংস্কারের দেশি আন্দোলন ছিল মিশনারিদের ধর্মান্তরকরণ পরিকল্পনার সোজাসুজি পাল্টা জবাব। কিন্তু ভারতীয় সমাজের দূরপ্রসারী বিকাশের দিক থেকে এই পাল্টা জবাবের একটি দুঃখজনক পরিণাম ছিল। ইংরেজির প্রবর্তন, যা হতে পারত একটি পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ ব্যাপার, হলো শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে রিভাইভালিজম বা ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদের এক হাতিয়ার। আর এ প্রবণতা শতাব্দীর শেষেও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। রামমোহন রায় ছিলেন ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের একজন নায়ক এবং তিনি সহায়তা করেছিলেন আধুনিক ইউরোপীয়—অন্তত ইংরেজি—জ্ঞান এবং চিন্তা ও ভারতের মধ্যে একটি সূত্র স্থাপনে। কিন্তু তাঁর কর্মতৎপর নিবেদিত জীবনে যেসব বিষয়ে তিনি উৎসর্গীকৃত ছিলেন তার সবই সম্পূর্ণ ধর্মীয়। এবং শুধু রামমোহনের ক্ষেত্রেই নয়। ইংরেজি শিক্ষা, যা গ্রান্ট এবং মিশনারিরা ভেবেছিল খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরকরণে সহায়তা করবে, বরং দেখা গেল যেন একটি পুনরুজ্জীবিত হিন্দুয়ানির জন্ম দিল। ইংরেজির প্রথম প্রবর্তন আর শতাব্দীর প্রায় শেষাশেষি,

এই দুইয়ের মধ্যখানে দেশীয় সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলো সবাই যেন ধর্মীয় বিষয়াদিতে পুরোপুরি কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা। বহুদিন এটি ছিল সর্বগুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদসমূহে কর্মচারী গ্রহণের একমাত্র মাধ্যম। অন্তত যেসব সরকারি কর্মচারী ইংরেজি শিক্ষিত ছিল, তাদের সবাই এখান থেকে এসেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তিদের তালিকা বস্তুত ছিল প্রায় সম্পূর্ণভাবে এই কলেজ থেকে পাস করা ব্যক্তিদের তালিকা। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি এবং কারণসমূহ খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের সঙ্গে মিশনারিদের ধর্মান্তরকরণ উচ্ছ্বাসের দ্বারা সৃষ্ট এবং লালিত ধর্মানুগ মানসিকতার কি যোগাযোগ। '১৮১৫ একজন বিশিষ্ট নেটিভ (রামমোহন রায়) তাঁর বাড়িতে কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে আপ্যায়ন করেন। কথায় কথায় নেটিভদের নৈতিক অবস্থার সংস্কার বিধানের শ্রেষ্ঠ পন্থা কী, এই নিয়ে আলোচনা ওঠে। রামমোহন রায় বেদান্ত পদ্ধতির অনুসরণে ধর্মীয় মতবাদসমূহ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একটি ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। মি. হিউম সংশোধনী প্রস্তাব হিসেবে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন।'[৬] অর্থাৎ কলেজটি হলো ব্রাহ্মসভার বিকল্প এবং মিশনারি ধর্মান্তরকরণ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধ। এই প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্ভ্রান্ত হিন্দু সন্তানদের শিক্ষাদান।[৭] এই কলেজ প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল 'নেটিভদের নৈতিক অবস্থা পরিশোধনের' একটি আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু সেই প্রথম দিকেও 'নেটিভ' বলতে হিন্দু ছাড়া আর কোনো সম্প্রদায়ের মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা হতো, মনে হয় না। ডিভাইড অ্যান্ড রুলের একটি নীতি উদ্ভাবনের আগ্রহপূর্ণ প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত হলেন এ.ও. হিউম। তখনকার রাজনৈতিক সমতলে হিন্দু এবং মুসলমানদের একত্রে ব্যর্থতার একটি ব্যাখ্যা দেওয়া তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই প্রচেষ্টার আদৌ দরকার হতো না যদি শিক্ষিত ভারতীয়দের মানসিকতা কার্যত সরকারি উদ্যোগের সহায়তা ব্যতীতই, যেভাবে হিন্দু ও মুসলমান এই আলাদা প্রকোষ্ঠে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছিল, তার প্রতি ইংরেজ লক্ষ রাখত। শতাব্দীর শুরুতে প্রধানত ধর্মের ভিত্তিতে ভারতীয় জনগণকে বিভক্ত করার সেই প্রবণতা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সেই প্রবণতার পরিণতি এবং শতাব্দীব্যাপী এর প্রবলতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফলে পরিপূর্ণ।

একটিমাত্র ধর্মে উৎসর্গীকৃত কোনো সমাজে এই ধর্মীয় প্রবণতা হয়তোবা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিণতি পেতে পারত। ভারতের পটভূমিতে, একাধিক ধর্মবিশ্বাসী মানুষের সমাজে, এটি অধিকতর এবং ভয়াবহতর জটিলতার

কেবল একটি পূর্বাভাসের মতো ছিল আসলে। মিশনারিদের প্রথম আক্রমণ জন্ম দেয় ধর্ম সংস্কারবাদীদের। এরাই প্রতিষ্ঠা করেছিল ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু কলেজ, কিন্তু পরে এদেরই থেকে জন্ম নেয় রিভাইভালিস্টরা পুনরুজ্জীবনপন্থী—হিন্দুয়ানির আরও বেশি গোঁড়া সমর্থক। তবু পরিণতি যা-ই হোক—সংস্কার অথবা পুনরুজ্জীবন; সেই সময়ের প্রধান কৌতূহল, অর্থাৎ চিন্তার বিষয়বস্তু ছিল অবিমিশ্রভাবে ধর্মানুগ। হিন্দু ধর্ম সংস্কার অথবা পুনরুজ্জীবন এবং মুসলিম রিফর্ম অথবা রিভাইভালিজম ভারতের পটভূমিতে সাম্প্রদায়িক হওয়া ছাড়া আর কী হতে পারত সে সময়?

বস্তুত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় পুরোটা ধরেই এই আন্দোলন কোনোখানে মিলিত না হয়ে সমান্তরাল পথে এগিয়েছে। ভারতে মুসলিম রিফর্ম ও রিভাইভালিস্ট আন্দোলন অনুরূপ হিন্দু আন্দোলন থেকে একটু পুরোনো এই মুসলিম আন্দোলন কোনো বিশেষ খ্রিষ্টীয় প্রোভোকেশন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে বলে মনে হয় না। আসলে মিশনারিরা তাদের পরিকল্পনা শুরু করার আগেই এই আন্দোলন সম্পূর্ণ পরিণতি পেয়ে যায়। ভারতীয় হিন্দুয়ানি এবং ইসলাম যে সময় নিজেদের আবিষ্কার করছে—এই দুই ধর্মের নিবেদিত অনুরাগীরা নিজেদের হৃদয়ের মধ্যে সমকালীন সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চাইছে তখন—সেই সমগ্র সময়ে তাদের ভেতর তাই বিবাদের একটিও রেকর্ড নেই। তারপর একদিন ভারতের মানুষ সত্যি সত্যি যখন ধর্মোন্মাদ হয়ে উঠল, তখনো তাদের একত্রে বসবাসের ক্ষেত্রে তেমন কোনো অসুবিধা হয়েছে মনে করার কারণ নেই। প্রকৃত অসুবিধা দেখা দিল যখন রিভাইভালিস্ট উন্মাদনা কেটে গিয়ে আরও বেশি জাগতিক মানবীয় কাঠামো গড়ে উঠল। কেননা ধর্মীয় আলোচনা যখন আলাপের প্রধান বিষয়বস্তু আর থাকল না তখনো এসব আলোচনার বিষয়বস্তু এমন সহজতর স্বীকৃত হয়ে গেল যে সবাই এটাকে মেনে নিল বিনা প্রশ্নে। এক শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ ধরে যে প্রবল আলোচনা চলে এসেছে, তা চিন্তার এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করল, যা ছিল পুরোপুরি হিন্দু অথবা পুরোপুরি মুসলিম। রাজনৈতিক চিন্তা এবং কর্মকাণ্ডের নেতারা যখন এলেন, তাঁরা তখন একটি ভিত্তির কথা বলতে পারলেন না, খ্রিষ্টধর্ম যেমন সমগ্র ইংরেজ সমাজ চালিত করে। দুঃখজনকভাবে তাঁরা কথা বললেন পরস্পর অসহিষ্ণু দুটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে।

যদি হিন্দু রিফর্ম অথবা রিভাইভালিজম এবং অনুরূপ মুসলিম সংস্কার শুধু ভিন্ন হতো তাহলেও ভবিষ্যৎ মানুষের জন্য তা যথেষ্ট বৃহদাকার সমস্যার সৃষ্টি করত। বস্তুত, পরস্পরবিচ্ছিন্ন তো তারা ছিলই, উপরন্তু প্রায়ই তারা বিবাদে অবতীর্ণ হতো। মুসলিম রিফর্মের লক্ষ্য ছিল হিন্দুয়ানির সংস্পর্শে ভারতবর্ষে

ইসলাম যেসব আচার এবং চিন্তাভ্যাস সঞ্চয় করেছিল তা থেকে তাকে মুক্ত করা।[৮] অপর পক্ষে হিন্দু সংস্কারের লক্ষ্য ছিল ধর্মান্তরিত হিন্দুদের স্বধর্মে ফিরিয়ে আনার পন্থা আবিষ্কার করা এবং যদিও হিন্দু রিফর্ম প্রধানত উদ্ভূত হয়েছিল মিশনারিদের ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে, মিশনারিরা কিন্তু কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করত ইংরেজি প্রসারবাদী সেই হিন্দুদের সঙ্গেই।

কোম্পানি নিজস্ব একটি শিক্ষা প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করার আগে পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে প্রধান শক্তি ছিল নিঃসন্দেহে মিশনারিরাই।[১০] মিশনারিদের প্রভাব কার্যকর হয়েছিল একটি ছোট গোষ্ঠীর চেষ্টার মাধ্যমে। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কেরি, ওয়ার্ড এবং মার্শম্যান। কেরি ছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলার অধ্যাপক। ফলে শতাব্দীর প্রথমাংশে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতিতে তাঁর অবদান ছিল প্রবল। সেই সময়ে কোনো লেখকের পক্ষে সাবস্ক্রিপশনের সাহায্য ছাড়া বাংলায় বই প্রকাশ অসম্ভব ছিল। ভবিষ্যৎপ্রত্যাশী লেখক ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলার অধ্যাপককে উৎসাহিত করতেন, যাতে তাঁর প্রতিষ্ঠান অন্তত ১০০ কপি বই কেনে এই মর্মে তিনি একটি সুপারিশ করেন।[১১] ১০০ কপি বই বিক্রয়ের এই আশাব্যঞ্জক প্রতিশ্রুতি সেই বইটির প্রকাশনাকে সফল করতে পারত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ২৫ বছর যেসব বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছে, তার অধিকাংশই সেসব বই, যা ডক্টর উইলিয়াম কেরি প্রকাশের যোগ্য মনে করেছেন। মার্শম্যান তাঁর প্রভাব কার্যকর করেছেন বাংলা এবং ইংরেজি ভাষার তিনটি পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলো হচ্ছে *সমাচার দর্পণ* (বাংলা এবং ইংরেজি), *দ্য ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া* ও পরে *দ্য গভর্নমেন্ট গেজেট*। মার্শম্যানের প্রধান অবদান, বাংলায় পত্রিকা সম্পাদনায় তিনি এমন কিছু ভারতীয় ব্যক্তির সহযোগিতা গ্রহণ করেছিলেন, যাঁরা প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সুর, স্বভাব এবং কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন।[১২]

ফলে শৈশব সময়েই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমাগ্রগতি সারত শ্রীরামপুরের মিশনারিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। আমাদের জানা প্রয়োজন, কী ছিল এই গোষ্ঠীর অবদান, সেই সম্প্রদায়গত মনোভঙ্গির জন্মদানে ও প্রসারে, যা সেই সময়কার লেখকদের রচনায় অনিবার্যভাবে ছায়া ফেলত; মানুষকে কেবল হিন্দু অথবা মুসলিম অথবা খ্রিষ্টান হিসেবে অঙ্কন করার সেই প্রবল অভ্যাস গঠনে? গোষ্ঠীর চাবিকাঠি *সমাচার দর্পণ* ফারসি অবলুপ্তি আইন ঘোষিত হওয়ার পর বাংলা ভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করতে গিয়ে বলল: প্রথম এবং প্রধান কথা হচ্ছে, যবনদের (মুসলমানদের তখন এই

অপরিসীম ঘৃণাব্যঞ্জক শব্দটি দ্বারা চিহ্নিত করা হতো, অনেকটা প্রথম মহাযুদ্ধকালীন 'হুন' শব্দের মতো) ঔদ্ধত্য ধূলিসাৎ করার সুযোগ এবার এসেছে, এখন আমাদের সামনে অনেক উজ্জ্বল আশা। বাংলা ভাষার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরা লুপ্ত হয়ে যাবে, কেননা তারা বাংলা পড়তে বা লিখতে এখনো সক্ষম নয়, কোনো দিন হবেও না।[১৩]

প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রূপায়ণে এই গোষ্ঠীর ভূমিকা যে মূল্যবান ছিল তা অনস্বীকার্য। এদের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে এরাই বাংলা রেনেসাঁসকে প্রথম জাগিয়েছিল। তারা নিজেরা বস্তুত যা সম্পাদন করেছিল তা গুরুত্বপূর্ণ বৈকি, কিন্তু অন্যদের অন্য কীর্তি সম্পাদনে উৎসাহদানে তাদের অবদান অবিস্মরণীয়। কেননা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে মিশনারিরা অচিরে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু যাদের তারা কর্মে অনুপ্রাণিত করেছিল, তারা পক্ষান্তরে তাদের বংশধরদের হাতে কর্মের ভার দিয়ে গেল। এভাবে তাদের ফুল ফোটানোর ইতিহাস অবিরাম এগিয়ে চলে। এই সময়ের সাহিত্য খুব মহান কিছু অন্তর্নিহিত মূল্য বহন করে না সত্যি, বাংলা ভাষার প্রকাশনা তুলনায় আরও কম সার মূল্যবাহী। কিন্তু দুই সম্প্রদায়ই মুখ্যত উৎসাহী ছিল মিশনারিদের শুরু করা ধর্মীয় বিতণ্ডায়।

১৮৩২ সালের প্রকাশনার কথা বলতে গেলেই বলতে হয় সে সময়ের ধর্মীয় চিন্তার মূল চাবিকাঠিসমূহের কথা। বাংলায় প্রকাশিত তখনকার চারটি অমিশনারি পত্রিকার পরিচয় এই রকম: ক. দ্য ব্রাহ্মণিকাল ম্যাগাজিন: বদ্ধমূল শত্রুর অপ্রত্যাশিত আক্রমণ থেকে হিন্দুদের জানমাল রক্ষার প্রতিশ্রুতিতে প্রবল উত্তেজনায় উন্মত্ত। খ. দ্য চন্দ্রিকা: প্রতিমাপূজার বিশ্বস্ত ভক্তদের অভয়াদাত্রী গোলিয়াথ। গ. সংবাদ কৌমুদী: সেই সব হিন্দুর শপথ উচ্চারণকারী মুখপত্র, যারা কৃতবিদ্য ইউরোপীয়দের সঙ্গে প্রায়ই মেলামেশার ফলে মনে মনে প্রতিমাপূজা বর্জনে কুণ্ঠিত নয়, তবে যাদের অনেকেই কার্যত এই ধর্ম ও তার আচার-পদ্ধতির প্রতি বাহ্য শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে সমপরিমাণে সংকোচহীন। ঘ. *দি এনকোয়ারার* ও জ্ঞানান্বেষণ: শিক্ষিত হিন্দুদের একটি ক্ষুদ্র গোত্রের মুখপত্রদ্বয়, যাঁরা যুগপৎ বিশ্বাসে ও আচারে হিন্দুয়ানির সম্পূর্ণ ধারণাকেই বর্জন করতে প্রস্তুত। *দি এনকোয়ারার দ্য রিফরমার*-এর মতো ইংরেজিতে প্রকাশিত হতো এবং এটা ছিল 'নেটিভ' দ্বারা পরিচালিত প্রথম ইংরেজি সংবাদ পত্রিকা।[১৪]

এভাবে সে সময় প্রকাশনব্যবস্থা বিভিন্ন ধর্মমতের প্রকোষ্ঠে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু তাই বলে ধর্মনিরপেক্ষ জাগতিক বিষয়াদিতে তা উৎসাহী ছিল না, তা নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে নিরপেক্ষ মানসতাও, যতটুকু তার প্রমাণ পাওয়া গেছে, *সমাচার দর্পণ*-এর মনোভঙ্গি থেকে ভিন্ন ছিল না, যে *সমাচার দর্পণ* ছিল

মিশনারিদের নিজস্ব পত্রিকা। *দ্য রিফরমার* লিখেছে: গ্রেট ব্রিটেনের মুসলমান ও হিন্দু প্রজাদের কর্মের পেছনে যে প্রবণতা কাজ করে তার পার্থক্য থেকে আমরা আবিষ্কার করতে পারি প্রথমোক্তদের অবিশ্বস্ততা ও শেষোক্তদের রাজানুগত্য।...সরকারেরও উচিত এ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে মুসলমান প্রজাদের ওপরেই তাদের সতর্ক লক্ষ রাখতে হবে, কেননা মুসলমানরাই বিচ্ছিন্নতা ও বিদ্রোহের প্রতি অতিমাত্রায় আসক্ত।[১৫]

আমি বলছি না যে বাংলার প্রচলন হলেই মুসলমানরা অপসৃত হবে— *সমাচার দর্পণ*-এর এই যুক্তি নির্ভুল। মুসলমানরা একদিন অপসৃত সত্যি হয়েছে, কিন্তু তা অন্য কারণে। এ কথাও বলছি না যে তৎকালীন সরকার *দ্য রিফরমার*-এর পরামর্শে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেছিল। এই ঘটনাগুলো আসলে সে সময়ে বুদ্ধিজীবীদের মানসিকতা অনুধাবনে সংগত সহায়, যে মানসিকতা একদিন রাজনৈতিক আন্দোলনকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। এক টেবিলে বসে রাজনীতি প্রসঙ্গে একটি সাধারণ পরিকল্পনা গ্রহণে হিন্দু ও মুসলমানদের যে ব্যর্থতা, তা শিক্ষিত হিন্দু এবং শিক্ষিত মুসলমানের ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতার বীজ ছিল বুদ্ধিগত মানসের গোড়াকার গঠনপ্রণালিতে এবং তার ধারা আজও প্রবহমান।

বাংলাকে আধুনিক ভাষা হিসেবে একটি আধুনিক সাহিত্যের বাহন হিসেবে লালনে মিশনারিরা তাদের পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিল। অপরিসীম দুর্ভাগ্য এই যে এই অমূল্য কাজটি এমন এক গোষ্ঠীর দ্বারা সাধিত হলো, জনগণের বিভিন্ন সম্প্রদায় সম্পর্কে যাদের এই রকম সব উদ্ভট ধারণা ছিল। বাংলা ভাষার প্রথম পৃষ্ঠপোষকদের এই রকম মনোভঙ্গির সবচেয়ে কম ক্ষতিকর ফল হচ্ছে চেষ্টাকৃতভাবে সংস্কৃতগন্ধি একটি ভাষা। তাদের পক্ষসচেতন মনোভঙ্গির সবচেয়ে স্থায়ী ফলটি উদ্ভূত হয়েছিল যে ঘটনা থেকে তা হলো, ইংরেজি প্রবর্তনে যারা সবচেয়ে বেশি ওকালতি করেছে তাদেরই অনেকে দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে অংশ নিয়েছিল। বস্তুত দেশীয় ভাষার প্রতি মিশনারি পৃষ্ঠপোষকতার মূলে ছিল সেই লক্ষ্য, যা তাদের অনুপ্রাণিত করেছিল ইংরেজি শিক্ষার সমর্থনেও। গ্রান্টের বিপরীতে—যিনি ইংল্যান্ডে ইংরেজি শিক্ষার ওপর আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন—বাংলাদেশে কেরি, মার্শম্যান ও অন্যরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বাইবেল ও অন্য ধর্মসংক্রান্ত রচনাদি এদেশীয় ভাষায় প্রকাশ করা গেলে তা খ্রিষ্টধর্ম প্রচারে সহায়ক হবে। খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের এই প্রচেষ্টা থেকেই বাংলা ভাষায় প্রথম গদ্য রচনার সূত্রপাত। অবশ্যই শুধু তাতেই এটা সীমাবদ্ধ থাকেনি। পাঠ্যবই ও জ্ঞানপ্রিয় রচনাদির মধ্যেও এই মহৎ কর্মপ্রবর্তকদের গোড়াকার পক্ষপাতিত্ব স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছে।

এভাবেই দেশীয় ভাষা উন্নতি লাভ করতে থাকে। এই ভাষার সাহিত্য দ্রুত অগ্রগতি সাধন করে। কিন্তু সাহিত্যের এই আন্দোলনের ও তার অগ্রগতির জনক যাঁরা, তাঁদের চিন্তাধারা ভিন্নধর্মাবলম্বী জনমানুষের জীবনের জন্য বিষবৃক্ষের বীজ বপন করে গেছে। শিক্ষিত মানুষের বিবেক জাগল, জন্ম হলো ধর্মীয় সংস্কারের, আর এই জাগরিত বিবেক স্থায়ী জায়গা করে নিল ধর্মীয় রচনায়। তবু কোনো দিন এই জাগরণ সব ভারতীয়কে অন্তর্ভুক্ত করার মতো উদার হতে পারেনি। ১৮৩৫ থেকে শুরু করে ১৮৬৫-তে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রথম উপন্যাসসহ আত্মপ্রকাশ করার সময় পর্যন্ত দুটো অত্যন্ত সাহিত্যগুণসম্পন্ন পত্রিকা ও কয়েকজন কবির কিছু রচনা প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় বের হতো *সংবাদ প্রভাকর* এবং অক্ষয়কুমার সম্পাদনা করতেন *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকা। সে সময় আরেকবার ধর্মীয় বিষয়ে আত্মনিমগ্নতা প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দেখা দেয়, আর সমাজ পুনর্নির্মাণের কথা উঠলেই ধর্মীয় নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে তা করা হয়। অর্থাৎ সেই সময়ের সিরিয়াস লেখাও কেবল একটি জীবনযাত্রাকেই প্রতিফলিত করে। সেই সময়ের শেষে এসে মানুষ যখন নিরপেক্ষভাবে একটি স্বাধীন রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করেছে, তখনো একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্বের যে অভ্যাস গড়ে উঠেছিল, তা টিকে রইল। বস্তুত, সত্তরের দশকে যখন রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে, তখনো সেই ধর্মকেন্দ্রিকতার পুরোপুরি অবসান হয়নি। ১৮৭০-১৯০০ পর্যন্ত সময় আসলে ছিল বিগত ৭০ বছরের ধর্মোন্মাদনার পূর্ণ বিকাশের সময়। এই সময়ের প্রধান পুরুষেরা রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করার কেউ নন। এঁরা হচ্ছেন কেশব সেন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ এবং বঙ্কিম, যাঁদের প্রধান ভাবনা ছিল ধর্ম। অবিমিশ্রভাবে ধর্মীয় এবং সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ এই দুই পৃথক আন্দোলনের যোগসূত্র যিনি বেঁধেছিলেন, তিনি হচ্ছেন বঙ্কিম। যে পন্থায় তিনি এই কাজটি করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা হচ্ছে: তিনি নিজে ধার্মিক হয়ে গেলেন। তাঁর মহান সাহিত্যপ্রতিভা তিনি নিয়োজিত করলেন তাঁর নিজ গোত্রের মানুষদের সহমর্মিতাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে এই রকম বিষয়ের খোদকারি করতে। বস্তুত তিনি এর চেয়েও এক ধাপ এগিয়েছিলেন। তাঁর প্রায় সব সাহিত্যকর্মের বিষয়বস্তু হিন্দু-মুসলমানের বিবাদকে কেন্দ্র করে পল্লবিত। অর্থাৎ তখনকার শুষ্ক ইতিহাসের পাঠ্যবইতে যেসব জিনিস কমবেশি ইঙ্গিতে বোঝানো হতো, সাহিত্যের হাটে তারই সরাসরি সওদাগরি চলল।

সেই সময়ের লেখার মহৎ উদ্দেশ্য ও সাহিত্যগুণ অনস্বীকার্য। কিন্তু সব জনগণকে নিয়ে যে সমাজ, তার সচেতনতা তখনকার সাহিত্যে অনুপস্থিত। এই সাহিত্য তাই সব তরুণ বাঙালিকে অনুপ্রাণিত করতে পারেনি। শুধু তরুণ

হিন্দুদের এই লেখা নাড়া দিয়েছিল। লেখাগুলো অবশ্য মুসলিমবিদ্বেষী ছিল না। সবচেয়ে যা চোখে পড়ে তা হলো একই দেশের এক বিশাল জন-অংশের মানুষ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র কৌতূহল এসব লেখায় নেই।

এমনকি যখন লেখক উদারভাবে নিখাদ সামাজিক সমস্যাবলিকে তাঁর বিষয়বস্তু করতেন, তখনো সমস্যাগুলো অবিচ্ছিন্নভাবে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকত। বিধবা বিবাহের সমস্যা আগেকার সহমরণের মতো গভীর সাহিত্যগুণসম্পন্ন লেখার জন্ম দিয়েছে। যেমন রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগরের লেখায়। কিন্তু অপর সেই মানুষগুলো, যাদের ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান এই তরুণ ও উচ্ছৃঙ্খল জাগরণে প্রতিফলিত হয়নি, তাদের কথা, মনে হয় না, তখনকার চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনে কখনো উদয় হয়েছে। এভাবে স্বয়ম্ভূ এবং সাম্প্রদায়িক চিন্তাভাবনা এবং অগ্রসরতার গতিধারা ভবিষ্যতের জন্য অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য সমস্যা সৃষ্টি করে গেছে।

কিন্তু সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় মনোভঙ্গির চেয়েও বিপজ্জনক ছিল ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার আধেয়সমূহ, যার দ্বারা তরুণ ভারতবর্ষ তখন লালিত হচ্ছে। ভারতীয় ইতিহাসের অনিষ্টকর পাঠ্যবইসমূহ ইংরেজিতে প্রকাশিত হলেই যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হতো। বইগুলো বাংলায় লেখা হলে এই ক্ষতি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ অপরিসীম হলো যখন ইতিহাসের বিকৃত কাহিনি শক্তিশালী সাহিত্যের আখ্যান হয়ে উঠতে লাগল। ইতিহাসের স্মৃতি পাঠ্যবইয়ের চেয়ে আরও বেশি লালিত হয় কল্পনাশ্রয়ী রচনার দ্বারা, বিশেষত সেগুলোর স্রষ্টা যখন প্রতিভাবান লেখক হন। দুর্ভাগ্যক্রমে ঊনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে শক্তিশালী বাঙালি লেখক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রায় সব লেখাতে ইচ্ছাকৃতভাবে হিন্দু-মুসলমানের উত্তেজনা উসকে দেওয়ার জন্য কলম ধরেছিলেন। ১৮৬৫ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশের পর থেকে আজ পর্যন্ত বঙ্কিম বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বেশি পঠিত লেখক। রামমোহন রায় থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত ধর্মীয় চিন্তা ও আচারাদির সংস্কারে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদিত অন্য মনীষীদের মধ্যে বঙ্কিম ঊনবিংশ শতাব্দীর সৃষ্টিশীল কর্মক্রিয়ায় সবচেয়ে উজ্জ্বল।

তাঁর 'বন্দে মাতরম' গানটি এখন পর্যন্ত ভারতীয়দের চিন্তায় ও মননে তাঁর যে স্থান তারই স্থায়ী স্মৃতিসৌধ। গানটি তাঁর সবচেয়ে বেশি পঠিত উপন্যাস *আনন্দমঠে* স্থিত। *আনন্দমঠ* একটি অত্যন্ত আবেগাশ্রিত উপন্যাস। যার বিষয়বস্তু একটি হিন্দু-মুসলিম বিবাদ। বাংলা ভাষায় এটি প্রথম রাজনৈতিক বিষয়বস্তুসংবলিত সাহিত্যকীর্তি। এই মাতৃ-বন্দনা (বন্দে মাতরম) অবিশ্বাসী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমনোদ্যত হিন্দু 'সন্তানদের' সমর-সংগীত।

উপন্যাসটি এমন একজন প্রতিভাশালী লেখকের সৃষ্টি, যিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি ঘৃণা-স্তোত্র রচনা করার জন্য। উপন্যাসটি ১৮৮২ সালে প্রকাশিত হয়, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসার তিন বছর আগে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সম্মিলিত নেতারা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সৌহার্দ্যসুলভ সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেছিলেন। বর্ধমান জাতীয় আন্দোলনের এই কেন্দ্রীয় মুখপাত্রটিতে এরূপ প্রস্তাবের কোনো অভাব নেই, যেখানে এই সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্কের কামনা প্রকাশিত হয়েছে। এই রকম অবস্থায় এই রকম একটি গানকে জাতীয় আন্দোলন তাদের মূলমন্ত্র হিসেবে বেছে নিল কেমন করে? এই বইটিই বা এত জনপ্রিয় হলো কেন? এটা ভাবা অযৌক্তিক হবে না হয়তো যে গল্পটি এমন এক শ্রোতৃ-শ্রেণির কাছে বলা হয়েছিল, যারা এটিকে একটি স্বাভাবিক থিম হিসেবে নিয়েছিল। (আমেরিকান চলচ্চিত্রে নিগ্রোদের উপস্থাপন এ রকম মানসিকতার পরিচায়ক)। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে ইন্টেলেকচুয়াল উত্তেজনা ও সাধারণ অনুসন্ধিৎসা পাশাপাশি এগিয়েছিল। অষ্টাদশ শতকে মোগল প্রশাসন প্রণালির কেন্দ্রীয় কাঠামোর অবলুপ্তি এবং সেই সঙ্গে পাশ্চাত্যের প্রভাব ঊনবিংশ শতাব্দীর নতুন ইন্টেলেকচুয়াল সূত্রসমূহের জন্ম দিয়েছিল।

সমগ্র দেশে সমস্ত জনগণের মধ্যে দুটি সমান্তরাল প্রণালি বহুদিন এগিয়ে চলেছিল পরস্পরের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছাড়া। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে ইন্টেলেকচুয়াল প্রক্রিয়াদির ধর্মীয় ভিত্তি অবশ্যম্ভাবী এবং অনিবার্য একটি পরিণতি সৃষ্টি করেছিল, যার ফলে এই দুই প্রণালি মিলেমিশে না গিয়ে সমান্তরালভাবে এগিয়েছে। যত দিন অবিমিশ্র ধর্মীয় সমস্যাদি এবং ধর্মীয় আচারসংক্রান্ত সামাজিক সমস্যাদি প্রধান কৌতূহলের বিষয় ছিল তত দিন এই দুই সমান্তরাল স্রোত নির্বিবাদে এগিয়েছে। এই সমান্তরাল সমতা অবশ্য যতটা পূর্ণ উদাসীনতার ফল, ততটা সুবিবেচক সহিষ্ণুতার নয়। বস্তুত, সেই সময়ের জাগতিক শিক্ষায় ঐতিহাসিক সামগ্রীর এমন একটি দূষিত সংমিশ্রণ থাকত, যা জনসমষ্টির এক সম্প্রদায়কে আরেক সম্প্রদায়ের ঘৃণা ও ক্রোধের বস্তু করে তুলত। ফলে দুই সম্প্রদায়ের মাঝখানে ক্রমেই একটি কঠিন দেয়াল তৈরি হতে লাগল।

পাঠ্যবইপ্রণেতাদের পরীক্ষামূলক ও নিদারুণ অশিল্পীসুলভ প্রচেষ্টা বঙ্কিম এবং অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী একদল লেখকের প্রতিভার দ্বারা সাহিত্য মাধুর্য ও সৌকর্যে শোভিত হয়ে উঠেছিল। সমকালীন পুনর্জাগরণের উন্মাদনা তাদের জনপ্রিয়তাকে বর্ধিত করেছে। কিন্তু বঙ্কিম এবং তাঁর সমসাময়িক

লেখকেরা সেই শিক্ষিত জন-অংশের স্রষ্টা নয়, যারা এসব বইয়ের প্রতি তাদের চিন্তাহীন ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ সাদর অভ্যর্থনা প্রসারিত করত। এই পটভূমি আধা শতাব্দীর সাম্প্রদায়িক চিন্তা ও অগ্রগতির দ্বারা তৈরি হয়েই ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কষ্টসাধ্যভাবে গড়ে তোলা এই ঐতিহ্য সত্তর দশকের পর থেকে, যা রাজনৈতিক চিন্তা ও আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হলো, তা কেবল ভারতীয় অথবা বাঙালি অথবা মারাঠি কিংবা পাঞ্জাবি নয়, তা হলো হিন্দু নয়তো মুসলিম ঐতিহ্য। একজন বাঙালি লেখক, তিনি প্রতিভাশালী হন বা না হন, তাঁর বিষয়বস্তুর জন্য নায়ক খুঁজে পেতেন একজন রাজপুত অথবা মারাঠির মধ্যে, যদিও তার কাছে মারাঠিদের স্মৃতি জড়িয়ে ছিল বাংলায় তাদের লুটতরাজ ও ধ্বংসসাধনের সঙ্গে। যোগসূত্র ছিল ধর্মে। ভারতে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ, যা পাকিস্তান প্রশ্নের চেয়ে অনেক পুরোনো, ভারতীয় রাজনীতিতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দলসমূহের দ্বারা ওই সাম্প্রদায়িকতার ফল নয়। ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে প্রবাহিত ইন্টেলেকচুয়াল প্রবণতার সম্পূর্ণ গতিধারা থেকে—অন্তত শিক্ষিত শ্রেণিসমূহের মধ্যে— অনিবার্যভাবেই এই বোধের বিকাশ ঘটেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ইন্টেলেকচুয়াল উত্তেজনার পরপরই যে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার স্বরূপ ও অভ্যন্তরীণ উপাদানসমূহকে বুঝতে হলে অবশ্যম্ভাবীভাবে ভারতের দেশীয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে ভারতীয়দের সৃষ্টিশীল ক্রিয়াকাণ্ড পূর্ণ প্রতিফলন পেয়েছে তাদের সাহিত্যের অগ্রগতিতে। দেশীয় সাহিত্য সেই চিন্তার পরিবেশ তৈরি করেছিল, যা শিক্ষিত ভারতীয়দের সচেতন রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহকে রূপায়িত করেছে। কনফারেন্স অথবা কংগ্রেস কিংবা তাদের কার্যবিবরণীতে শুধু আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তসমূহের বিশ্লেষণই রাজনৈতিক আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ উপাদানের উপলব্ধির জন্য যথোপযুক্ত পথনির্দেশক নয়। যারা এসব জিনিসের মধ্যে অথবা রাজনৈতিক লেখায় ভারতীয় রাজনীতির গতি ও প্রকৃতিকে বুঝতে চায়, তাদের কাছে সব সময়ই অবোধ্য থাকবে কী অনমনীয় এবং জেদি অধ্যবসায়সহ ভারতের মুসলমানরা তাদের 'পৃথক রাজনীতি' নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। যদিও পরের দিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিরাটসংখ্যক মানুষ রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল, আন্দোলনের চরিত্র বরাবর নির্ধারিত হয়েছে শিক্ষিত পেশাদার মানুষের দ্বারাই।

যে ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে ভারতের শিক্ষিত সমাজ গড়ে উঠেছিল তা একক ছিল না, ছিল দ্বিধাবিভক্ত এবং দুর্ভাগ্য এই যে তারা ছিল পরস্পর নিরপেক্ষ। সে কারণে এমনকি সাধারণ উদ্বেগের প্রশ্নেও যখন তারা আলোচনা

করত, তখনো তাদের মানসিক ক্ষেত্র হতো সম্পূর্ণ ভিন্ন। দেশীয় সাহিত্যের মুসলমান-লালিত অংশ স্পষ্টত ইসলামি জীবনের ও গড়পড়তা মুসলমানের অস্থানিক মনোভঙ্গি প্রতিফলিত করে। বিশ দশকের খিলাফত আন্দোলন, গান্ধী যাকে এত সক্ষমভাবে সহায়তা করেছিলেন, একমাত্র এই অস্থানিক মনোভঙ্গির ভাষাতেই বোধগম্য হতে পারে। এই আন্দোলনের লক্ষণসমূহকে উপলব্ধি করতে, যে জীবন ধারণার ওপর রচিত ছিল এর ভিত তাকে বুঝতে, কী শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় গান্ধী দিয়েছিলেন তা বোঝা যায় এই আন্দোলন থেকে তাঁর প্রত্যাশার পরিমাণ দেখে। তিনি সত্যি বিশ্বাস করেছিলেন মুসলমান ও হিন্দুদের আরও বেশি ধর্মসচেতন করে রাজনৈতিক প্রগতি ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের উদ্দেশ্য ফলপ্রসূ করা সম্ভব।

এই পর্যন্ত আমি যা বলতে চেয়েছি তা হলো, শিক্ষিত ভারতীয়দের মানসিকতা বিকশিত হচ্ছিল সুনিশ্চিত বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়ে। বাংলার রেনেসাঁসের ইতিহাস হচ্ছে বাংলার হিন্দু সমাজে আধুনিক ধারণাসমূহের প্রযুক্তির ইতিহাস। সাহিত্যিক নথি থেকে যতটুকু প্রমাণ পাওয়া যায়, সৃষ্টিশীল সাহিত্যের অন্তর্গত চিন্তাধারণা থেকে যতটুকু জানা সম্ভব, বাংলার অহিন্দু জন-অংশের সঙ্গে এর কোনো সংযোগ ছিল না। বাংলার চিন্তার ইতিহাস যদি ভারতের চিন্তার ইতিহাস হতো, তাহলে পরবর্তীকালে যেসব সমস্যা ভারতকে বিচলিত করেছিল, তার একটি সমাধান হয়তো পাওয়া যেত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে কেউ ভুলেও ভাবেনি যে ভারতে একটিমাত্র সমাজ কখনো হতে পারে। সে কারণে এটা অস্বাভাবিক নয় যে বাংলায় রামমোহনের হৃদয়ান্বেষণের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সমাজেও অনুরূপ একটি হৃদয়ান্বেষণ শুরু হয়েছিল। মুসলিম সমাজ অপর সমাজটি থেকে কত দূরে অবস্থান করছিল তা এই ঘটনা থেকে বোঝা যাবে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে যখন মুসলিম জাগরণ এমনকি বাংলাতেও প্রসারিত হয়েছে, বাংলার নতুন প্রকাশনা জগতে তা প্রবেশ লাভ করতে পারেনি, কোনো ছায়া ফেলতে পারেনি তখনকার উদ্বিগ্ন নতুন সাহিত্যে।

তবু সেই জাগরণ সত্যি ছিল। সমাজের ফাটল দ্রুত প্রসারিত হচ্ছিল সম্পূর্ণ অষ্টাদশ শতাব্দী ধরেই, এমনকি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকাণ্ড ব্যতিরেকেই। সিরিয়াস ব্যক্তিরা সমাজের এই আসন্ন ভাঙনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেদের হৃদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করতে শুরু করেন এবং অচিরে দিল্লি ও তার আশপাশে এক নতুন জীবনের আলোড়ন শুরু হয়ে যায়। এসব মনীষী পশ্চিমের তাড়নায় এখানে আসেননি। শাহ ওয়ালিউল্লাহ, আবদুল আজিজ ও সৈয়দ আহমদ ব্রেলভি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম

দিকে মুসলিম সমাজে তা-ই ছিলেন, হিন্দু সমাজে রাজা রামমোহন ও তাঁর অব্যবহিত অনুগামীরা যা ছিলেন। ভিন্নতা ছিল অবশ্যই এবং সূক্ষ্মভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভিন্নতাও, কিন্তু সাধারণত এই দুই আন্দোলনের অভ্যন্তরে একটি মিল ছিল দৃষ্টিভঙ্গির। দুই সমাজই চেয়েছিল সমাজকে পুনর্নির্মাণ করতে। যে মূলনীতির দ্বারা সমাজকে চিহ্নিত করা হতো তা ছিল ধর্মীয়। ফলিত চিন্তা, যখন তা এমনকি সামাজিক ও পরে রাজনীতিক প্রশ্নাবলিকেও স্পর্শ করত, ছিল সাম্প্রদায়িক। ভারতের সমস্ত জনগণের জন্য এর কোনো প্রাসঙ্গিকতা ছিল না। সৈয়দ আহমদ ব্রেলভি ও তাঁর অব্যবহিত অনুগামীদের দ্বারা প্রচারিত ধর্মীয় মতবাদসমূহ মুসলিম সমাজ গ্রহণ করেনি, ঠিক যেমন রামমোহন ও তাঁর অনুগামীদের ব্রাহ্মসমাজের ধর্মীয় মতবাদ হিন্দু সমাজে গৃহীত হয়নি। শিক্ষিত মুসলমানরা সবিশেষ চেষ্টা করত বাংলায় সৈয়দ আহমদ ব্রেলভি ও শরীয়তউল্লাহর কিছু কিছু রাজনৈতিক ও সামাজিক মতবাদ অস্বীকার করতে। কিন্তু শিক্ষিত মুসলমান সমাজ কখনো অস্বীকার করতে পারেনি—চেষ্টাও করেনি অস্বীকার করতে—আন্দোলনের মূল ধারণাসমূহের অভ্যন্তরের সেই উপাদানটিকে, যা তাদের সাম্প্রদায়িক চিন্তাভাবনায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছিল। মুসলিম সমাজ ও মুসলিম চিন্তার পুনর্জাগরণ ও পুনর্নির্মাণের প্রচেষ্টায় নিজেদের উৎসর্গীকৃত করেছিল শিক্ষিত মুসলমানরা। ভারতীয় অমুসলিম জনগণের প্রতি ঠিক সেই উদাসীনতা ছিল তাদের, যে উদাসীনতা শিক্ষিত হিন্দুরা পোষণ করত ভারতের অহিন্দুদের প্রতি। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উর্দু সাহিত্যের মূল বিষয়বস্তুসমূহের সঙ্গে ভারতীয় অমুসলিম মানুষের কোনো মিল ছিল না।

রাজা রামমোহনের নেতৃত্বে যে আন্দোলনটি গড়ে উঠেছিল তা ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক, যেখানে শাসকশ্রেণি তার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও জৌলুশ ধারণ করে থাকত। এই আন্দোলনটি মূলত ছিল মিশনারিদের আক্রমণের বিরুদ্ধে একটি আত্মরক্ষামূলক অঙ্গবিন্যাস। ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ও দেশীয় ভাষার চর্চা যুক্ত ছিল সম্পূর্ণ আন্দোলনটির সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত শাসকশ্রেণির ভাষার চর্চা দেশীয় সমাজে সেই শ্রেণিটির অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিপুল ফলবতী হয়। সে কারণে মুসলমান সমাজে জনিত আন্দোলনটি ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে যুক্ত নয়, এই সত্যটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

এটা স্পষ্ট যে সে সময়ে ইংরেজি শিক্ষার যুগপৎ পরিচর্যা ব্যতিরেকেই গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার কাজ এগিয়েছিল। ইংরেজি না জানলেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরি পাওয়া যেত বলে মুসলমানরা ইংরেজি ভাষা শেখার ব্যাপারে তখনো উদাসীন। কিন্তু এই মানসিকতার ফল স্পষ্ট হয়ে উঠল মাত্র

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, যখন দেশীয় সমাজে অবস্থান প্রায় সম্পূর্ণভাবে ইংরেজি শিক্ষার ওপরই নির্ভর করত।

এই দুই আন্দোলনের ভিন্ন গতির ফলে আরও দুটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। রাজা রামমোহনের আন্দোলনটি কখনোই নবউদ্‌গত ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে দূরে যেতে পারেনি। এই আন্দোলনের বিষয়সমূহ ছিল ধীর কিন্তু স্থিরগতি এবং কখনোই তা গতি পরিবর্তন করেনি। কিছুদিন আগে পর্যন্তও শাসকশ্রেণির সঙ্গে এই আন্দোলনের এবং তার বিভিন্ন প্রশাখার সম্পর্ক ছিল মোটের ওপর সৌহার্দ্যপূর্ণ। মেকলের আমল থেকে শাসকশ্রেণি ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে বিপুল গর্ব অনুভব করে এসেছে, কেননা তারা বিশ্বাস করত যে নতুন বুদ্ধিজীবী জাগরণটি ছিল সম্পূর্ণ এই ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ফল। শিক্ষিত সমাজ কিন্তু মনে মনে জানত যে সমাজে তার সাফল্য এবং অবস্থান প্রচলিত শাসনপ্রণালির রক্ষণের সঙ্গে যুক্ত। এই সমাজটির সামাজিক দর্শনের মূল ধারণাসমূহ শাসকশ্রেণিকে কখনো অসুবিধায় বা অস্বস্তিতে ফেলতে পারেনি। এমনকি নতুন বাংলা ভাষা, যার উন্নতিসাধন এই আন্দোলনের একটি প্রধান অবদান, শিখতে হতো অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করে। সত্তরের দশক ও তার পরবর্তী সময়ে পূর্ববর্তী সময়ের সংস্কৃত পরিবৃদ্ধিকে অপসারণ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালাতে হয়েছিল। নতুন সাহিত্যের অবদানসমূহ অনেক দিন পর্যন্ত একটি তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র শ্রেণির মধ্যে ভীষণভাবে সীমাবদ্ধ ছিল।

সৈয়দ আহমদ ব্রেলভির আন্দোলনটি অবশ্য অতি শিগগিরই মুসলমানদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল।[১৬] এর সাহিত্য একটি জ্ঞানোদ্ধত অপভাষায় পরিণত হয়নি। এই আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষণাদি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে বিপজ্জনক ছিল এবং তার ফলে শিক্ষিত মুসলমানদেরই একটি গোষ্ঠী একে অভিসম্পাতগ্রস্ত মনে করে। অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমান সমাজের একটি বাড়তি দায়িত্ব হয়ে পড়ে, যাঁরা তাদের সমাজে চিন্তার জলবায়ু পুনর্নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন তাঁদের কিছু কিছু ধারণাকে অস্বীকার করা। একটি নির্দিষ্ট ঐতিহ্য ছিল চিন্তার প্রচলিত ছাঁচ। এমনকি স্যার সৈয়দ আহমদ, যিনি সৈয়দ আহমদ ব্রেলভির কিছু কিছু মতবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন, তিনিই মূলত ছিলেন ধর্মীয় চিন্তার পুনর্নির্মাণের ব্যাপারে উৎসাহী। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমানরা সেই ঐতিহ্যের কিছু কিছু আইটেম নিয়ে সত্যি সন্ত্রস্ত ছিল। এই শ্রেণিটিকে, যদিও সংখ্যায় এরা অপেক্ষাকৃত দুর্বল, একটি দ্বিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যা অপর মধ্যবিত্ত শ্রেণিটির হতে হয়নি। মধ্যবিত্ত মুসলমানদের নিজেদেরই এই

সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে হয়েছে এবং উপরন্তু এমন এক শ্রোতৃশ্রেণির কাছে তাদের উদ্দেশ্য বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হয়েছে, যারা বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল না সত্তরের দশকের মুসলমানদের রাজনৈতিক চিন্তায় যে হতবুদ্ধিতা দেখা গিয়েছিল, তা এই দুই কঠিন সমস্যার সমাধান খোঁজার কঠোর উদ্যমের পরিণতি।

উর্দু সাহিত্যের অগ্রগতি—বাংলা সাহিত্যের মতোই—এমন ছিল যে গড়পড়তা হিন্দু পাঠক তাতে তেমন আনন্দ পায়নি। দুর্ভাগ্যক্রমে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে উত্তর ভারতের নিজস্ব সাহিত্যসমূহ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একটি কৃত্রিম জাতীয়তাবোধ থেকে, যা প্রায় সাম্প্রদায়িকতার নামান্তর। উত্তর ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে এ রকম হিন্দু গ্র্যাজুয়েট এবং আন্ডারগ্র্যাজুয়েট পাওয়া অসম্ভব নয়, যা মনে করে হিন্দি ভাষার প্রতি তাদের কর্তব্য হচ্ছে এক বা দুই জেনারেশন আগেও তাদের পূর্বপুরুষেরা যে ভাষায় পারদর্শিতা দেখিয়েছে, সেই ভাষা ও সেই ভাষার সাহিত্যকে তাদের চিন্তা থেকে নির্বাসিত করা।[১৭] আসলে উর্দু সাহিত্যের থিম এমনই যে তা শুধু মুসলমানদেরই আকৃষ্ট করে। বাংলায় *আনন্দমঠ* যে স্থান দখল করেছে, উর্দুতে সেই স্থান দেওয়া হয় ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত হালির একটি কবিতাকে। হালির 'মুসাদ্দাস' কবিতাটি ইসলামের উত্থান ও পতনের একটি কাহিনি। সব উঁচু দরের উর্দু গদ্য—স্যার সৈয়দ আহমদ, মোহাম্মদ আজাদ তাকাউল্লাহ অথবা নাজির আহ্‌মদ—যাঁরই হোক, এমন বিষয় নিয়ে রচিত, যা শুধু মুসলমানদের উৎসাহিত করে। তাঁরা যে সমাজ পুনর্নির্মাণ করতে চান, তা মুসলিম সমাজ এবং তাই উর্দু সাহিত্যের হিন্দু গ্র্যাজুয়েট বা আন্ডারগ্র্যাজুয়েটকে হালির বিলাপ উৎসাহিত করতে সক্ষম নয়।

যে স্থায়ী ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে পরবর্তীকালে রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহ জন্মলাভ করেছিল, প্রধানত তখনকার স্থায়ী সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে তার সন্ধান পাওয়া যাবে। কারণ, রাজনৈতিক আন্দোলন শিক্ষিত সমাজেরই মানসিকতাকে প্রতিফলিত করে। সেই মানসিকতার ছবি সেই সমাজেরই সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরভাবে সংরক্ষিত। এই সাহিত্যের স্বভাব এবং উপকরণ, তার প্রবণতা, তার বিষয়বস্তু নির্বাচন, অনুপ্রেরণার উৎস, শুধু এসব থেকেই সে সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহের মৌলিক ধারার প্রকৃতি আমরা জানতে পারি। যে ইন্টেলেকচুয়াল ঐতিহ্য রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহে নেতৃত্বদানকারী শিক্ষিত ভারতীয়দের অশিক্ষিত ভারতীয়দের থেকে আলাদা করেছিল তা ছিল একটি খুব অনিশ্চিত সম্পদ।

তথ্য-সংকেত

১. কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৮০ সালে। তখন দেশের প্রচলিত আইন ছিল প্রধানত মুসলিম আইন এবং এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম আইনে পারদর্শী তৈরি করা।
(ক) এ সি ল্যানিয়াল : 'ক্যালকাটা মাদ্রাসা', 'বেঙ্গল পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট'—জুন ১৯১৪।
(খ) চার্লস লাশিংটন : *দ্য হিস্টরি, ডিজাইন অ্যান্ড প্রেজেন্ট স্টেট অব দ্য রিলিজিয়াস বেনিভোলেন্ট ইনস্টিটিউশনস, ফাউন্ডেড বাই দ্য ব্রিটিশ ইন ক্যালকাটা অ্যান্ড ইটস ভিসিনিটি*, পৃ. ১৩৫-৪১।

২. কলকাতা মাদ্রাসার পাঠ্যসূচি সম্পর্কে স্যার ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার লিখেছেন, 'নব্বই বছর ধরে (অর্থাৎ, শুরু থেকেই) কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ ছিল মাদ্রাসার সবচেয়ে প্রিয় পাঠ্য বিষয়।' *ইন্ডিয়ান মুসলমানস* (১৮৭৬), পৃ. ২০৪।

৩. *দ্য ক্যালকাটা রিভিউ*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২১৩-৪৬।

৪. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অ্যাক্ট ১৮১৩, ধারা ৪৩। বাৎসরিক এক লাখ টাকা 'সংরক্ষিত থাকবে সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়ন ও ভারতের শিক্ষিত নেটিভদের উৎসাহদানের জন্য এবং ভারতের ব্রিটিশ রাজ্যসমূহের জনগণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রবর্তন ও প্রসারের জন্য।'

৫. ১৮১৩ অ্যাক্টের ৪৩ ধারায় ১৮১৪ সালে হাউস অব কমনসের একটি সরকারি প্রস্তাবের মূলনীতিসমূহ ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়। প্রস্তাবটি অ্যাক্টের এই ধারার চেয়ে বেশি খোলাসা এবং তাতে আরও স্পষ্টভাবে ইংরেজি শিক্ষা বা ধর্মান্তরের সম্পর্কটি আলোচিত হয়েছে। প্রস্তাবটি হচ্ছে :
'এই রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে ভারতের ব্রিটিশ রাজ্যসমূহের নেটিভ অধিবাসীদের স্বার্থ-সুখ বর্ধিত করা এবং এ রূপ কর্মপন্থা অবলম্বন করা উচিত, যা তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নতি প্রবর্তনে সহায়তা করবে। উপরিউক্ত উদ্দেশ্যগুলির সাধনকল্পে আইন অনুযায়ী তাঁদের যথোপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে, যাঁরা হিতকর উদ্দেশ্যসমূহ সম্পাদনের জন্য ভারতে যাবেন এবং সেখানে অবস্থান করবেন।'

৬. 'এ স্কেচ অব দি অরিজিন, রাইস অ্যান্ড প্রোগ্রেস অব দ্য হিন্দু কলেজ', *দ্য ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজারভার*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৫।

৭. প্রসপেক্টাস অব দ্য হিন্দু কলেজ ২৭ আগস্ট, ১৮১৬, *দ্য ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজারভার*-এ উদ্ধৃত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৫-১১৭।

৮. (ক) *সমাচার দর্পণ*, ১৮ আগস্ট, ১৮১৯।
(খ) স্যার ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার : *ইন্ডিয়ান মুসলমানস* (১৮৭৬), পৃ. ৫১-৫৯।

৯. 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', বি এন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৭৬-৭৯।

১০. ৪ জুলাই ১৮১৭, ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি ও ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮১৮ ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির পত্তন ভারতে ইংরেজি শিক্ষার উৎসাহী কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ কর্তাদের—যদিও তখনো কোম্পানির সরাসরি পক্ষে নয়—প্রথম পদার্পণ সূচিত করে।

১১. কেরি লিখেছেন : 'কলেজের বেঙ্গলি ফ্লাকচুয়েটিং এস্টাবলিশমেন্টের পণ্ডিত হর প্রসাদ একটি সংস্কৃত বই অনুবাদ করেছেন। এখন ১০০ কপি বইয়ের সাবস্ক্রিপ্ট আশ্বাস পেলে তিনি বইটি ছাপাতে চান।' হোম মিসেলেনিয়াস, সংখ্যা ৫৬৩। পৃ. ৩৪৩।

১২. এই কাগজটির প্রকাশনে, মার্শম্যান যার নামমাত্র সম্পাদক ছিলেন, পণ্ডিতদের সহযোগিতা এত প্রয়োজনীয় ছিল যে তাঁরা কোনো কারণে শ্রীরামপুরের বাইরে থাকলে পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ রাখতে হতো— *সমাচার দর্পণ*, ২৬ অক্টোবর, ১৮৩৩।

১৩. *সমাচার দর্পণ*, ১৩ ডিসেম্বর, ১৮৩১।

১৪. 'জেনারেল ক্যারেকটেরিস্টিক্স অব দ্য নেটিভ নিউজপেপারস', *দ্য ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজারভার*, প্রথম খণ্ড (১৮৩২) পৃ. ২০৯-১৮।

১৫. *দ্য রিফরমার*, ১৮ নভেম্বর, ১৮৩১।

১৬. রাম বাবা শাকসেনা : *এ হিস্টরি অব ইন্ডিয়ান লিটারেচার* (১৯২৭), পৃ. ২৬৫-৬৬।

১৭. স্যার টি বি সাপরু : আর বি শাকসেনার, *এ হিস্টরি অব ইন্ডিয়ান লিটারেচার*-এর ভূমিকা।

মাহমুদ রশীদ অনূদিত

প্রতি চিন্তা
অনুস্মৃতি

আনোয়ারা বাহার চৌধুরী

ঢাকার বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত এক নারীর শিক্ষা-সাংস্কৃতিক উদ্যোগ

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী

বেবী মওদুদ

[আনোয়ারা বাহার চৌধুরী (১৯১৯-১৯৮৭) সমাজসেবক, শিক্ষাবিদ, লেখক। জন্ম ১৯১৯ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার আজিজগঞ্জে। তাঁর শৈশবকাল অতিবাহিত হয় মানিকগঞ্জ জেলায়। ঢাকার পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। তৃতীয় শ্রেণিতে তিনি বৃত্তি পান এবং ১৯২৯ সালে নিউ গার্লস হাইস্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন। পরে কলকাতায় সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল থেকে প্রবেশিকা পাস করেন। তিনি বেথুন কলেজ থেকে আইএ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৮ সালে বিএ এবং ১৯৪০ সালে বিটি পাস করেন। মেধাবী ছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও পারিবারিক রক্ষণশীলতার কারণে তাঁকে অবরোধবাসিনী হয়ে পাঠ সমাপ্ত করতে হয়।

কর্মজীবনের শুরুতে তিনি কিছুদিন কলকাতায় লেডি ব্রাবোর্ন কলেজে শিক্ষকতা করেন। তবে তাঁর সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন কাটে কলকাতার সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল, ময়মনসিংহের বিদ্যাময়ী স্কুল, ঢাকার কামরুন্নেসা স্কুল ও কলেজ এবং বাংলাবাজার হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষয়িত্রী পদে।

১৯৪১ সালে তিনি ঢাকায় 'সুরবিতান' নামে নৃত্য ও সংগীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৫৫ সালে 'বুলবুল ললিতকলা একাডেমী'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, কোষাধ্যক্ষ এবং পরে এর সম্পাদক হন। তিনি বাংলা একাডেমীর জীবন সদস্য ছিলেন। ১৯৬১ সালে ঢাকার শান্তিনগরে হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে তিনি এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে ছিলেন। আনোয়ারা বাহার চৌধুরী 'আপওয়া'র সহসভানেত্রী ও 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলামে'র সম্পাদক হিসেবেও বহুদিন সমাজসেবায় নিয়োজিত ছিলেন।

ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি সাহিত্যচর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। সাহিত্যে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ 'চতুর্থবার হজ্ব' নামক একটি ছোট গল্পের মাধ্যমে। পরবর্তী সময়ে তাঁর

বেশ কিছু রচনা ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: ১. ছবি দেখি ছড়া শিখি, ২. কিচির মিচির, ৩. হরেক রকম, ৪. বিচিত্রা, ৫. আমার চেতনার রং। ১৯৮৭ সালের ২৭ অক্টোবর তাঁর মৃত্যু হয়। বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরের কথ্য ইতিহাস প্রকল্পের আওতায় সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছিলেন প্রয়াত বেবী মওদুদ। গৃহীত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতেই বর্ণনা আকারে এ রচনাটি ছাপা হলো। আর প্রকল্পটির সমন্বয়কারী ছিলেন ইতিহাসবিদ প্রয়াত ড. সালাহ্ উদ্দীন আহমদ।]

আমার দেশের বাড়ি ঢাকা। কিন্তু আমার জন্ম হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জে। সেখানে আমার নানা সরকারি চাকরিতে ছিলেন। তাঁর কর্মস্থলের বাসভবনেই আমার জন্ম।[১] বছর দুয়েক বয়সে আমি আমার মাকে হারাই।[২] এর পর থেকে অর্থাৎ আমি আমার নানি আর খালার কাছেই মানুষ হতে থাকি। বলতে গেলে তখন থেকে আমি ঢাকা শহরেই বড় হয়েছি।

আমার খালা[৩] সে যুগে যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন। তিনি বাংলা, ইংরেজি, উর্দু ও আরবি ভালোই জানতেন। আমার নানিও কিছু কিছু খেলাপড়া জানতেন। আমাদের পরিবারটা আসলে ছিল বেশ উদারমনা এবং শিক্ষার আলোয় আলোকিত। এর কারণ আমার নানা মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে খুবই উৎসাহী ছিলেন।

যথাসময়েই আমাকে স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল। আমাদের বাড়ির পাশেই ছিল একটা প্রাইমারি স্কুল। ওখানে পড়ে আমি তৃতীয় শ্রেণিতে বৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে বৃত্তি পাই। তারপর আমি ঢাকায় নতুন চালু হওয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দীপালি স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলাম। ওই স্কুলটা খুলেছিলেন তখনকার বিখ্যাত নারীনেত্রী লীলা রায়।[৪] পরে বৈবাহিক সূত্রে তিনি লীলা নাগ হয়েছিলেন। খুবই প্রগতিশীল এবং নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মী হিসেবে ঢাকায় তখন তাঁর খুবই নামডাক। তাঁর এবং তাঁর সহকর্মীদের প্রচেষ্টাতেই স্কুলটা চালু করা হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাকালের দু-এক বছরের মাথায়ই সেটা বর্তমান কামরুন্নেসা স্কুল টিকাটুলীর যেখানে যে বাড়িতে, সেখানে চলে আসে। তবে নতুন বাড়িতে আসার পর স্কুলটার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় কামরুন্নেসা স্কুল। কামরুন্নেসা বেগম ছিলেন ঢাকার নবাব পরিবারের একজন সদস্যা। তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা তাঁরই নামে এই বাড়িটি স্কুলকে দান করেন। ফলে কামরুন্নেসা বেগমের নামানুসারেই 'কামরুন্নেসা গার্লস হাই স্কুল' চালু হয়ে যায়। এটা আমার যদ্দুর মনে পড়ে, ১৯২৯ সালের কথা। ওই স্কুলে তখন প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন মিসেস সুজাতা রায়। তিনি খুবই যোগ্য মানুষ ছিলেন। খুবই স্নেহময়ী ছিলেন। স্কুলের ভালো-মন্দের ব্যাপারে প্রখর মনোযোগ ছিল তাঁর।

আমাদের বাড়িতে একটা সাহিত্যিক পরিবেশ ছিল। আমার খালাম্মা সব সময়ই কবিতা আবৃত্তি, গল্প বা উপন্যাস থেকে পাঠ—এ সবকিছু খুবই পছন্দ করতেন।

আমার দুই খালাতো ভাই, বিশেষ করে ছোট ভাইটি, ঢাকার লাইব্রেরি থেকে অনেক বই (যেগুলো প্রধানত ছিল শরৎচন্দ্র আর অন্যান্য সাহিত্যিকের লেখা) নিয়ে আসত। পাঠ্যবইয়ের ছকবাঁধা পড়াশোনার দিকে তার তেমন একটা মনোযোগ নেই। থাকলেও পাঠ্যবহির্ভূত বই পড়ার দিকে খুবই ঝোঁক ছিল। আর তখনকার দিনের তরুণ সাহিত্যিক, পরবর্তীকালে প্রখ্যাত কথাশিল্পী আবুল ফজল[৫], কবি আবদুল কাদির[৬], কবি সুফী মোতাহার হোসেন[৭], কবি ও প্রাবন্ধিক দিদারুল আলম—এঁরা সবাই খালাম্মার কাছে আসতেন। আমার খালাম্মাও কিছু কিছু লিখতেন; গল্প, উপন্যাস—এসব। এবং তখনকার দিনের *শিখা*,[৮] মাসিক *সঞ্চয়*, *সওগাত*[৯] ও *আলফারুক* এর মতো নামীদামি সব কাগজে তাঁর লেখা বের হতো। তাঁর লেখা পড়েটড়েই এসব তরুণ সাহিত্যিক খালাম্মার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উৎসাহী ছিলেন আবুল ফজল সাহেব। তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমার খালাম্মাকে দেখে তিনি এতটাই অভিভূত হয়েছিলেন যে তিনি তাঁকে 'মা' বলে ডাকতেন এবং আমার খালাম্মা যত দিন সুস্থ ছিলেন, তত দিন তিনি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। আমার খালাম্মার নাম এম ফাতেমা খানম। আসল নাম মামলুকুল ফাতেমা খানম[১০]। কিন্তু নামটা একটু বড় বলে তিনি সংক্ষেপে লিখতেন এম ফাতেমা খানম। এ নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনিও স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষকতা করার ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্যচর্চা করতেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি যখন কোনো ছেলেমেয়েকে, বিশেষ করে শিক্ষা বা সাহিত্যের ব্যাপারে আগ্রহী মুসলিম ছেলে বা মেয়েকে, কিংবা তাদের কাউকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিছু একটা করতে দেখলেই তাদের তিনি নিজের থেকে ডেকে স্নেহ করতেন, উপদেশ দিতেন এবং তাদের সঙ্গে একটা নিয়মিত যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করতেন। তখনকার দিনের যেসব তরুণ সাহিত্যিক গোষ্ঠী ছিল, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে এবং তার যাঁরা তরুণ সদস্য-সদস্যা ছিলেন, তাঁদের সবাই আমার খালাম্মাকে 'মা' বলে ডাকতেন। তাঁরা প্রতি রোববার তাঁর কাছে আসতেন। আর আবুল ফজল সাহেব আমাদের বাড়িতে আসতেন; বলতে গেলে, প্রায় প্রতিদিনই বিকেলে। চা-নাশতা খেতেন। অনেক সময় ভাতও খেয়ে হোস্টেল বা হলে ফিরতেন। তিনি আমাদের আত্মীয়ের মতোই হয়ে উঠেছিলেন। আমরাও তাঁকে 'ভাই' বলে ডাকতাম। তাঁকে বড় ভাইয়ের মতোই মনে করতাম। আমি তখন বেশ ছোট। কিন্তু আমার সেসব স্মৃতি এখনো স্পষ্ট মনে আছে। কোনো কাগজ বের হলে বা কোনো নতুন লেখা বের হলেই তাঁরা খালাম্মার কাছে সেসবের কাটিং নিয়ে আসতেন। একজন পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাটা পড়তেন। অন্যরা শুনতেন। তারপর পাঠ করা লেখাটির ওপর আলোচনা করতেন। বয়স অল্প হলেও আমিও সেখানে একজন নীরব শ্রোতা হিসেবে সব

সময় উপস্থিত থাকতাম। এভাবে আমি বাড়িতে একটা সুন্দর নির্মল সাহিত্যিক পরিবেশের ভেতর দিয়েই বেড়ে উঠেছি।

একবার খালাম্মার লেখা ছোটগল্প পড়ে বেগম রোকেয়া[১১] তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিতে তাঁর পরিচয় পেয়ে খালাম্মাকে তিনি লিখেছিলেন, 'আপনি আমার স্কুলে এসে শিক্ষকতা করেন।' বেগম রোকেয়ার অনুরোধ রাখতে ১৯৩০ সালে খালাম্মা কলকাতায় চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলে[১২] শিক্ষকতার জীবন শুরু করেন। একটা কথা বোধ হয় এখানে বলা উচিত, সেটা হচ্ছে এই যে আমার খালাম্মা তখনকার মুসলমান সমাজের ছেলেমেয়েরা, বিশেষত মেয়েরা যে যেখানেই লেখাপড়া করেছে, তাকেই তিনি চিঠি দিয়ে বা ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে উৎসাহ দিয়েছেন। আমার খালাম্মা পর্দার মধ্যেই ছিলেন। তবুও তাঁর সঙ্গে তাদের, মানে শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের একটা আন্তরিক যোগাযোগ ছিল। এ সময় যখন তিনি জানতে পারলেন যে ফজিলাতুন্নেসা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতশাস্ত্রে এমএতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছেন, তখন তিনি রীতিমতো অবাক হয়েছিলেন। সমভাবে খুশিও হয়েছিলেন এবং তখন-তখুনি এ রকমের সিদ্ধান্ত নিলেন যে মেয়েটিকে তো আমার দেখা উচিত। আবুল ফজল সাহেবের মাধ্যমে তিনি তাঁকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলেন। মিস ফজিলাতুন্নেসা যেদিন আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন, সেদিনকার কথা আমার এখনো কিছু কিছু মনে আছে। আমাদের বাড়িতে ঘোড়ার গাড়িতে চেপেই তিনি এসেছিলেন। তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন আমার বড় ভাই আর আবুল ফজল মিলে। খালাম্মা তার জন্য অনেক রকমের নাশতা, হালুয়া, মোরব্বা ইত্যাদি বানিয়েছিলেন, সেদিন তিনি ওই সব খাবার অনেক যত্ন করে ফজিলাতুন্নেসাকে খাইয়েছিলেন।

ফজিলাতুন্নেসা সেদিন আলাপ করার সময় যেসব কথা বলেছিলেন, তার সব আজ আর মনে নেই। কথাবার্তা বলার পরপরই তিনি চলে গিয়েছিলেন। যাওয়ার পর খালাম্মা বলেছিলেন, ও তো আমাদের সমাজের একটি উজ্জ্বল রত্ন। ওদের সম্মান জানানো উচিত, ভালোবাসা উচিত। ওদের আদর্শ অনুসরণ করা হলে অন্য আর সব মেয়ে এগিয়ে আসবে। দেখলে তো কত বিদ্যা! আমিও অভিভূত হয়ে দেখলাম এমন একজন নারীকে, যাঁর মাথায় লুজ পিন দিয়ে আঁটা শাড়ি। দেখতে বেশ স্মার্ট। কথাবার্তা বলে চলে গেলেন। আমারও খুব ভালো লাগল। যদিও আমার বয়স তখন খুবই কম।

ঢাকায় কামরুন্নেসা স্কুলে আমি পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছিলাম।

যা বলছিলাম, আমার খালাম্মার ছোটগল্প পড়ে বেগম রোকেয়া তাঁকে এই বলে চিঠি লিখেছিলেন যে 'আপনাকে আমার ভালো লেগেছে। আপনি কী করেন? আপনার পরিচয় জানতে চাই।' খালাম্মার চিঠির জবাবে যখন তিনি জানলেন যে,

তিনি শিক্ষকতাই করছেন, তখন তিনি তাকে তাঁর সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলে যোগ দেওয়ার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। সেই অনুসারে খালাম্মা ১৯৩০ সালে কলকাতা চলে যান। সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলে তিনি শিক্ষয়িত্রী হিসেবে যোগ দেন। এর কিছুদিন পর খালাম্মা আমাকেও কলকাতায় নিয়ে যান। ১৯৩২ সালের কথা সেটা। তিনি আমাকে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলে ভর্তি করাতেই নিয়ে যান। তখন আমি সবে সপ্তম শ্রেণিতে উঠেছি। কিন্তু খালাম্মার জেদ যে তিনি আমাকে ক্লাস নাইনে ভর্তি করাবেন। প্রথমেই আমি ভর্তি পরীক্ষায় অঙ্কে ফেল করলাম। আমার তখন কী লজ্জা! আমি বললাম, না, আমি এখানে পড়ব না। আমি তো পারব না।

খালাম্মা বললেন, মা, তোমাকে এখানেই পড়তে হবে।

অন্য শিক্ষকেরা বললেন, ও তো অঙ্কে ভীষণ কাঁচা। বাংলা-ইংরেজি চালাতে পারলেও অঙ্কে পারবে না। ওকে বরং অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি করিয়ে দিন। ও পারবে না। কিন্তু খালাম্মার জেদ। তিনি আমাকে বাড়িতে দুই মাস পড়িয়ে আবার নিয়ে গেলেন মে মাসে। এবার আমি ভর্তি পরীক্ষায় পাস করলাম। ফলে নবম শ্রেণিতেই ভর্তি হতে পারলাম। ভর্তি হওয়ার সময় আমার বেশ একটা বিপত্তি দেখা দিল। কারণ, আমি তো দুই ক্লাস ডিঙিয়ে ভর্তি হয়েছিলাম।

খালাম্মা বললেন, ও স্পেশাল বাংলা নিয়ে পড়বে। কারণ, বাংলাতে ও ভালো। তাহলে ওর সুবিধা হবে। কিন্তু বেগম রোকেয়ার স্কুলে বাংলা পড়ানোর তেমন ভালো ব্যবস্থা ছিল না। খালাম্মা তাই বললেন, তাহলে তো ওকে এখানে রাখা একটু অসুবিধা।

বেগম রোকেয়া সব শুনে বললেন, না, তা কেন হবে? ও এখানেই পড়বে। আমি ওর ব্যবস্থা করব। তিনি তখন কেবল আমার জন্য মিস কমলা নিয়োগী বলে বাংলায় স্নাতক পাস একজন মহিলা শিক্ষয়িত্রীকে নিযুক্ত করলেন। কারণ, উঁচু ক্লাসে আর কোনো মেয়ে ছিল না। সাখাওয়াৎ মেমোরিয়ালে পড়া তখন বেশির ভাগই মেয়েই ছিল উর্দুভাষিণী।

যা-ই হোক, ১৯৩২ সালের মে মাসে আমি সাখাওয়াৎ মেমোরিয়ালে ভর্তি হলাম। বেগম রোকেয়াকে তখন আমি প্রায় প্রতিদিনই দেখতাম। কারণ, প্রতিদিন আমাদের যে প্রার্থনা সভা হতো, তিনি তাতে যোগ দিতেন এবং প্রার্থনা-সংগীতের সূচনা তিনিই প্রথম করতেন। ইকবালের লেখা একটা গজল দিয়ে প্রার্থনা-সংগীত গাওয়া হতো। তাঁর সঙ্গে আমরাও যোগ দিতাম। গলা মেলাতাম। তাঁর সেই চেহারা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। তাঁকে আমরা তখন আমাদের একমাত্র আদর্শ বলেই ভাবতাম। তিনি আসামাত্রই মনে হতো যেন দেবীর আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে আমরাও খুব ধ্যানমগ্নভাবে প্রার্থনা-সংগীতটা

গাইতাম। এভাবেই চলছিল সবকিছু। কিছুদিন পর অর্থাৎ ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর আকস্মিকভাবেই তিনি মারা যান। সকালে ড্রাইভার এসে আমাদের খবর দিল যে বড়ি ওস্তাননি বি আর নাই। আমরা সবাই তাঁকে বড়ি ওস্তাননি বলতাম। বড়ি ওস্তাননি মানে বেগম রোকেয়া।

খবরটা শোনামাত্র আমরা ছুটলাম স্কুলের দিকে। গিয়ে দেখলাম তাঁর মরদেহ বিছানায় শোয়ানো। চারদিকে কোরআন শরিফ পড়া হচ্ছে। আমার খালাম্মাও একটা কোনায় কোরআন শরিফ নিয়ে বসে পড়লেন। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। সেই শোকাবহ দৃশ্যের কথা আজও আমার থেকে থেকেই মনে হয়। বেগম রোকেয়ার আত্মীয়স্বজনে (স্কুলের তেতলায় তিনি থাকতেন) তেতলার বারান্দাঘর তখন গিজগিজ করছে। একসময় তাঁকে কবর দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হলো। মনে হলো যেন আমাদের স্কুলের পুরো ভবনটাই অন্ধকারে ছেয়ে গেল। এ স্কুল থেকেই ১৯৩৪ সালে আমি প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করি।

আমার খালাম্মার উচ্চশিক্ষার দিকে অসম্ভব ঝোঁক ছিল। নিজের জীবনে তিনি যে আশা পূরণ করতে পারেননি, তিনি চেয়েছিলেন আমার জীবনের ভেতর দিয়ে সেটা দেখতে। আমার খালাম্মাও বাড়িতে লেখাপড়া করেছেন। প্রবীণ বয়সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, তোমাকে আমি কলেজে ভর্তি করাব। কিন্তু আমার বাবা তাতে তেমন সায় দেননি। আমার বাবা তখন পাটনাতে চাকরি করতেন। মাঝেমধ্যে আমাকে এসে দেখে যেতেন। বাবা যখন দেখলেন খালাম্মার আপত্তি নেই এবং কলেজে পড়ার ব্যাপারে আমারও আগ্রহ প্রবল, তখন তিনি খালাম্মাকে লক্ষ করে বললেন, বেশ তো, মেয়ে আপনার। আপনি যা করবেন, তা-ই হবে। কাজেই আমি বেথুন কলেজে[১৩] ভর্তি হয়ে গেলাম। এখান থেকেই আমি প্রথম বিভাগে আইএ পাস করি। পরে পাস করি বিএ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাকে বেথুনে ভর্তি করিয়ে দেওয়ার পরপরই খালাম্মা অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমি যখন ওখান থেকে আইএ এবং বিএ পাস করি, তখন আমার সমসাময়িক কালে আর কোনো মুসলিম নারী পড়াশোনা করতেন কি না এবং যখন আমি বিএ পাস করে বের হই, তখন আমার মতো আর কেউ শিক্ষকতা করতেন কি না, বাংলাদেশে, বলতে গেলে সারা বাংলাদেশে, এ রকম কোনো মুসলিম নারীর নাম আমি শুনেছিলাম কি না, কিংবা তাঁদের সঙ্গে আমি পরিচিত হয়েছিলাম কি না, এ রকম একটা প্রশ্ন উঠতে পারে এবং তার জবাবে আমি বলব যে হ্যাঁ, ছিল। সে প্রসঙ্গেই এবার একটু কথা বলা যেতে পারে।

আমি যখন বেথুনে আইএ প্রথম বর্ষে ভর্তি হই, তখন সেখানে দু-একজন মুসলিম নারী ছিলেন। আমার সঙ্গেই ভর্তি হয়েছিলেন। নাম সুরতুন্নেসা। তিনি এখনো জীবিত আছেন। তিনিও শিক্ষকতা করছেন। আর আমার ওপরে অর্থাৎ

বিএ ক্লাসে পড়তেন মিসেস রাবেয়া আলী ও মিসেস আখতার ইমাম[১৪]। মিসেস রাবেয়া আলী এখন বেঁচে নেই। মিসেস ইমাম এখনো বেঁচে আছেন। তাঁরা আমার সিনিয়র। তাঁরা এই বেথুন কলেজেরই ছাত্রী। আর আমার সঙ্গে আরেকজন নারী বিএ পাস করেছিলেন—তিনি মিসেস জামশেদুন্নেসা, তিনিও এখন বেঁচে নেই। পরবর্তীকালে তিনি আমার স্কুলে আমার অধীনে চাকরিও করেছেন এবং শিক্ষিকা হিসেবে অবসর গ্রহণ করার পর তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। সারা বাংলাদেশে, মানে পশ্চিম বাংলা আর পূর্ব বাংলা অর্থাৎ যুক্ত বাংলা মিলিয়ে তখন বছরে বড়জোর দুটি কি তিনটি মুসলমান বাঙালি মেয়ে ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে ঢুকত। কাজেই আমরা যে কটি মেয়ে তখন ছিলাম বা তখন পড়াশোনা করতাম, আমরা আমাদের নামে সবার কাছেই মোটামুটিভাবে পরিচিত ছিলাম। কারণ, মুসলমান মেয়েদের মধ্যে তখন লেখাপড়া করা, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা লাভ করা একটা দুরূহ ব্যাপার ছিল। খুব কম পরিবারই তখন এতখানি উদারতা দেখাতে পেরেছে, মেয়েকে স্কুল থেকে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানোর দুঃসাহস দেখাতে পেরেছে। আমার বেলায় একটা সুবিধা ছিল যে আমার নানি, খালাম্মা—সবাই লেখাপড়া জানতেন। তাঁরা পর্দার ভেতরে থাকলেও বাড়িতে তাঁদের পড়াশোনার ব্যবস্থা ছিল। আমার নানিকে ইংরেজি এবং ক্রুশ কাঠিতে উলের বোনাবুনির কাজ শেখানোর জন্য আমার নানা একজন ইংরেজ মিশনারি নারীকে নিযুক্ত করেছিলেন। আমার খালাম্মা নিজের চেষ্টায় ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তাই তাঁদের তরফ থেকে আমার শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে কোনো ধরনের বাধা আসেনি।

১৯৩৮ সালে আমি যখন বিএ পরীক্ষা দেব, তখনই আমার বিয়ে ঠিক হয় এবং বিএ পরীক্ষার দিন কয়েক আগেই আমার বিয়ে হয়ে যায়। যে পরিবারে আমার বিয়ে হয়, তাঁরাও ছিলেন খুবই উদারপন্থী, শিক্ষিত ও সাহিত্যমনা। কাজেই আমি যে পারিবারিক পরিবেশ থেকে এসেছিলাম, সেই একই ধরনের পারিবারিক পরিবেশে আবার আমার ঠাঁই হলো। অর্থাৎ একটা অনুকূল পরিবেশেই আবার আমার ঠাঁই হলো। আমি আমার খালাম্মার কাছ থেকে যে ধরনের ভালোবাসা, শিক্ষা গ্রহণের যে সুযোগ পেয়েছি, শ্বশুরবাড়িতে এসেও সে ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বাধার সৃষ্টি হলো না। কারণ, আমার স্বামী সাহিত্যিক ছিলেন এবং তার বোন অর্থাৎ আমার ননদ—তিনিও ছিলেন উচ্চশিক্ষিতা ও সাহিত্যিক। তাঁরা দুজনেই 'বাহার' ও 'নাহার' নামে বাংলাদেশে সুপরিচিত। আমার স্বামী প্রধানত সাহিত্যচর্চা, সমাজসেবা, খেলাধুলা এবং কিছুটা রাজনীতিও করতেন। বিয়ের পর থেকে আমি সামাজিক কাজকর্ম বা সমাজসেবার কাজে জড়িয়ে গেলাম। আমার খালাম্মা সামাজিক কাজকর্ম করেছেন ঢাকায় বসে। মেয়েদের জন্য বস্তিতে বস্তিতে স্কুল খুলেছিলেন। চালু করেছিলেন সেলাই শিক্ষাকেন্দ্র। এসব কাজ তিনি করে

গিয়েছেন। বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম'-এরও সদস্য ছিলেন তিনি। এখানে এসে আমি আরও বৃহত্তর এক পরিবেশের বাসিন্দা হয়ে গেলাম। আমার স্বামী বলতেন, যারা লেখাপড়া শিখেছে, তারাই তো এসব কাজে এগিয়ে আসবে। কারণ, আমাদের সমাজের মেয়েরা এখনো অনেক পিছিয়ে আছে, এখনো অনেক বাধার মধ্যে আছে। তারা তো রীতিমতো বন্দী জীবন যাপন করছে। কাজেই সংসারে থেকেও তোমাদের এসব কাজের দায়িত্ব নিতে হবে। আমার স্বামীর নাম মোহাম্মদ হবীবুল্লা বাহার চৌধুরী[১৫] আর তাঁর ছোট বোনের নাম বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ[১৬]। তাঁরা দুজনই একযোগে সাহিত্যসাধনা করেছেন। করেছেন নানাভাবে সমাজসেবামূলক কাজ। তাঁরা দুজন মুসলমান জাতি, বিশেষ করে বাঙালি মুসলমান জাতি কীভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে, সাহিত্যক্ষেত্রে, শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিজের যোগ্য আসনটি লাভ করবে, নিরন্তর সামনে এগিয়ে যাবে—চিরকালই চালিয়ে গেছেন সেই চেষ্টা। এই পরিবেশে এসে আমিও তাঁদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম। বিয়ের অল্প দিন পরেই বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' অর্থাৎ 'নিখিল বঙ্গ মুসলমান মহিলা সমিতি'র সেক্রেটারি অর্থাৎ সম্পাদক করা হয় আমাকে। এটি তিনি গঠন করেছিলেন ১৯১৬ সালে। এই সমিতির কাজ ছিল মেয়েদের উন্নতির ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালানো। তখন আমার বয়স খুবই কম। বউ হিসেবে তখনো আমার লজ্জা ভাঙেনি। কিন্তু এ দায়িত্ব আমাকে নিতেই হলো। নিতে হলো আমার স্বামীর আগ্রহে। যা-ই হোক, এ সমিতির সেক্রেটারি হওয়ার পর আমাকে মাসে মাসে সভা ডাকতে হতো। সদস্যদের কাছ থেকে প্রতি মাসের চাঁদা আদায় করতে হতো।

আমাদের সমিতির একজন পিয়ন ছিল। চাঁদার খাতায় সদস্যদের নাম লিখে দিতাম। জনে জনে গিয়ে সে চাঁদা সংগ্রহ করত। আর আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলামের তরফ থেকে দুটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল চালানো হতো তখন। একটা ছিল বেগ বাগান রোডে, আরেকটা গোঁড়া চাঁদ লেনে। সপ্তাহে তিন দিন তিন দিন করে ছয় দিন দুই স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হতো। এভাবে আমি সমিতির কাজ চালিয়ে যেতে লাগলাম। নিয়মিত আমাকে স্কুল পরিদর্শন করতে হতো। করতে হতো অন্য কাজকর্মও।

এ সময় আমি হঠাৎ করেই ডিপিআই অফিস থেকে একটা চিঠি পেলাম। সেই চিঠিতে আমাকে জানানো হয়েছে যে আমি বিএ পাস করার ফলে ৩০ টাকা বৃত্তি পেয়েছি। একই চিঠিতে আমি কোথায় পড়েছি, আমাকে সে কথাও জানাতে বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, তখন আমার বিয়ে হয়ে গেছে। আমি তখন আর লেখাপড়া করছি না। কিন্তু যখন আমি জানলাম যে আমার দুই বছরের স্কলারশিপ, তখন আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। রীতিমতো কান্নাকাটি করতে শুরু করে দিলাম।

আমার তো আর এমএ পড়া হলো না। তখন পাক্কা একটা বছর চলে গেছে। আমার স্বামী আমার অবস্থা দেখে বললেন, ঠিক আছে আরও তো একটা বছর আছে। এই এক বছর তুমি স্কলারশিপটা পাবে। এক কাজ করো, তুমি বি-টি পড়ো। এক বছরের স্কলারশিপটাও পাবে। তোমার একটা ডিগ্রি পাওয়াও হবে। সেই অনুসারে আমি ১৯৩৯ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজে ব্যাচেলর অব টিচার্স ট্রেনিংয়ের ক্লাসে যোগ দিলাম এবং সেখান থেকে আমি ১৯৪০ সালে প্রথম বিভাগে পাস করি।

ওদিকে আমার সমিতির কাজও চলছে। এদিকে আমার একটা মেয়ে হলো ১৯৪০ সালে। এ সময় হঠাৎ করেই আমি সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল থেকে এই মর্মে একটা চিঠি পেলাম যে আপনাকে শিক্ষকতার পদে যোগ দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। আমি তো অবাক। বললাম, আমি ওখানে কিছুতেই পড়াতে পারব না। ও স্কুল থেকে মাত্র কয়েক বছর আগে আমি পাস করে বের হয়েছি। আমার ভারি লজ্জা করবে।

তখন আমার স্বামী বললেন, দেখ, এটা তো তোমার চাকরি না। তুমি যা কিছু শিখেছ, যে বিদ্যা তুমি আয়ত্ত করেছ, সেটাকে কাজে লাগানো। আসলে স্কুলে মুসলমান শিক্ষক নেই। ওখানে সব হিন্দু আর খ্রিষ্টান শিক্ষক। অথচ স্কুলটা মুসলমান মেয়েদের জন্য। ওটা প্রতিষ্ঠা করেছেন বেগম রোকেয়ার মতো মহীয়সী নারী। কাজেই তোমরা যারা লেখাপড়া শিখেছ, তোমাদের মতো মেয়েদেরই তো সেখানে সাহায্য করতে যাওয়া উচিত। পয়সাটাই তো বড় কথা নয়। কাজ কতখানি করতে পারবে, আসল কথা সেটা। সেও তো একধরনের সমাজসেবা। আমার স্বামীর অনুরোধে আমি ওখানে যাই।

তখন এডিপিআই ছিলেন বদিউর রহমান সাহেব, মানে খান বাহাদুর বদিউর রহমান। তিনি আমার নানা শ্বশুরের বিশেষ প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন যে বউমা, আপনি আসুন। কেন আপনি আপনার আহৃত বিদ্যার অপচয় করবেন? আমরা তো কোনো মেয়ে পাচ্ছি না। কোনো মুসলিম শিক্ষয়িত্রী পাচ্ছি না। যা পাই, তাও অবাঙালি। ১৯৪১ সালের কথা সেটা।

অবশেষে ওই স্কুলে আমি সহকারী প্রধান শিক্ষিকার পদে যোগ দিলাম। ওই পদে আমি বেশ কিছুদিন কাজ করার পর ভারত ভাগের ডামাডোল শুরু হয়ে যায়। আনুষ্ঠানিকভাবে দেশ ভাগের অল্প দিন আগে আমি ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার পদে উন্নীত হই। এভাবে আমার সংসারজীবনের সঙ্গে আমার শিক্ষকতা জীবনও যুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু আমরা এর পাশাপাশি সমাজসেবামূলক কাজ যতটা পেরেছি, করেছি। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত আমি আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলামেরও সম্পাদক ছিলাম।

আমি স্কুলে যোগ দেওয়ার পর আস্তে আস্তে আরও জনাকয়েক বাঙালি শিক্ষয়িত্রী যোগ দিলেন এবং বাঙালি মুসলমান ছাত্রীর সংখ্যাও বাড়তে লাগল। শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন খ্রিষ্টান এবং অবাঙালি মুসলিম ও অবাঙালি হিন্দু। আমাদের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন তখন মিসেস আসিয়া হাসান। তিনি বদলি হয়ে যান, তাঁর জায়গায় আসেন মিস মাধুরী মং গাইন বলে একজন খ্রিষ্টান নারী। তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন।

তিনি যথেষ্ট যোগ্যও ছিলেন। এ সময় যেসব ছাত্রীকে আমরা পড়িয়েছি, তাদের মধ্যে দু-চারজন এখনো এখানে আছে। যেমন : কুলসুম হুদা, ড. হুদার স্ত্রী। তিনি এই স্কুলেরই ছাত্রী ছিলেন। ছিলেন অভিনেতা মোহাম্মদ জাকারিয়ার স্ত্রী তাহমিনা বানু। বর্তমানে তিনি মতিঝিল হাইস্কুলের শিক্ষিকা। এরা সবাই আমার ছাত্রী। তা ছাড়া রোকসানা রেজা বলে একজন ছাত্রী ছিল আমার। সে এ দেশের প্রথম বৈমানিক। আমার আরও অনেক ছাত্রী ছিল, যাদের অনেকেই এখন বাংলাদেশে বহাল তবিয়তে আছে। ব্যারিস্টার কামাল হোসেনের স্ত্রী হামিদা হোসাইন এবং ব্যারিস্টার মোস্তফা কামালের স্ত্রী হোসনে আরা বেগমও আমার ছাত্রী।

আগেই বলেছি, আমার স্বামী হবীবুল্লাহ বাহার সাহিত্যচর্চা করতেন, খেলাধুলা করতেন। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারেও অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। বলতে গেলে তখনকার তরুণ মুসলিম সমাজের তিনি পুরোধাপুরুষ ছিলেন। তখনকার দিনের তরুণ সব সাহিত্যিক, যেমন : আহসান হাবীব[১৭], ফররুখ আহমদ[১৮], শওকত ওসমান[১৯] ও কবি আবুল হোসেন[২০]—এঁদের সবাই আমার স্বামীকে মধ্যমণি করেই তাঁদের লেখালেখি চালাচ্ছিলেন। বাহার সাহেব ছাড়া তাঁদের চলত না। দিন-রাতের বেশির ভাগ সময় তাঁরা তাঁর সঙ্গেই কাটাতেন কোনো বিষয় নিয়ে তর্ক করে, আলোচনা করে। তাঁকেই আদর্শ পুরুষ হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন তাঁরা। আমার স্বামীর সঙ্গে নজরুল ইসলামের[২১] যোগাযোগ ছিল অনেক আগে থেকেই। তিনি যখন চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র ছিলেন, ১৯২৮ সাল কি ১৯২৯ সালের কথা সেটা, আমার ঠিক মনে নেই। আমার তখন বিয়েও হয়নি, আমি তখন খুবই ছোট, পরে আমার স্বামীর কাছ থেকে আমি শুনেছি যে নজরুলকে তিনি দুবার আমন্ত্রণ করে চট্টগ্রাম নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা তখন চট্টগ্রামে থাকতেন। তাঁদের বাড়ির নাম ছিল 'আজিজ মঞ্জিল'। আমার নানাশ্বশুর খান বাহাদুর আবদুল আজিজ সাহেবের বাড়ি। তিনি একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক ছিলেন। তাঁর নামে চট্টগ্রামে অনেক প্রতিষ্ঠান আছে। তিনি নিজেও কিছু প্রতিষ্ঠান করে গেছেন—'মোহামেডান এডুকেশন সোসাইটি', 'ভিক্টোরিয়া ইসলাম হোস্টেল' ইত্যাদি। তাঁর সেই বাড়িতেই নজরুলকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। নজরুল সেখানে এক মাস ছিলেন। চট্টগ্রাম শহরের ছাত্র থেকে শুরু করে সব গুণী শিল্পী-সাহিত্যিক

সব সময় তাঁকে মৌমাছির মতো ঘিরে রাখতেন। নানান জায়গায়, এমনকি সীতাকুণ্ডের পাহাড়ে পর্যন্ত বেড়াতে নিয়ে যেতেন। রাতের বেলা নজরুল এসে বাড়িতে বসতেন। খাওয়াদাওয়ার পর তাঁকে এক ডিবা পান, হাতে একটা খাতা আর একটা কলম ধরিয়ে দেওয়া হতো। আমার নানাশ্বশুরের সেই বাড়িতে সামনের যে ঘরটা ছিল, তাতেই নজরুলকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। তিনি সেখানেই থাকতেন। সারা রাত ধরে তিনি লিখতেন। সকাল হলে আমার ননদ এবং আমার স্বামী তাঁর সেই লেখার পাতাগুলো জড়ো করতেন। এভাবে ওখানে বসে তিনি যেসব কবিতা লিখেছিলেন, সেগুলো পরবর্তীকালে তিনি *সিন্ধুহিন্দোল* নাম দিয়ে বই আকারে প্রকাশ করেন এবং তা উৎসর্গ করেন আমার স্বামী বাহার এবং ননদ নাহারের নামে।

উৎসর্গপত্রে নজরুল লিখেছিলেন, 'আমার এই লেখাগুলি বাহার ও নাহারকে দিলাম।' এর পরেই লিখেছিলেন এই কবিতাটি 'কে তোমাদের ভালো?/ 'বাহার' আনো গুল্‌শানে গুল্, 'নাহার' আনো আলো।/ 'বাহার' এলে মাটির রসে ভিজিয়ে সবুজ প্রাণ,/ 'নাহার' এলে রাত্রি চিরে জ্যোতির অভিযান।/ তোমরা দুটি ফুলের দুলাল, আলোর দুলালী,/ একটি বোঁটায় ফুটলি এসে,—নয়ন ভুলালি!/ নামে নাগাল পাইনে তোদের নাগাল পেল বাণী,/ তোদের মাঝে আকাশ ধরা করছে কানাকানি!'

বইটা উৎসর্গ করার তারিখ ছিল ১৯২৬ সালের ৩১ জুলাই। উৎসর্গপত্রের আগের পৃষ্ঠায় 'বাহার' ও 'নাহার'কে উদ্দেশ করে আরও দুটি কবিতার পঙ্‌ক্তি ছিল। পঙ্‌ক্তি দুটি ছিল এ রকম : 'আলোর মতো জ্বলে ওঠো। ঊষার মতো ফোটো!/ তিমির চিরে জ্যোতির মতো প্রকাশ হয়ে ওঠো।'

আরেকটা কবিতা লেখা হয়েছিল এ বাড়িতে বসেই। বাড়িটায় ছিল এক সারি নারকেলগাছ। সেগুলো ছায়া ফেলেছিল নজরুলের মনে। বিখ্যাত সেই কবিতার নাম 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি'। তিনি যেদিন চলে আসবেন, তার আগের দিন রাতে এ কবিতাটি তিনি লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি কলকাতায় এসে বই ছাপিয়ে তাঁদের পাঠান। এবং তাঁরা যখন দেখলেন যে তাঁদের দুই ভাইবোনের নামেই কবি বইটা উৎসর্গ করেছেন, তখন তাঁদের সে কী প্রচণ্ড উল্লাস আর আনন্দ! আমার স্বামী আর আমার ননদের কাছে শুনেছি যে তাঁরা ভাবতেই পারেননি যে তাঁদের মতো সামান্য ছাত্রছাত্রীদের তিনি এত বড় উপহার দিতে পারেন! তাঁরা সেদিন ধন্য হয়ে গিয়েছিলেন। নজরুল ইসলামকে পরে আমি দেখেছি। তাঁর অসুস্থ হওয়ার আগেও তাঁকে দেখেছি। আমার ননদের বাড়িতে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি সাহিত্যসভা হয়েছিল। ওটা ছিল ঈদ রিইউনিয়ন বা ঈদ পুনর্মিলনীর মতো একটা অনুষ্ঠান। হয়েছিল ডিসেম্বর মাসে। আমার ননদ তখন থাকতেন কলকাতার শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের কোয়ার্টারে। তাঁর স্বামী ডা. মাহমুদ

সেখানে ডাক্তার ছিলেন। সেদিনই নজরুলকে আমি সুস্থ অবস্থায় শেষবারের মতো দেখেছিলাম। তার আগে অবশ্য কয়েকবারই তাঁকে দেখেছি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির[২২] সভায় বক্তৃতা দিতে এবং তাঁর সেই বিখ্যাত কবিতার বিখ্যাত সেই লাইনগুলো 'প্রেম ঘনসুন্দর, রসঘন সুন্দর, আনন্দঘন সুন্দরের সান্নিধ্য আমি চাই'—আমার কানে আজও বাজে। কবিতাটি পাঠ করেছিলেন তিনি ১৯৩৯ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির এক অধিবেশনে। তাঁকে আমি সুস্থ অবস্থায় শেষবারের মতো দেখেছিলাম ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে ওই শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিটে অবস্থিত হাসপাতালের কোয়ার্টারে আমার ননদের বাড়িতেই। সেদিন তাঁর কথা কেমন জানি জড়িয়ে জড়িয়ে আসছিল। তখনো কিছুটা সুস্থ ছিলেন। কিন্তু হাবেভাবে বোঝা যাচ্ছিল তাঁর ভেতরে কোনো একধরনের অনুভূতি কাজ করছে। তিনি সবাইকে চিনছেন। সবাইকে আদর করছেন। সবার সঙ্গে কথা বলছেন। কিন্তু তবুও তাঁর আগের সেই প্রাণোচ্ছলতা যেন আর নেই। যে নজরুল হইহই করে ছাদ-ফাটানো হাসি হাসতেন ক্রমে সেটা মিলিয়ে যেতে লাগল। তখন থেকেই একটু একটু করে ব্যাপারটা অনুভব করতে পারছিলাম। তারপর ১৯৪২ সালে তিনি তো পুরোপুরিই অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

যা-ই হোক, বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, তিনি তাঁর ভাইয়ের উৎসাহে লেখাপড়া শিখেছিলেন এবং সমাজসেবার কাজে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। রোকেয়ার মৃত্যুর পর তিনি আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলামের সেক্রেটারি ছিলেন বছর কয়েক। পরবর্তীকালে তিনি অন্যান্য সমিতিতে যোগ দেন। তার মধ্যে প্রধান ছিল 'অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স', কলকাতা শাখা। এ সংগঠনের তিনি সেক্রেটারি ছিলেন। পরে তিনি স্থায়ী কমিটির সদস্য হয়েছিলেন। এ সমিতি ছিল ভারত বিখ্যাত একটা সংগঠন। আমার বিয়ের পর তিনি আমাকেও এ সমিতির নির্বাহী কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং আমি এ সমিতির সাধারণ সভ্য হিসেবে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কাজ করেছি। এ সমিতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মিসেস বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, মিসেস সরোজিনী নাইডু[২৩], মিসেস অরুণা আসিফ আলী প্রমুখ। কলকাতায় এ সমিতির খুব সম্ভব সেক্রেটারি কি প্রেসিডেন্ট ছিলেন এস সি মুখার্জি আইসিএসের সহধর্মিণী। তাঁর মেয়ে মিসেস রেণুকা রায়, মিসেস জি এল মেহেতা, লেডি রানু মুখার্জির মতো নারীরাও ওই সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। আমার বিয়ের পর আমিও প্রথমবার ওই সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলাম। ড. বিধানচন্দ্র রায়, মি. জি এল মেহতা, মিসেস বি এম সেন এবং মিসেস এস সি মুখার্জির বাড়িতে এই সমিতির সভা বসত পালা করে। আমরা সেখানে যোগ দিতাম। সেক্রেটারি হিসেবে আমার ননদের অনেক বেশি দায়িত্ব ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইঝি মিসেস ইন্দিরা দেবী

চৌধুরাণীও এই সমিতির সভ্য ছিলেন। ২ নম্বর ডাম্প অ্যাভিনিউতে তাঁর যে বাড়ি ছিল, আমরা সেখানেও গিয়েছি। সেখানে আমরা শ্রী প্রমথ চৌধুরীকেও দেখেছি। আমার ননদকে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী খুবই স্নেহ করতেন। এভাবে তখনকার দিনের কলকাতা শহরের যে 'জুয়েল ক্রিম অব দ্য সোসাইটি' অর্থাৎ তখনকার সমাজের শিরোমণিস্বরূপ এবং শিক্ষার আলোয় আলোকিত যেসব হিন্দু পরিবার ছিল, তাদের সঙ্গেও আমাদের একটা যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তাদের ওখানে আমাদের আসা-যাওয়া ছিল এবং আমার ননদের সঙ্গে আমিও সেসব জায়গায় অনেকবার গিয়েছি। সামান্য কিছু কাজও করেছি। কিন্তু বেশির ভাগ গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমার ননদ শামসুন্নাহার মাহমুদই সম্পন্ন করেছেন। এ জন্য অনেক সময় তাঁকে অনেক প্রতিনিধিদলের সদস্য হয়ে অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্সের অন্যান্য প্রদেশে যেসব শাখা গড়ে উঠেছিল, সেসবের সম্মেলন ইত্যাদিতে যোগ দেওয়ার জন্য নানান জায়গায় যেতে হয়েছে। বোম্বেতে ওই সমিতির যেসব শাখা ছিল, সেগুলোর সম্মেলনেও তিনি নিয়মিত যোগ দিয়েছেন। এ ছাড়া ডেলিগেশন কমিটিরও তিনি সদস্য ছিলেন। আরও অনেক সভা-সমিতির সদস্য ছিলেন তিনি। সব কটির নাম আজ এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না।

আমরা যখন কলকাতায় ছিলাম, তখন সমাজসেবার কাজে মেয়েরা খুব কমই জড়িত ছিল, বিশেষত মুসলমান বাঙালি মেয়েরা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শামসুন্নাহার মাহমুদই অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি অনেক সভা-সমিতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা করেছেন, সাহিত্য সমালোচনা লিখেছেন। সাহিত্যসভায় ভাষণ দিয়েছেন। এমনকি তাঁকে একবার ১৯৪০ সাল কি ১৯৪১ সালে, না ১৯৪০ সালেই রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অল্প কিছুকাল আগে শান্তিনিকেতন থেকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। সেখানে গিয়েও তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন।

তখনকার দিনে কলকাতা শহরে আর কোনো মুসলমান মেয়েকে আমি এসব কাজে, মানে সভা-সমিতি বা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকতে দেখিনি। আমি ও আমার ননদ পুরুষদের সভা-সমিতিতেও যেতাম। মানে যুক্ত সভা-সমিতিতে যোগ দিয়েছি। এসব সভা-সমাবেশ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির উদ্যোগেই হয়েছে। পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির উদ্যোগেও হয়েছে। বঙ্গীয় মুসলমান মহিলা সমিতি অর্থাৎ বেগম রোকেয়ার প্রতিষ্ঠিত যে প্রতিষ্ঠান, সেই আঞ্জুমানের উদ্যোগেও সভা-সমিতির আয়োজন করা হয়েছে এবং গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে যেসব সাংস্কৃতিক ও নাট্যানুষ্ঠান হতো, সেসবেও আমরা যেতাম। আর অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স অর্থাৎ নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের কলকাতা শাখার সেসব সভা-সমিতি হতো, সেখানে তো আমরা দুজন যেতামই। এসব জায়গায় আমি আমাদের পরিচিত বা অপরিচিত কোনো মুসলিম নারীকে যোগ

দিতে দেখিনি। অন্য কোনোভাবেও তাদের সম্পৃক্ত হতে দেখিনি। তবে আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলামে যেসব নারী ছিলেন, তাঁরা আঞ্জুমানের সভা-সমিতিতে এসেছেন। সেখানে অবশ্য আমি বেগম সুফিয়া কামাল বা বেগম মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকাকে কোনো দিন দেখিনি। বেগম মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় দেশ ভাগের পর ঢাকায় এসে। তবে বেগম সুফিয়া কামালকে আমি চিনতাম। পার্ক সার্কাসের যে বাড়িটায় তিনি থাকতেন, সেই বাড়িতে আমি আমার ননদের সঙ্গে দু-একবার গিয়েছি। তাঁর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং তাঁর লেখা তখনকার দিনের *সওগাত* ও *মোহাম্মদী*[১৪] মতো কাগজে বের হতো। দেশ ভাগের মাত্র অল্প কিছুদিন আগে নাসিরউদ্দীন সাহেবের মেয়ে নূরজাহান বেগম একটা পত্রিকা করেছিলেন। নাম ছিল *বেগম*[১৫]। সেখানেও তিনি আর আমার ননদ লিখতেন। তাঁদের আগে দু-একজন মহিলা হয়তো লিখে থাকতে পারেন, তবে তাঁদের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় কখনো হয়নি।

আগেই বলেছি, দেশ ভাগের একেবারে আগেভাগে মাত্র অল্প কয়েক দিনের জন্য আমি কলকাতা সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার পদে উন্নীত হয়েছিলাম। পরে সেখান থেকে আমাকে ময়মনসিংহের বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকার পদে বদলি করা হয়। সেখানে যোগ দেওয়ার পর আমি দেখলাম যে দেশে কিছুই নেই। সবাই চলে গেছে। স্কুলে শিক্ষক নেই, ছাত্রী নেই এবং সেখানকার হিন্দুপ্রধান এলাকার লোকজন বলতে লাগলেন যে এই মুসলমানেরা আবার কী দেশ চালাবে, কেমন করে স্কুল চালাবে? এ স্কুল আর চলবে না। যে স্কুলের কাজ এতকাল মিসেস বক্সী চালিয়েছেন, সেই স্কুল মুসলমানেরা চালাবে কী করে?

এসব দেখেশুনে আমার মনে একটা জেদ চেপে বসল। নিজেকেই বললাম, কেন আমরা পারব না?

এ অবস্থায় আমি সেখানকার ডিসির (জনাব আসগর) সঙ্গে কথা বলে স্থানীয় যত নারী পেলাম, রাস্তাঘাটে, এমনকি সিনেমা দেখতে গিয়ে সিনেমা হলে যাঁদের পেলাম, তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন কলকাতার লেডি ব্রাবোর্ন কলেজের ছাত্রী, সবাই আমার পরিচিত, তাঁদের ডেকে ডেকে স্কুলে যোগ দেওয়ালাম। তখন ডিপিআই অফিস ছিল চট্টগ্রামে। ড. কুদরাত-এ-খুদা সাহেব ছিলেন ডিপিআই। তাঁকে টেলিফোন করে এ ঘটনা জানালে তিনি বললেন, হ্যাঁ, আপনি যাকে পান, তাকেই নিয়োগপত্র দিয়ে দিন। এভাবে ১৬ জন শিক্ষককে নিয়োগ দিয়ে স্কুল চালু রাখলাম। স্কুলের মেয়েদের খেলাধুলা আর শরীরচর্চা শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাকিস্তান উইমেন্স ন্যাশনাল গার্ড ও গার্লস গাইডের শাখা ইত্যাদি খোলা হলো। ফলে স্কুলের এক্সট্রা কারিকুলামগত তৎপরতা খুব ভালোভাবে চলতে লাগল। তখন

সবারই মনে দেশ গড়ার একটা জোশ এল। প্রত্যেকেরই তখন এক ভাবনা: প্রাণের চেয়েও মান বড়। কেন আমরা পারব না? ওরা আমাদের কেন ছোট বলবে? এভাবে স্কুলটা অল্প দিনের মধ্যেই বেশ ভালো হয়ে গেল এবং স্কুলের শিক্ষিকাদের সবাই যোগ দেওয়ার ফলে পড়াশোনার কাজও পুরোদমে চালু হয়ে গেল। আস্তে আস্তে অনেক ছাত্রীও এসে গেল। হিন্দু শিক্ষিকারা দেশ ছেড়ে যাওয়ার ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, সেই ঘাটতিটা আস্তে আস্তে পূরণ হয়ে গেল।

আমি ময়মনসিংহে থাকার সময়ই 'মণিমেলা'র একটা সম্মেলন হয়। সেই সুবাদে কলকাতার প্রখ্যাত সাহিত্যিক বিমল ঘোষকে (মৌমাছি) এখানে নিয়ে আসা হলো। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাতে যোগ দিয়েছিলেন। এসবই ১৯৪৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসের কথা। ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত 'মণিমেলা'র সেই অনুষ্ঠানে আমাকে একটি শাখার প্রধান হিসেবে বক্তৃতা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। আমার দেওয়া সেই ভাষণে আমি বললাম দেশ সম্পর্কে, সাহিত্য সম্পর্কে এবং দেশভাগের ফলে যে পরিস্থিতির মুখে আমরা পড়েছি, বললাম সে সম্পর্কেও। সবাই আমার ভাষণের খুব প্রশংসা করে বললেন, হ্যাঁ, খুবই সময়োপযোগী ভাষণ। ভালো বলেছেন। এভাবে তখনকার স্থানীয় হিন্দুদের সঙ্গেও আমার একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠল।

ময়মনসিংহে দেড় বছর চাকরি করার পর আমাকে ওখান থেকে ঢাকার কামরুন্নেসা স্কুলে বদলি করা হলো। কামরুন্নেসা স্কুল মানে তখন ইডেন কলেজ যে ভবনে ছিল, তার ভবনটি। সরকার ওটাকে সচিবালয়ের ভবনে পরিণত করায় তাকে সরকারি দপ্তরের কাজের জন্য নিয়ে যাওয়ায় কামরুন্নেসা স্কুল এবং কলেজ, ইডেন স্কুল এবং কলেজের জায়গার অভাব দেখা দিল। ফলে স্কুল ও কলেজকে ভাগাভাগি করে (আগেই সম্ভবত বলেছি ঢাকার কামরুন্নেসা স্কুল একটা প্রাইভেট স্কুল ছিল) সেই স্কুলে ইডেন স্কুলকে ঢোকানো হলো এবং ইডেন কলেজকে বকশীবাজারের আরেকটা স্কুলে স্থানান্তর করা হলো। কামরুন্নেসা স্কুলের তখন খুবই শোচনীয় অবস্থা। শিক্ষয়িত্রীদের সবাই ভারতে চলে গেছেন। স্কুলবাড়ি আর টেবিল-বেঞ্চ ছাড়া আর কিছুই ছিল না সেখানে। তখন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন একজন ইংরেজ মহিলা। মিসেস উইলস বলে তাঁকে ডাকা হতো। আসলে তিনি ছিলেন সহকারী স্কুল পরিদর্শক। দেশভাগজনিত পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাঁকেই এই স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। স্কুলের যখন খুব দুরবস্থা, পড়াশোনার অসুবিধা, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর শূন্যতা, তখন আমাকে ময়মনসিংহের বিদ্যাময়ী স্কুল থেকে এখানে বদলি করে আনা হলো। এখানে আসার পর আমি দেখলাম মেয়েরা শুধু মিটিং-মিছিল করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় যেসব ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে তাদের মিছিল করে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে

গিয়ে তারা 'সরকার নিপাত যাক', 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই' ইত্যাদি নানা ধরনের স্লোগান দেয়। এ সবকিছু করে করে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অভিভাবকেরা এসে আমাদের কাছে কেবল অভিযোগ করেন তাদের মেয়েদের লেখাপড়া ঠিকমতো হচ্ছে না বলে। এ ছাড়া স্কুলের চারপাশে কোনো দেয়াল বা প্রাচীর ছিল না। স্কুলে কোনো নিয়মকানুনও ছিল না, যা ছিল, তাও কেউ মানত না। ভালো শিক্ষয়িত্রীও ছিল না। এ সবকিছু দেখেটেখে আমি ডিপিআই সাহেবকে বলে অনতিবিলম্বে চারদিকে দেয়াল দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। ১২টি বাথরুম করলাম। করলাম নতুন নতুন শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যবস্থাও। তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন আমার পূর্বপরিচিত। সবাই কলকাতার লেডি ব্রাবোর্ন কলেজ থেকে পাস করা ছাত্রী। তাঁদের যখন আমি নিয়োগ দিচ্ছি, তখন তাঁদের কেউ কেউ ঘরের বউ। কলকাতা থেকে ঢাকায় এসেছেন তাঁরা তাঁদের পিতা বা স্বামীদের হাত ধরে। বলতে গেলে তাঁদের ধরে ধরে এনে এখানে শিক্ষকতার কাজে যোগ দেওয়ানো হলো। এভাবে আমাদের স্কুলটা অল্প দিনের মধ্যে বেশ গুছিয়ে উঠল। কামরুন্নেসায় আমি ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত প্রধান শিক্ষিকার পদেই ছিলাম। এই সময়ের মধ্যে নতুন করে গড়ে ওঠা স্কুলগুলোর মধ্যে কামরুন্নেসা স্কুলই ছিল প্রথম স্কুল, যেটা খেলাধুলার ব্যাপারে, সংস্কৃতিচর্চার ব্যাপারে, পাশাপাশি পড়াশোনার ব্যাপারেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছে। ১৯৪৯ সালে এ স্কুলের একজন মেয়ে বোর্ডে স্ট্যান্ড করার ফলে স্কুলের খুব সুনাম হয়। অচিরকালের মধ্যে স্কুলে ছাত্রীর সংখ্যা ১ হাজার ৩০০ হয়ে যায়। একই প্রধান শিক্ষিকার অধীনে উর্দু বিভাগও শুরু করা হয়। এখানে ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৪০০। আমি যখন স্কুল ছাড়ি, তখন বাংলা বিভাগে ছিল ১ হাজার ৪০০ মেয়ে। আর উর্দু বিভাগে ছিল প্রায় ৪০০ মেয়ে। পরে আমাকে ডিপিআই অফিসে স্পেশাল অফিসার উইমেন পদে নিয়োগ করা হয়। ওখানে পাঁচ বছর কাজ করি আমি।

কামরুন্নেসা প্রধান শিক্ষিকা থাকার সময়ই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ব্যাপারটা ছিল সারা দেশের। একদম গোড়া থেকেই সবাইকে এ আন্দোলন নাড়া দেয়। আমাদেরও নাড়া দিয়েছে। তখন এমন কেউ ছিল না, বিশেষ করে মায়ের জাত, যাঁদের ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন নাড়া দেয়নি। ছাত্র হত্যার মতো অমন হৃদয়বিদারক ঘটনার কথা শুনে সবাই কেঁদেছেন। ওই সময় আমার স্বামী হবীবুল্লাহ বাহার খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। কারণ, এ ঘটনার মুখে তিনি খুবই মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। তিনি চিরকালই ছাত্রসমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাদের নিয়ে খেলাধুলা করা, তাদের নিয়ে সভা-সমিতি করা, তাদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি করেই তাঁর জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে। যখন তিনি জানলেন যে ছাত্রদের ওপর এ রকম একটা দুর্যোগ নেমে এসেছে,

তখন তিনি বললেন, 'আমার আর ওদের সঙ্গে থাকা চলবে না।' উনি মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নুরুল আমিন সাহেব বললেন, না, আমরা তো এখন আগুনের কুণ্ডের ওপরে বসে আছি। আপনি এখন মন্ত্রিত্ব ছেড়ে যেতে পারবেন না। মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিতে না পারার দুঃখটা তাঁকে তিল তিলে কষ্ট দিয়েছে। এটাই ছিল তাঁর মানসিক যন্ত্রণার মূল কারণ। এর ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

আগেই বলেছি, আমার স্বামী তখন মন্ত্রিসভার সদস্য। তিনি তখন প্রাদেশিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন। স্বাস্থ্য এবং শাসনবিষয়ক বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি ছাত্রদের মিছিলে গুলিবর্ষণের এ ঘটনায় খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন। মন থেকে এ রকম একটি ঘটনাকে সমর্থন করতে পারছিলেন না। তিনি মানসিকভাবে এতটাই যন্ত্রণা পেয়েছিলেন যে এর ফলে তাঁর রক্তচাপ বেড়ে যায়। এর পরপরই তিনি এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়েন, যেটা আমাদের পরিবারের জন্য একটা সাংঘাতিক দুর্যোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের পরিবারের জীবনের গতিপথটাই ঘুরে যায়। ব্যাপারটা ঘটে ১৯৫৩ সালে। ওই সময় তাঁর স্ট্রোক হয়। সেই স্ট্রোকের ফলে তিনি কাজকর্ম করার জন্য যে দৈহিক সামর্থ্যের প্রয়োজন, সেটা আর ফিরে পাননি। তাঁর মধ্যে যে উদারতা, যে প্রাণচাঞ্চল্য, যে কর্মক্ষমতা ছিল, যে শক্তি ছিল, শাসনগত ব্যাপারে তাঁর যে সাহস ছিল, সেটা আর অবশিষ্ট থাকে না।

এ সময় 'আপওয়া' বলে একটা সমিতি হয়, যার পুরো নাম 'অল পাকিস্তান উইমেন্স এডুকেশন'। এটা তখনকার পাকিস্তান সরকারের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান সাহেবের স্ত্রী বেগম রানা লিয়াকত আলী খান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (এ নামই ছিল তখন বাংলাদেশের) সশরীরে এসেই তিনি গড়ে তুলেছিলেন এই সমিতি। আমাকে, আমার ননদকে এবং আরও দুজন নারীসহ মোট চারজনকে সদ্য গঠন করা ওই সমিতির সহসভাপতি করা হয়েছিল। আমি ছিলাম সাংস্কৃতিক উপকমিটির এবং আমার ননদ ছিলেন শিক্ষাসংক্রান্ত উপকমিটির দায়িত্বে। সাংস্কৃতিক উপকমিটি করলে কী হবে, তখন তো আর এখানে মেয়েদের পক্ষে নাচ-গান বা কোনো ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার ঘটনা ছিল দুঃস্বপ্নের মতো একটা ব্যাপার। কারণ, তখনকার মেয়েরা এসবের কিছুই জানত না। বাঙালি মুসলমান মেয়েরা না জানত গান, না জানত নাচ বা অন্য কিছু। বড়জোর কিছু কিছু সাহিত্যচর্চা করত তারা। তবে সাহিত্য যাঁরা করতেন, তাঁদেরও তখন হাঁটি পা-পা দশা। সবে তাদের প্রতিভার স্ফুরণ ঘটতে শুরু করেছে। এই পরিবেশ পরিস্থিতিতে আমি তখন একটা গানের স্কুল করলাম কামরুন্নেসাতে। সেটা সম্ভবত ১৯৫০ সালের দিকে। আমার ঠিক মনে নেই। তবে ১১ মে তারিখে যে সেটা করা হয়েছিল, সেই তারিখটা মনে আছে। সালটার কথা ঠিক মনে করতে পারছি না।

যা-ই হোক, গানের স্কুল তো করলাম, কিন্তু মেয়েদের গান শেখাবে কে? শিক্ষকতার দায়িত্ব কে নেবে? জয়শ্রী সেন বলে আমার এক ছাত্রী ছিল। ১৯৫০ সালে সেও ভারতে চলে গেল। ফলে আর কোনো ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা যাচ্ছিল না। হয়তো বলা হলো একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করো; কিন্তু কাদের নিয়ে করব? এ অবস্থায় আমার দুই মামাতো বোন ছিল, তারা কলকাতা থেকে ঢাকায় এল। তাদের একজনের নাম মেহের এবং অন্যজনের নাম জিনাত। তারা নাচ-গান জানত। তা ছাড়া আমার মেয়ে সেলিনা বাহার[২৬] কিছুটা নাচতে শিখল। এদের ছাড়া তখন অন্য আর কেউ ছিল না। আরেকটি মেয়ে ছিল, সে জলতরঙ্গ বাজাত। তার নাম ছিল পুষ্প। ঢাকাই মেয়ে। তখন আমি একটা স্কুল করলাম। স্কুলের নাম দিলাম 'সুরবিতান'। কিন্তু গানের এই স্কুলের শিক্ষয়িত্রী কোথায় পাব? তখন রেডিওর ডাইরেক্টর ছিলেন ক্যাপ্টেন এহসানুল হক। আমি এই বলে তাঁকে একটা চিঠি দিলাম যে আপনাদের যাঁরা স্টাফ আর্টিস্ট, তাঁদের আমার গানের স্কুলের জন্য ধার দিন। তাঁদের অবসর সময়ে তাঁরা দুই ঘণ্টা করে সপ্তাহে দুদিন এখানে শিক্ষকতা করবেন। তাঁরা কাজটা করবেন ছুটির দিনে অর্থাৎ শুক্রবার এবং রোববার সকালে। এহসানুল হক সাহেব বললেন, ঠিক আছে। তাঁদের কাজের ব্যাঘাত না হলে আমার কোনো আপত্তি নেই।

এভাবে আবদুল আহাদ সাহেব আমাদের গানের স্কুলে রবীন্দ্রসংগীত শেখানোর দায়িত্ব নিলেন। খাদেম হোসেন খান এলেন সেতার শেখাতে। আবদুল লতিফ এলেন লোকসংগীত বা পল্লিগীতি শেখাতে। লায়লা আর্জুমান্দ বানুকে অনুরোধ করতেই তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে এলেন। তারপর এলেন গওহর জামিল। তিনি নাচ শেখানোর দায়িত্ব নিলেন। সুরুজ মিয়া বলে একজন ছিলেন, তিনি এলেন গিটার শেখাতে। দেখতে দেখতে আমার খোলা গানের স্কুল 'সুরবিতান'-এ ছাত্রীসংখ্যা বাড়তে লাগল। একটু বয়সী মেয়ে থেকে শুরু করে কিশোর-কিশোরী মিলিয়ে তখন অনেক ছাত্রছাত্রী। সুরবিতানের ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই পরে ঢাকা বেতারের শিল্পী হিসেবে বেশ পরিচিতি লাভ করেছিল। পাক্কা সাত বছর চলেছিল স্কুলটা। ১৯৫৫ সালে আমি যখন বদলি হয়ে যাই, তখন মিসেস রাবেয়া আলী আসেন প্রধান শিক্ষিকা হয়ে। তিনি আমার গানের স্কুলের ব্যাপারে আপত্তি করেন। বললেন, স্কুলের কাজকর্মের পাশাপাশি একটা বাড়তি কাজের দায়িত্ব নেওয়া তাঁর পক্ষে পোষাবে না। তিনি আমাকে বললেন, তুমি যদি তোমার এই গানের স্কুল রাখতে চাও, তাহলে এটাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও। কিন্তু আমি তখন স্থানাভাবে স্কুলটা আর চালাতে পারলাম না। ফলে ১৯৫৫ সালেই সেটা বন্ধ হয়ে গেল। সেদিনের একটা প্রতিষ্ঠিত সংগঠন, যেখানে নাচ-গানে পারদর্শী ছাত্রছাত্রী তৈরি হচ্ছিল, বন্ধ হয়ে গেল বলে আমার মর্মে একটা দুঃখ থেকে গিয়েছিল।

১৯৫৪ সালে এ দেশের বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরীর মৃত্যু হয়। তাঁর স্মৃতি রক্ষা করার জন্য কিছু করা যায় কি না, এ নিয়ে তখনকার দিনের সাহিত্যিক ও শিল্পীসমাজ ভাবনাচিন্তা শুরু করে। তখন আমিও তাদের সঙ্গে ছিলাম। ১৯৫৫ সালে আমরা বুলবুল ললিতকলা একাডেমি করার উদ্যোগ নিই। শুরুতে এ উপলক্ষে একটা সমিতির মতো গঠন করা হয়। এ উদ্যোগের ফলে অচিরকালের মধ্যে বুলবুল একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি তার আজীবন সদস্য হই। কোষাধ্যক্ষের পদে যোগ দিয়ে তার জন্য কাজ করতে থাকি।

আমি 'সুরবিতান' নাম দিয়ে যে নাচ-গানের স্কুল করেছিলাম, সেটা ছিল ছোট আকারের। সবই সেখানে শেখানো হতো—নাচ, গান, রবীন্দ্র-নজরুলসংগীত, উচ্চাঙ্গসংগীত, সেতার, গিটার ও এসরাজ। বুলবুল একাডেমি যখন করা হলো, তখন সুরবিতানের অনুসরণেই সবকিছু করা হলো। তবে আরও বড় আকারে। যাবতীয় পরিকল্পনা ছিল আমারই করা। বুলবুল একাডেমির তখনকার কার্যকরী কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন বিচারপতি ইব্রাহিম। তাঁদের সবাই আমার করা পরিকল্পনাটা গ্রহণ করে নিলেন। এ সময় আফরোজা বুলবুল মানে বুলবুল চৌধুরীর স্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করে এখানে আনা হলো। তাঁকে বলা হলো, আমরা এখানে একটা একাডেমি অর্থাৎ সংগীতশিক্ষার প্রতিষ্ঠান করতে চাই। তাঁকে অধ্যক্ষ করা হবে। কিন্তু তিনি তাতে আপত্তি জানিয়ে বললেন, না, আমি নাচের দল করব। বুলবুল চৌধুরীর রচনা করা যেসব নৃত্যনাট্য আছে, সেগুলো আমরা এখান থেকে বা আমার নিজের যেসব শিল্পী আছে, গ্রুপ আছে, তাদের নিয়ে আমরা সেগুলো মঞ্চস্থ করব। দেশে-বিদেশে সেগুলো দেখিয়ে আমরা পয়সা কামাই করব। এভাবে আয় করা টাকা থেকে আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনের ব্যবস্থাও করব ইত্যাদি ইত্যাদি। তবুও আফরোজাকে আমরা বললাম, তা তো হবেই, কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েদের তো গানবাজনা শেখার মতো কোনো জায়গা নেই। আমরা চাই যে তাদের গানবাজনা শিক্ষার একটা প্রতিষ্ঠান হোক, যেখানে তারা একটা কোর্স করে ডিপ্লোমা নেবে। তাতে করে তারা একটা কিছু করে খেতেও পারবে এবং অন্যদেরও তারা শেখাতে পারবে। কিন্তু তিনি আমাদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে করাচি চলে গেলেন।

তবে আমরা দমলাম না। আমরা বুলবুল একাডেমি[২৭] চালিয়ে যেতে লাগলাম। পরবর্তীকালে বুলবুল একাডেমির যে সুনাম এবং তার যে প্রতিষ্ঠা, সে সম্পর্কে আপনারা সবাই জানেন।

যা-ই হোক, ডিপিআই অফিসে আমি পাঁচ থেকে ছয় পর্যন্ত ছিলাম স্পেশাল অফিসার উইমেন এডুকেশন পদে। ১৯৬০ সালে আমার এই পদের পাশাপাশি আরও কতগুলো পদ বিলুপ্ত করা হয়। তখন আমাকে আবার বাংলা বাজার স্কুলে

প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদে বদলি করা হয়। ওখানে গিয়ে দেখলাম তার ভয়ানক দুরবস্থা। স্কুলটার ভবন নেই, পর্যাপ্তসংখ্যক ঘর নেই, বাথরুম নেই, বাস নেই। এসব নতুন করে করার জন্য আমি লেখালেখি শুরু করলাম। অল্প দিনের মধ্যেই আমি জমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থা করলাম। পরিকল্পনা পাস করালাম। এসব করতে গিয়ে বেশ সময় লাগল। স্কুলের পুরোনো ভবন ভেঙে নতুন ভবন করার পরিকল্পনা পাস করা হলো। সরকারের তরফ থেকে টাকাও মঞ্জুর করা হলো। এমন সময় আবার আমাকে বদলি করা হলো। এর পরপরই শুরু হয়ে গেল দেশে মুক্তিযুদ্ধ। অর্থাৎ এসে গেল ১৯৭১ সাল। আমি দেখলাম যে এ রকম তালগোল পাকানো পরিস্থিতির মধ্যে আমার স্কুলে যেতে অসুবিধা হবে। আমি বেশ দূরে থাকি, নতুন শহরে। ফলে অনেক ভেবেচিন্তে আমি পেনশন নিতে চাইলাম। আমাকে ডিপিআই সাহেব বললেন, আপনার তো আরও কিছুকাল চাকরি আছে। আপনি কেন পেনশন নেবেন?

এর মধ্যে আমার স্বামী হবীবুল্লা বাহারের মৃত্যু হলো। ১৯৬৬ সালে তিনি মারা গেলেন। তাঁর নামে আমি একটা কলেজ করলাম। কলেজটা আমার এবং আমাদের পরিবারের একক প্রচেষ্টায় হয়েছে। আমার যা টাকাপয়সা ছিল, জিনিসপত্র ছিল, সবকিছু বিক্রি করে দিয়েছিলাম। আমি একটু আগেভাগে অবসর নিয়েছিলাম এ কারণে যে তাহলে পেনশনের টাকাটাও ওই কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজে লাগাতে পারব। এভাবে আমি ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে একটা কলেজ প্রতিষ্ঠা করলাম। শান্তিনগর এলাকায় 'হবীবুল্লাহ বাহার কলেজ' নামে একটা কলেজ হলো। এ কলেজের পেছনে আমার যা কিছু সঞ্চয় ছিল, তার সবই আমি দিয়েছি। আমার ছেলেমেয়েরাও এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছে। আমি আর কোথাও কারও কাছ থেকে এ ব্যাপারে কোনো রকম সহযোগিতা কামনা করিনি। বর্তমানে কলেজটা ভালোই চলছে। সেখানে এখন আড়াই হাজার ছাত্রছাত্রী। কলেজের বাড়িটাও আমরা সরকারের কাছ থেকে পেয়েছি এবং বাড়িটা পেতে আমি ১০ বছর লাগাতার সংগ্রাম করেছি। করেছি আর্থিক সংগ্রাম। প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম। এমনকি পাড়া-পড়শিদের সঙ্গেও আমাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। নানা ধরনের দলাদলি তো ছিলই। কলেজের লোকজন পর্যন্ত দলাদলি করেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির নাম পর্যন্ত মুছে দিতে চেয়েছে। প্রশ্ন তুলেছে, আমরা কে, আমরা কিছুই করিনি। এ কলেজ অন্যরা করেছে। এ রকমের একটা ধারণা তারা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে কলেজের ভেতরে এবং বাইরে। নানা রকম বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে আমাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। আজ বছর কয়েক থেকে কলেজ বেশ ভালোভাবেই চলছে এবং আমিও খুব শান্তিতে আছি।

আবার একটু পেছনে ফিরে যাই। ব্রিটিশ আমলে আমরা যখন লেখাপড়া শুরু করেছিলাম, তখন বাংলাদেশের কয়টা মুসলমান পরিবারে শিক্ষা ছিল, সে কথা

বোধ হয় আঙুল গুনেই বলে দেওয়া যেত। পরবর্তীকালে আমরা যখন পাসটাস করে বের হলাম, তখনো প্রায় একই অবস্থা। কারণ, বাঙালি মুসলমান সমাজে তখনো শিক্ষার প্রচণ্ড অভাব। সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলে বাঙালি মুসলমান শিক্ষকই জুটত না। অবাঙালি খ্রিষ্টান বা হিন্দু শিক্ষক দিয়ে চালানো হতো স্কুলটা। তারপর যখন লেডি ব্রাবোর্ন কলেজ হলো, তখন বাঙালি মুসলমান মেয়েদের মধ্যে বেশ সাড়া পড়ে গেল। দেখতে দেখতে বেশ কিছু মেয়ে সেখান থেকে পাস করে বের হলো। দেশ ভাগের পর আমাদের মধ্যে দারুণ একটা জোশ আর উৎসাহ-উদ্দীপনা এসে গেল। আমরা এই বলে শপথ গ্রহণ করলাম যে আমরা আমাদের দেশকে সুন্দর করে গড়ে তুলব, উন্নত করব, তার ভালো করব এবং আমাদের মধ্যে যে ক্ষমতা, যে শক্তি আর যে সুপ্ত প্রতিভা আছে, তার সাহায্যেই আমরা এই সবকিছু করব। কারও কাছে আমরা মাথা নত করব না। ছোট হব না। এই ভাবটা, আমার মনে হয় তখন মেয়েদের মধ্যেই খুব বেশি করে দেখা গিয়েছে। সত্যি বলতে কী, মেয়েদের মধ্যেই উন্নতিটা বেশি করে লক্ষ করা যাচ্ছিল। মেয়েদের যে উন্নতি, সেটা তখন খুব দ্রুতগতিতে হয় এবং আস্তে আস্তে মেয়েরা সমাজসেবার কাজে, সাহিত্যসেবার কাজে, সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির দিকে, লেখাপড়ার দিকে, চাকরির দিকে তারা বেশি বেশি করে ঝুঁকে পড়তে থাকে। এর ফলে ওই সময় শিক্ষক, অধ্যাপক, প্রভাষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং স্থপতিও আমাদের দেশে তৈরি হতে শুরু করে। কাজেই আমি তো বলব, সব দিক থেকে চিন্তা করলে দেখা যায়, মেয়েদের অগ্রগতিটাই তখন প্রধান ছিল এবং সেটা খুব দ্রুতই হচ্ছিল।

তারপর যখন বাংলাদেশ হলো, তখন তো মেয়েরা আরও বেশি বেশি করে উন্নতি করতে শুরু করে। আর এখন তো তারা আরও অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে, বিশেষ করে সরকার তাদের চাকরিতে ঢোকার ক্ষেত্রে অনেক বেশি সুযোগ দিয়েছে। কাজেই তারা অগ্রগতি লাভ করেছে। তা ছাড়া এখন মেয়েদের জন্য চাকরি করা একটা আবশ্যিক ব্যাপার হয়ে গেছে। কারণ, অর্থনৈতিক সমস্যা সমাজে এখন প্রবল। মাত্র একজনের চাকরিতে এখন আর সংসার চলে না। সে কারণেই যার যতটুকু বিদ্যা আছে, তা নিয়েই তারা এখন একটা কিছু করার চেষ্টা করছে। সেটা স্কুলেই হোক, কলেজেই হোক বা অন্য যেকোনো খানেই হোক। একটা কিছু উপার্জনের দিকে নজর না দিয়ে তাদের আর চলছে না। এভাবেই মেয়েরা অনেক অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আমাদের দেশে এখন আর মেয়ে ডাক্তার, মেয়ে ব্যারিস্টার, মেয়ে ইঞ্জিনিয়ার বা মেয়ে স্থপতির কোনো অভাব নেই। এর থেকেই মনে হয়, অন্তত আমার কাছে, বেগম রোকেয়া জাগরণের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, যে জাগরণের কথা শুনে আমরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম, আমাদের প্রথম জীবনে আমরা সেই জাগরণের অভাব দেখেছি। যে বাধা আমাদের মোকাবিলা

করতে হয়েছে, সে ধরনের বাধাবিপত্তি এখন আর নেই। সুযোগ-সুবিধা অনেক অনেক গুণ বেড়েছে এবং মেয়েরা সেই সুযোগটাকে পুরোপুরি গ্রহণ করে সমাজে তারা পুরুষের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে না। পুরুষদের সহযোগিতা করার কাজে তারা এখন সমতালে এগিয়ে আসছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানেও মেয়েরা প্রচুর পরিমাণে কাজ করছে এবং তারা যে খুব খারাপ করছে, সে কথাও কেউ বলতে পারবে না। একটা জাতির জন্য এটা খুবই আশার কথা।

আসলে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের ফলে মেয়েদের এবং মায়েদের মনে সৃষ্ট চাঞ্চল্য থেকেই সবাই সচেতন হতে থাকে। রাজনৈতিক সচেতনতা বোধ হয় তখন থেকেই মেয়েদের মধ্যে জাগতে থাকে। পরবর্তীকালে মেয়েদের মধ্যেও অনেকে সংসদ সদস্য হন। তাঁরা রাজনীতিতেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। আসলে এ সবকিছুর শুরু বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকেই। তারপর ১৯৬৭-৬৮ সালেও দেশে যেসব আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু হয়, তারই পরিণামে শুরু হয়ে যায় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। তাতে মেয়েদের অনেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশ নিয়েছে। তাদের সংখ্যাটা নেহাত মন্দ নয় এবং তাদের বেশির ভাগই শিক্ষিত সমাজের মেয়ে। মনে রাখা দরকার, একটা সমাজের চলমানতা কেবল পুরুষদের দিয়ে সম্ভব নয়। মেয়েদের সাহায্যের অবশ্য দরকার। কারণ, তারা আমাদের ডান বা বাম হাত। দুটো হাতেরই তো সাহায্যের প্রয়োজন। একটা হাত তো সবকিছু করতে পারে না। ফলে মেয়েরা যে যেভাবে পেরেছে মহান মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। কেউ পয়সা দিয়ে, কেউ বুদ্ধি দিয়ে, কেউ সেবা দিয়ে, কেউ দূরে থেকে কিংবা কেউ খবরাখবর দিয়ে, কেউ বিদ্যা দিয়ে—যে যেভাবে পেরেছে, সেভাবেই সাহায্য করেছে। সেটা যত নগন্যই হোক, ফেলনা নয়। তারা সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছে। তারপর দেশ স্বাধীন হলো। স্বাধীন হওয়ার পরও মেয়েরা বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাদের অধিকার সম্পর্কে, তাদের দাবিদাওয়া সম্পর্কে তারা আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি সচেতন। এখন তারা তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে প্রচুর আন্দোলন চালাচ্ছে, ব্যাপারটা কিন্তু লক্ষ করার বিষয়।

এই যে এখন যেসব নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে, তাদের যেভাবে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে, সেসব তারা আগের মতো আর নীরবে সহ্য করছে না। তারা আন্দোলন চালাচ্ছে এবং তাদের দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য তারা প্রচুর পরিশ্রমও করছে। আমি মনে করি, তারা তাদের দাবিদাওয়া আদায় করতে পারবে। এগুলো কেউ তো কাউকে হাতে তুলে দেয় না। নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের ক্ষমতার বলে করায়ত্ত করতে হয়। মেয়েরা বুঝতে পেরেছে যে একটা সমাজে পুরুষের মতো মেয়েদেরও মর্যাদা আছে। সম-অধিকার আছে। বিশেষ করে আমাদের মুসলমান

সমাজে আমাদের মেয়েদের অনেক অধিকার। তাদের সুযোগ-সুবিধার কথা ধর্মের বিধানেই লিপিবদ্ধ করা আছে।

আমাদের মুসলমান সমাজের তো তেমন কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু যেহেতু আমরা এত দিন অন্ধ ছিলাম এবং পুরুষশাসিত সমাজে আমাদের অন্ধ করে রাখা হয়েছিল, ফলে আমরা আমাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ছিলাম না। আমাদের মেয়েরা আজকে অনেক বেশি সজাগ। আজকে তারা নিজেদের অধিকার, নিজেদের দাবিদাওয়া, নিজেদের প্রাপ্য আদায় করার জন্য আন্দোলন করে যাচ্ছে এবং ইতিমধ্যে তারা অনেক কিছু আদায়ও করে ফেলেছে। আমি মনে করি, অদূর ভবিষ্যতে মেয়েরা অনেক বেশি সম্মান, আরও অনেক বেশি গৌরব, আরও অনেক বেশি মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হবে।

বস্তুত, আমি আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখলাম যে মেয়েরা ধাপে ধাপে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আগে স্কুলে ভর্তি করার জন্য মেয়েদের কুড়িয়ে আনতে হতো, জোগাড় করে আনতে হতো, আর এখন স্কুল-কলেজে তাদের জায়গা দেওয়া যায় না। আমার স্কুলের দাইয়ের নাতনিরাও বিএ পাস করেছে। তারা আমার কাছে এসে দোয়া চেয়ে যায়। এর চেয়ে আনন্দের কথা, ভাগ্যের কথা আর কী হতে পারে! তবে আমাদের সমাজে মেয়েদের সব সময়ই দায়িত্ব অনেক বেশি। মেয়েদের দায়িত্ব ঘরে তো বটেই, বাইরেও কিছুটা আছে। কারণ, মেয়েরা হচ্ছে মায়ের জাত। একটা সমাজে পুরুষদের গড়ে তোলার দায়িত্ব মায়েদের। সেই মা যদি আদর্শমতী না হন, তাহলে তাঁর সন্তানও আদর্শবান হতে পারে না। এখন একটা কথা এখানে আমি বলছি, যদিও কথাটা একটু অপ্রিয় শোনাবে, তবুও বলছি। আমরা স্বাধীন হয়েছি, আমাদের সুশিক্ষা পাওয়ার অধিকারও অবারিত, সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার দরজাও খোলা, ইতিমধ্যে কিছু অধিকারও আমরা পেয়েছি। কিন্তু তাই বলে আমাদের তো উচ্ছৃঙ্খল হলে চলবে না। সমাজের কিছু অংশে যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যাচ্ছে, সেটা ছেলেদের মধ্যে তো আছেই, মেয়েদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে। এটা বন্ধ হওয়া উচিত। কারণ, এর পরিণাম খারাপ হতে বাধ্য। যারাই এ রকম করছে, তারা বুঝতে পারছে না, তারা সাময়িকতার মোহে, উত্তেজনার একটা মোহে এ রকম কিছু করছে।

কিন্তু মেয়েদের কাছে আমার অনুরোধ, তাদের কাছে আমি এই আবেদন রাখছি যে তারা যেন চোখ-কান খুলে ভাবতে চেষ্টা করে যে তারা মায়ের জাত। তারা সবার আদর্শ। ধর্মই বলে যে বেহেস্তের পরেই মায়ের স্থান। আগে বেহেস্ত, তারপরই মা। সেই মা যদি আদর্শমতী না হন, সেই মা যদি আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে না পারেন, সেই মায়ের জাতের অংশভুক্ত মেয়েরা যদি নম্র, ভদ্র আর সুন্দর ও শিক্ষিত না হন, তা হলে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা কী করে কমবে? তাঁদের সন্তানদের

তাঁরাই তো মানুষ করবেন। এ জন্য তাঁদের নিজেদের আগে আদর্শমতী হতে হবে। আমি সবার কথা বলছি না, কিছুসংখ্যকের কথা বলছি, যা দেখলে আমাদের দুঃখ হয়, কষ্ট হয়। কেন তারা বিপথে যাবে? কেন তারা সাজগোজ আর বিলাসব্যসনে ডুবে থাকবে? আমাদের জীবনে সবচেয়ে বড় জিনিসই তো হচ্ছে আমাদের দেশকে ভালোবাসা, সন্তানকে ভালো করে মানুষ করা, পৃথিবীতে একটা শ্রেষ্ঠ দেশ হিসেবে, জাতি হিসেবে একটা গৌরবময় স্থান লাভ করা। সেই আদর্শকে সামনে রেখে আমরা যদি এগিয়ে যাই, তাহলে বিশেষ করে যাঁরা মা, ভবিষ্যতে যাঁরা মা হবেন, তাঁরা কখনোই ছোট হতে পারবেন না। সেই কথা মনে রাখলে তাঁরা নিশ্চয়ই ভালো পথে, সু-আদর্শের পথে থাকবেন এবং অন্যকে একইভাবে প্রেরণা দেবেন, সন্তানকে উদ্বুদ্ধ করবেন। তবেই না আমরা একটা সুন্দর জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে পারব।

এই বয়সে এসে আমি ভাবি, আমাদের সময়ে মেয়েদের মধ্যে একটা নম্রতা ছিল। তাদের মধ্যে একটা সাদাসিধা ভাব ছিল। বর্তমানে সমাজের মেয়েদের মধ্যে উগ্রতা বেশি। অস্থিরতাও মাত্রাছাড়া। ওপরি চাকচিক্যের আধিক্য। মেয়েদের মধ্যে এ সবকিছু তখনকার দিনে ছিল না। তখন মেয়েরা তো এমনিতেই লতার মতো নরম ছিল। আর যারা লেখাপড়া শিখত, তারাও জীবনে একটা আদর্শকে সামনে রেখেই এগিয়েছে। সে আদর্শের উৎস হতে পারে তাদের বাড়ির কোনো মুরব্বি বা কোনো শিক্ষক বা সমাজের কোনো ব্যক্তিবিশেষ। প্রেরণার উৎস হতে পারে সমাজের নেতৃস্থানীয় আদর্শবান কোনো ব্যক্তি অথবা বইয়ে পড়া কোনো আদর্শ চরিত্র। আমি বেগম রোকেয়ার আদর্শকে গ্রহণ করেছি। আর আমার সামনে ছিলেন আমার খালাম্মা, যিনি আমার জীবনের প্রথম আদর্শ। এখনকার মেয়েদের মধ্যে, মানে আমাদের যুব ও তরুণসমাজের মধ্যে আদর্শের প্রতি আনুগত্য বা নিষ্ঠার ব্যাপারটা একেবারেই কমে গেছে।

কাজেই এ সবকিছুর পরিণতি যে খুব ভালো হবে, সে কথা বলা যায় না। আর আমাদের মধ্যে যে অস্থিরতা এসেছে, যে চাঞ্চল্য এসেছে, তার অপনোদন দরকার। সমাজে একটা প্রশান্তি ও সুস্থিরতা আসা প্রয়োজন। কারণ, সুস্থিরতা ছাড়া কোনো বড় কাজ হয় না। সৃষ্টির কোনো কাজ হয় না। কোনো কিছু সৃষ্টি করতে হলে ভালো করে মনোনিবেশ করতে হবে। সমাজকে যদি ভালো করে সৃষ্টি করতে হয়, সুন্দর করতে হয়, সমাজ থেকে সব গ্লানি আর কালিমা যদি দূর করতে হয়, তাহলে আমাদের ধীরস্থিরভাবে ভেবে দেখতে হবে যে আমরা কোন পথে যাচ্ছি? কোন পথে আমাদের যাওয়া উচিত? এ কথা বোধ হয় আমাদের নারীসমাজকেই প্রথম ভেবে দেখতে হবে। কারণ, প্রধানত নারীসমাজের হাতেই জাতির চরিত্র গঠনের ভার থাকে। সে কারণে মায়েদের কাছে, মেয়েদের কাছে, ছাত্রীসমাজের কাছে

আমার অনুরোধ, লেখাপড়া শিখে উচ্ছৃঙ্খল হওয়াটা বড় কথা নয়। চাকচিক্যটা জীবনের সবচেয়ে বড় কথা নয়। জীবনে গৌরব এবং শান্তি আনতে হলে তাকে ভালোভাবে চলতে হবে। নম্র হতে হবে। নত হতে হবে। আদর্শবাদী হতে হবে। কর্তব্য পালনের ব্যাপারে অবিচল হতে হবে।

টীকা

১. জন্ম ১৯১৯ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি। নানার নাম রইসউদ্দিন আহমেদ।

২. মা কানিজ ফাতেমা খানম আর বারা আব্দুল হক খান।

৩. এম ফাতেমা খানম। মুক্তবুদ্ধি, সমাজসচেতন, বিদ্যানুরাগী ফাতেমা প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা না পেলেও যথেষ্ট লেখাপড়া করতেন। অনোয়ারা বাহার চৌধুরীকে সংস্কৃতিমনা, মুক্ত চেতনা এবং বিদ্যানুরাগী করে গড়ে তোলার পেছনে ফাতেমা খানমের অবদান অপরিসীম।

৪. লীলা রায়ের জন্ম (১৯০০-১৯৭০) সিলেটে। কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে গোল মেডেল পেয়ে বিএ পাস করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ। ১৯২১ সালে বাংলায় বন্যা হলে তিনি সুভাষ বোসের সঙ্গে দেখা করে নারী কমিটি গঠন করে বন্যা আক্রান্ত এলাকায় রিলিফের কাজ করেন। তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ১৯৩১ সালে সর্বপ্রথম তিনি জয়শ্রী নামে নারীদের জন্য সম্পূর্ণ নারীদের লেখা নিয়ে একটি পত্রিকা ঢাকা থেকে প্রকাশ করেন।

৫. আবুল ফজলের জন্ম (১৯০৩-১৯৮৩) সাতকানিয়া উপজেলা, চট্টগ্রাম জেলায়। তিনি প্রখ্যাত কথাশিল্পী, লেখক ও সাহিত্যিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাস করেন। ১৯৪০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এমএ ডিগ্রি নেন। ইমাম হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯৭৩-১৯৭৫ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পাকিস্তানি স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে প্রায় সব বুদ্ধিজীবী ও বুদ্ধিজীবী সমাজের আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তিনি *শিখা* পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন।

৬. আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪) বাংলাদেশি কবি। কবি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি নেন। শিক্ষকতা করেন। *মাহে নও* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর বইয়ের মধ্যে দিলরুবা, উত্তর বসন্ত, চন্দসমীক্ষণ উল্লেখযোগ্য।

৭. সুফী মোতাহার হোসেন (১৯০৭-১৯৭৫) ফরিদপুর জেলার ভবানন্দপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পাসের পর ফরিদপুরের জেলা জজ কোর্টে দুই বছর কাজ করেন। এরপর তিনি ঈশান ইনস্টিটিউটে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় যেমন *মোহাম্মদ*, *সওগাত*, *আজাদে* লেখালেখি করতেন।

৮. *শিখা* পত্রিকাটি মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র ছিল। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক আবুল হোসাইন। এই পত্রিকার দশ বছরে মাত্র পাঁচটি সংখ্যা বের হয়েছে।

৯. সওগাত একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা। ১৩২৫ বঙ্গাব্দের (১৯১৮ সাল) অগ্রহায়ণ মাসে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে এটি প্রকাশিত হয়। ১৩২৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে (১৯২১ সালের মার্চ-এপ্রিল) অনিবার্য কারণবশত এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ ছয় বছর পর ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের (১৯২৬ সাল) আষাঢ় মাসে সওগাত-নবপর্যায় নামে পুনরায় এর প্রকাশনা শুরু হয়। কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন সওগাতের প্রধান লেখকদের অন্যতম।

১০. সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা।

১১. রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) সাহিত্যিক, শিক্ষাব্রতী, সমাজসংস্কারক এবং নারী জাগরণ ও নারীর অধিকার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার অন্তর্গত পায়রাবন্দ ইউনিয়নে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম জমিদার পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রোকেয়ার উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে রয়েছে: মতিচূর (প্রবন্ধ, ২ খণ্ড : ১ম খণ্ড ১৯০৪, ২য় খণ্ড ১৯২২), Sultana's Dream (নকশাধর্মী রচনা, ১৯০৮), পদ্মরাগ (উপন্যাস, ১৯২৪), অবরোধবাসিনী (নকশাধর্মী গদ্যগ্রন্থ, ১৯৩১) প্রভৃতি। এ ছাড়া আছে অসংখ্য প্রবন্ধ, ছোটগল্প, কবিতা, ব্যঙ্গাত্মক রচনা ও অনুবাদ। Sultana's Dream গ্রন্থটি রোকেয়া নিজেই বাংলায় অনুবাদ করেন সুলতানার স্বপ্ন নামে। বাঙালি মুসলমান সমাজে নারীর স্বাতন্ত্র্য ও নারী স্বাধীনতার পক্ষে প্রথম প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর বেগম রোকেয়া। বিশ শতকের প্রথম দিকে বাঙালি মুসলমানদের নবজাগরণের সূচনালগ্নে নারীশিক্ষা ও নারী জাগরণে তিনিই প্রধান নেতৃত্ব দেন। মুসলমান সমাজের ঘোর অন্ধকার যুগে নারী জাগরণের ক্ষেত্রে রোকেয়ার ভূমিকা ছিল একক, ব্যতিক্রমী এবং অনন্যসাধারণ।

১২. ১৯০৯ সালের ১ অক্টোবর স্বামীর প্রদত্ত অর্থে পাঁচটি ছাত্রী নিয়ে রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন ভাগলপুরে 'সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস' স্কুল স্থাপন করেন ১৯১১ সালের ১৬ মার্চ কলকাতার ১৩নং ওয়ালিউল্লাহ লেনের একটি বাড়িতে মাত্র আটজন ছাত্রী নিয়ে তিনি নবপর্যায়ে 'সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। রোকেয়ার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৯১৭ সালে এই স্কুল মধ্য ইংরেজি গার্লস স্কুলে এবং ১৯৩১ সালে উচ্চ ইংরেজি গার্লস স্কুলে রূপান্তরিত হয়। ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ও প্রাতিষ্ঠানিক কারণসহ অন্যান্য কারণে স্কুলটি বহুবার স্থান বদল করে। বিভিন্ন সময় স্কুলটির অবস্থান ছিল ১৩, ইউরোপিয়ান অ্যাসাইলাম লেন (১৯১৩), ১৬২, লোয়ার সার্কুলার রোড (১৯৩২), ১৭, লর্ড সিনহা রোড (১৯৩৮) এবং আলীপুর হেস্টিংস হাউস (১৯৩৮)। ১৯৬৮ সালে এটি ১৭ নং লর্ড সিনহা রোডের নিজস্ব বাড়িতে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হয়।

১৩. বেথুন কলেজ বাংলায় নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনকারী প্রথম কলেজ। হিন্দু ফিমেল স্কুল হিসেবে প্রথম এর কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে ১৮৪৯ সালের ৭ মে বিদ্যালয়টির নামকরণ হয় বেথুন স্কুল। এর প্রতিষ্ঠাতা জন ইলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন (১৮০১-১৮৫১) ছিলেন ট্রিনিটি কলেজ কেম্ব্রিজের গ্র্যাজুয়েট ও চতুর্থ র‍্যাঙ্গলার। তিনি গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের আইন উপদেষ্টা হিসেবে ১৮৪৮ সালের এপ্রিলে ভারতে আসেন। তিনি কাউন্সিল অব এডুকেশনেরও সভাপতি ছিলেন। নারীশিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ও পদক্ষেপে তিনি রামগোপাল ঘোষ, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জী, পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রমুখের ন্যায় কয়েকজন ভারতীয় পণ্ডিত ও মনীষীর সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেন।

১৪. আখতার ইমাম (১৯১৭-২০০৯) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর প্রবন্ধ/রচনা সংকলন: যেমন ভেবেছি তেমন দেখেছি; যে হুলে বিষ নেই; স্মৃতিকথা : রোকেয়া হলে বিশ বছর; দূরের ছায়া; ইডেন থেকে বেথুন ইত্যাদি। তিনি বিভিন্ন পুরস্কার পান তার মধ্যে গঙ্গামনি দেবী স্বর্ণ পদক, বেগম রোকেয়া পদক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১৫. হবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী (১৯০৬-১৯৬৬) রাজনীতিক ও লেখক। ফেনী জেলার গুথুমা গ্রামে ১৯০৬ সালে তাঁর জন্ম। ১৯২২ সালে তিনি চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং ১৯২৪ সালে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে আইএসসি পাস করেন। এ সময় তিনি সক্রিয়ভাবে ছাত্র রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯২৮ সালে হবীবুল্লাহ বাহার কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত হন। এ সময় তিনি বুলবুল নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৪৮ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির তিনি সভাপতি ছিলেন। ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তান স্পোর্টস ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হবীবুল্লাহ বাহার অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং তিনি ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। ১৯৫৩ সালে হবীবুল্লাহ বাহার হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হলে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেন এবং রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর তিনি সাহিত্যচর্চা ও সমাজকর্মে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ পাকিস্তান, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, ওমর ফারুক, আমির আলী। ১৯৬৬ সালের ১৫ এপ্রিল তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

১৬. শামসুন্নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪) শিক্ষাবিদ, লেখক। ১৯০৮ সালে ফেনী জেলার গুথুমা গ্রামে তাঁর জন্ম। হবীবুল্লাহ্ বাহার চৌধুরী ছিলেন সহোদর ভ্রাতা। শিক্ষাজীবনের শুরুতে শামসুন্নাহার চট্টগ্রামের খাস্তগীর গার্লস হাইস্কুলে ভর্তি হন, কিন্তু সামাজিক অনুশাসনের কারণে তাঁর স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। পরে নিজ চেষ্টায় তিনি প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে ম্যাট্রিক (১৯২৬) পাস করেন। বিএ পাস করার পর বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল হাইস্কুল থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। পরে তিনি বেগম রোকেয়ার নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তি আন্দোলনের অংশীদার হন। শামসুন্নাহার লেডি ব্রাবোর্ন কলেজে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক রূপে কর্মজীবন শুরু করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো: পুণ্যময়ী (১৯২৫), ফুলবাগিচা (১৯৩৫), বেগম মহল (১৯৩৬), রোকেয়া জীবনী (১৯৩৭), শিশুর শিক্ষা (১৯৩৯), আমার দেখা তুরস্ক (১৯৫৫), নজরুলকে যেমন দেখেছি (১৯৫৮) ইত্যাদি। তাঁর লেখায় সমাজ ও সংস্কৃতি-প্রীতির প্রকাশ ঘটেছে। নজরুল তাঁর সিন্ধুহিন্দোল (১৯২৭) কাব্যখানি 'বাহার-নাহার'কে উৎসর্গ করেন। ১৯৬৪ সালের ১০ এপ্রিল ঢাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।

১৭. আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫) কবি ও সাংবাদিক। ১৯১৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি পিরোজপুর জেলার শংকরপাশা গ্রামে তাঁর জন্ম। তিনি পিরোজপুর থেকে প্রবেশিকা (১৯৩৫) পাস করে কিছুদিন বিএম কলেজে আইএ ক্লাসে অধ্যয়ন করেন, কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে লেখাপড়া ত্যাগ করে কলকাতা গিয়ে সাংবাদিকতার পেশা গ্রহণ করেন এবং আজীবন ওই পেশাতেই নিয়োজিত ছিলেন। আহসান হাবীবের প্রথম কবিতার বই রাত্রিশেষ প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ ছায়াহরিণ (১৯৬২), সারা দুপুর (১৯৬৪), আশায় বসতি (১৯৭৪), মেঘ বলে চৈত্রে যাবো (১৯৭৬), দুহাতে দু আদিম পাথর (১৯৮০), প্রেমের কবিতা (১৯৮১), বিদীর্ণ দর্পণে মুখ (১৯৮৫) ইতাদি। তাঁর দুটি বিশিষ্ট উপন্যাস হলো অরণ্য নীলিমা (১৯৬০) ও রাণীখালের সাঁকো (১৯৬৫)। এ ছাড়া তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শিশুতোষ গ্রন্থ: জ্যোৎস্না রাতের গল্প, বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর (১৯৭৭), ছুটির দিন দুপুরে (১৯৭৮) ইত্যাদি। মধ্যবিত্তের সংকট ও জীবনযন্ত্রণা আহসান হাবীবের কবিতার মুখ্য বিষয়। সামাজিক বাস্তবতা, মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংগ্রামী চেতনা এবং সমকালীন যুগযন্ত্রণা তাঁর কবিতায় শিল্পসম্মতভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। তাঁর ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিতে নাগরিক মননের ছাপ আছে। সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ইউনেসকো সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬১), বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬১), আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৪), নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক (১৯৭৭), একুশে পদক (১৯৭৮),

আবুল মনসুর আহমদ স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮০) এবং আবুল কালাম স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮৪) লাভ করেন। ১৯৮৫ সালের ১০ জুলাই ঢাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।

১৮. ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) কবি, শিশুসাহিত্যিক। ১৯১৮ সালের ১০ জুন মাগুরা জেলার শ্রীপুর থানার মাঝাইল গ্রামে তাঁর জন্ম। ফররুখ আহমদ প্রথমে কলকাতার আইজি প্রিজন অফিস এবং সিভিল সাপ্লাই অফিসে কয়েক বছর চাকরি করেন। ১৯৪৫ সাল থেকে তিনি *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকা সম্পাদনা করেন। বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগনৈপুণ্য এবং বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের অভিনবত্বে তাঁর কবিতা এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। ব্যঙ্গ কবিতা ও সনেট রচনায় তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪), সিরাজাম মুনিরা (১৯৫২), নৌফেল ও হাতেম (১৯৬১), মুহূর্তের কবিতা (১৯৬৩), হাতেমতায়ী (১৯৬৬), হাবেদা মরুর কাহিনী (১৯৮১) ইত্যাদি। সাহিত্যে বিশেষ অবদানে জন্য তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬০), প্রেসিডেন্ট পুরস্কার প্রাইড অব পারফরম্যান্স (১৯৬১), আদমজী পুরস্কার (১৯৬৬), ইউনেসকো পুরস্কার (১৯৬৬), মরণোত্তর একুশে পদক (১৯৭৭), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৮০) লাভ করেন। ১৯৭৪ সালের ১৯ অক্টোবর ঢাকা তাঁর মৃত্যু হয়।

১৯. শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮) কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক। ১৯১৭ সালের ২ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার সবলসিংহপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম শেখ আজিজুর রহমান; 'শওকত ওসমান' তাঁর সাহিত্যিক নাম। উপন্যাস ও গল্প রচয়িতা হিসেবেই শওকত ওসমানের মুখ্য পরিচয়; তবে প্রবন্ধ, নাটক, রম্যরচনা, স্মৃতিকথা ও শিশুতোষ গ্রন্থও তিনি রচনা করেছেন। বিদেশি ভাষার অনেক উপন্যাস, ছোটগল্প ও নাটক তিনি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। গ্রন্থ সম্পাদনার ক্ষেত্রেও তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রচনা হলো : উপন্যাস জননী (১৯৫৮), ক্রীতদাসের হাসি (১৯৬২), সমাগম (১৯৬৭), চৌরসন্ধি (১৯৬৮), রাজা উপাখ্যান (১৯৭১), জাহান্নাম হইতে বিদায় (১৯৭১), দুই সৈনিক (১৯৭৩), নেকড়ে অরণ্য (১৯৭৩), পতঙ্গ পিঞ্জর (১৯৮৩), আর্তনাদ (১৯৮৫), রাজপুরুষ (১৯৯২) ইত্যাদি। সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬২), আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৬), পাকিস্তান সরকারের প্রেসিডেন্ট পুরস্কার (১৯৬৭), একুশে পদক (১৯৮৩), মাহবুবউল্লাহ ফাউন্ডেশন পুরস্কার (১৯৮৩), মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯১), স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার (১৯৯৭)-এ ভূষিত হন। ১৯৯৮ সালের ১৪ মে ঢাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।

২০. আবুল হোসেন (১৯২২-২০১৪) বাংলাদেশের প্রথম আধুনিক কবি। তিনি পঁচিশটি বই লিখেছেন। তাঁর প্রথম কবিতার বই ছিল নব বসন্ত। এ ছাড়াও রয়েছে বিরাশ সংলাপ, দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে, এখনও সময় আছে, কালের খাতায় ইত্যাদি।

২১. ইসলাম, কাজী নজরুল (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলাদেশের জাতীয় কবি এবং অবিভক্ত বাংলার সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। নজরুল ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে ১৮৯৯) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি 'বিদ্রোহী কবি' এবং আধুনিক বাংলা গানের জগতে 'বুলবুল' নামে খ্যাত। নজরুলের 'প্রলয়োল্লাস', 'আগমনী', 'খেয়াপারের তরণী', 'শাত-ইল্-আরব', 'বিদ্রোহী', 'কামাল পাশা' প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যে সাড়া জাগানো এবং বাংলা কবিতার মোড় ফেরানো কবিতা সংকলিত হয়েছিল। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে কবির অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭৪ সালের ৯ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ সমাবর্তনে কবিকে

সম্মানসূচক ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে নজরুলকে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান এবং ২১ ফেব্রুয়ারি 'একুশে পদকে' ভূষিত করে। ২৯ আগস্ট ১৯৭৬ (১২ ভাদ্র ১৩৮৩) ঢাকার পিজি হাসপাতালে কবি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের উত্তর পাশে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয় বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে।

২২. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি বাঙালি মুসলমানদের একটি সাহিত্য সংগঠন। কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের (১৮৯৩) অনুপ্রেরণায় কয়েকজন উদীয়মান মুসলিম লেখক ১৯১১ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা হলেন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক প্রমুখ। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সমিতির সম্পাদক মনোনীত হন। একটি পরিচালক পরিষদ দ্বারা সমিতি পরিচালিত হতো। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি দীর্ঘকাল স্থায়ী একটি মুসলিম সংগঠন। জাতির ক্রান্তিলগ্নে মুসলমান লেখকগণকে একটি ব্যানারে একত্রিত করা এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে সমাজের মধ্যে জাতীয় জাগরণ ও জাতীয়তাবোধের সঞ্চার করা ছিল এর একটি বড় অর্জন।

২৩. সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯-১৯৪৯) কবি, রাজনীতিক। ১৮৭৯ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ভারতের হায়দ্রাবাদে তাঁর জন্ম। সরোজিনী নাইডু ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। ১৯১৫ সালে তিনি অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসে যোগ দেন। তিনি সমগ্র ভারতে সভা সমাবেশ করে নারী মুক্তি, শ্রমিক অধিকার রক্ষা ও জাতীয়তাবাদের সমর্থনে তাঁর বার্তা প্রচার করেন। সরোজিনী নাইডু ছিলেন একজন খ্যাতিমান কবি। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হলো The Ladz of the Lake, Maher Muneer, The Golden Threshold (1905), The Bird of Time: Songs of Life, Death and the Spring (1912), The Gift of India (1915), The Broken Wing: Songs of Love, Death and the Spring (1917), The Sceptred Flute: The Songs of India (1943), The Feather of the Dawn (1961)। তিনি The Ambassador of Hindu Muslim Unity (১৯১৬) নামে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত কবিতা সংগ্রহ The Golden Threshold ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি সাধারণ্যে 'বুলবুলে হিন্দ' খেতাবে বিভূষিত হন। ১৯০৮ সালে হায়দ্রাবাদে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ত্রাণ তৎপরতার জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কায়সার-ই-হিন্দ স্বর্ণপদক প্রদান করে। সরোজিনী নাইডুর আজীবন কর্মসাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সরকার সরোজিনী নাইডু স্বর্ণপদক প্রবর্তন করেছেন।

২৪. মোহাম্মদী একটি বাংলা মাসিক পত্রিকা। ১৯০৩ সালের আগস্ট মাসে মোহাম্মদ আকরম খাঁর সম্পাদনায় কলকাতা থেকে এটি প্রকাশিত হয়। ব্রিটিশ ভারত ও পাকিস্তানে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে সাহিত্য-সংস্কৃতির একটি স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি এবং জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ত্বভিত্তিক মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিকাশ এবং শেষে পাকিস্তানি ভাবধারার প্রসার ঘটানো ছিল মোহাম্মদী প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য। তবে এতে অন্য মতাদর্শের লেখকের লেখাও প্রকাশিত হতো। এতে যেসব মুসলমান লেখক, কবি-সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ লিখতেন তাঁরা হলেন সুফিয়া কামাল, শওকত ওসমান, তালিম হোসেন, আবদুল হাই, আবু জাফর শামসুদ্দীন, হবীবুল্লাহ্ বাহার চৌধুরী, মোহাম্মদ আকরম খাঁ, আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দিন, আবদুল গনি হাজারী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবু রুশদ, জসীমউদ্দীন, আশরাফ সিদ্দিকী, ফেরদৌস খান প্রমুখ। তাঁরা অনেকেই পরবর্তীকালে লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ ও প্রতিষ্ঠালাভ করেন।

২৫. *বেগম* বাংলার প্রথম সচিত্র মহিলা সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৯৪৭ সালের ২০ জুলাই কলকাতা থেকে এটি প্রকাশিত হয়। সাহিত্যক্ষেত্রে মেয়েদের এগিয়ে আনার লক্ষ্যে সাহিত্যচর্চার পৃথক ক্ষেত্র হিসেবে বেগমের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৫০ সালে বেগম ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। বেগমের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন এবং প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদিকা ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল। পরে পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছেন নূরজাহান বেগম। বেগমের প্রথম সংখ্যা ছাপা হয়েছিল ৫০০ কপি এবং প্রতি কপির মূল্য ছিল চার আনা। প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদে বেগম রোকেয়ার ছবি ছাপা হয়েছিল। পত্রিকাটির একটি বিশেষ আকর্ষণ এর বার্ষিক ঈদসংখ্যা। প্রথম ঈদসংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে কলকাতা থেকে, দাম ছিল ২ টাকা।

২৬. সেলিনা বাহার (১৯৪০-২০০৪) সেলিনা বাহার চৌধুরী এবং বিবাহের পর সেলিনা বাহার জামান নামে সমধিক পরিচিত পারভীন সুলতানা চৌধুরী ১৯৪০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হবীবুল্লাহ বাহার ও মাতা আনোয়ারা বাহার চৌধুরী অবিভক্ত বাংলার প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পঞ্চাশের দশক থেকেই ঢাকার বেতারের শিশুশিল্পী হিসেবে সেলিনা বাহারের হাতেখড়ি হয় এবং নৃত্য ও আবৃত্তিতে দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। নব্বইয়ের দশক থেকে তিনি বিভিন্ন স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৯৫ সালে হবীবুল্লাহ বাহার স্মারকগ্রন্থ পুনর্মুদ্রণ দিয়ে তাঁর এ পর্যায়ের কর্মযজ্ঞ শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত হয় জহুর হোসেন চৌধুরী স্মারকগ্রন্থ (১৯৯৬), আনোয়ারা বাহার চৌধুরী স্মারকগ্রন্থ (১৯৯৭), শামসুদ্দীন আবুল কালাম স্মারকগ্রন্থ (১৯৯৯), শামসুন নাহার মাহমুদ স্মারকগ্রন্থ (২০০২), বেগম রোকেয়া স্মারকগ্রন্থ (২০০২), শওকত ওসমান স্মারকগ্রন্থ (২০০৩)। সেলিনা বাহারের সর্বশেষ অসমাপ্ত রচনা পথে চলে যেতে যেতে। ২০০৪ সালের ৪ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

২৭. বুলবুল ললিতকলা একাডেমী (বাফা) একটি সংস্কৃতি-চর্চাকেন্দ্র। উপমহাদেশের বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরীর স্মৃতিবিজড়িত এ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৫৫ সালের ১৭ মে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সংক্ষেপে এটি বাফা (BAFA Bulbul Academy for Fine Arts) নামে পরিচিত। কণ্ঠসংগীত, যন্ত্রসংগীত, নৃত্যকলা, নাট্যকলা, চারু ও কারুশিল্পে শিক্ষাদান এবং শিল্প-সাহিত্য-সংগীতে গবেষণা পরিচালনা এর লক্ষ্য। বুলবুল ললিতকলা একাডেমী প্রথমে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ শুরু করে। বিভিন্ন সময়ে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল নিয়ে এটি ইরাক, ইরান, পাকিস্তান, সোভিয়েত রাশিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, চীন, নেপাল, বলিভিয়া, ওমান প্রভৃতি দেশে অনুষ্ঠান করে সুনাম অর্জন করে। একাডেমী পরিবেশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নৃত্যনাট্য হলো: চণ্ডালিকা (১৯৫৮), প্রকৃতির লীলা (১৯৫৮), নকসী কাঁথার মাঠ (১৯৫৯), সিন্ধু (১৯৬১), মায়ার খেলা (১৯৬৪), চিত্রাঙ্গদা (১৯৬৬), হাজার তারের বীণা (১৯৬৭), বাদল বরিষণে (১৯৬৭), রাজপথ জনপথ (১৯৬৯) ও শ্যামা (১৯৭০)। এছাড়াও একাডেমী বিভিন্ন বিষয় ও গানের ওপর প্রায় অর্ধশত খণ্ড নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেছে। একাডেমীর সবচেয়ে বড় অবদান সংস্কারমুক্ত সংস্কৃতিচর্চাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া। এক সময় নৃত্যকলা সম্পর্কে মুসলিম সমাজের বিরূপ ধারণা ছিল। বুলবুল ললিতকলা একাডেমী সে ধারণা ভেঙে দিয়ে নৃত্যকলাকে সবার নিকট গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। সংগীত, নৃত্য ও যন্ত্রশিল্পী তৈরি করে এই প্রতিষ্ঠান দেশের মৌলিক সাংস্কৃতিক দায়িত্ব পালন করছে।

সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন

জামদানির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ভৌগোলিক নির্দেশনা

ইফতেখার ইকবাল

সারসংক্ষেপ

বয়নশিল্পের ঐতিহ্য দক্ষিণ এশিয়ায় চার হাজার বছরের। সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলা ব-দ্বীপে তুলার চাষ ও উৎপাদন, বিভিন্ন রকম অসাধারণ মসৃণ কাপড়ের জন্য বিশেষ জায়গা দখল করে আসছে। ব-দ্বীপ অঞ্চলের মধ্যে বৃহত্তর ঢাকা প্রাচীনকাল থেকে মসলিনের উৎপাদন ও বাণিজ্যের জন্য অন্যতম জায়গা ছিল। অনুমান করা হয় যে মসলিনের মধ্যে ৩৬টি ভিন্ন ভিন্ন পণ্য রয়েছে। জামদানি তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। জামদানি তৈরির কলাকৌশল শুধু ঢাকার আড়ংয়ের কারিগরদের আয়ত্তাধীন। মধ্য ঊনবিংশ শতকে ওয়াটসন যে ১ হাজার ৪০০ নমুনা সংগ্রহ করেন। তার ১৫টি নমুনার মধ্যে দুটি জামদানির নমুনা ছিল। দক্ষিণ এশিয়া বা পৃথিবীর অন্য কোথাও জামদানি নামে কোনো পণ্য পরিচিতি পায়নি। ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের ওপর ভিত্তি করে দক্ষিণ এশিয়ার বয়নশিল্পের নকশা, কৌশল, গঠনবিন্যাস নির্ভর করে আসছে। ভৌগোলিক নির্দেশনা (Geographical Indication) আইন অনুযায়ী ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক দিক দিয়ে জামদানি বিশেষভাবে ঢাকা অঞ্চলেরই। সে বিবেচনায় ঢাকা ভৌগোলিক নির্দেশনা দাবি করে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ : ঢাকাই জামদানি, বয়ন-প্রক্রিয়া, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, জামদানি বাণিজ্য, ভৌগোলিক নির্দেশনা।

জামদানির পরিচিতি

জামদানি শব্দটি ফারসি শব্দ জামা(ই) থেকে এসেছে, যার অর্থ কাপড়।[১] ফারসিতে জামেদান অর্থ জিনিসপত্র রাখার ছোট ঘর অথবা আলমারি। বয়নশিল্পের ইতিহাসে জামদানিকে শাড়ি হিসেবে দেখা হয়, যা বাংলাদেশি নারীদের মধ্যে জনপ্রিয়

পোশাক। এখানে জামদানির তিনটি সংজ্ঞা দেওয়া হলো :

ক. একধরনের কাপড়, যেখানে ফুল বোনা হয় (সাধারণত মসলিন) (হান্টার ১৮০৮)।

খ. ফুল এবং অন্যান্য নকশায় বোনা ঢাকার মসলিন (নাইট ১৮৮১)।

গ. নকশা করা ও ফুলেল ঢাকার মসলিন।

জামদানির বিশিষ্টতা বুঝতে হলে ফুলময়তা ছাড়াও অন্যান্য সূক্ষ্ম জিনিসে নজর দিতে হবে। এর গঠন জ্যামিতিক এবং নকশায় ফুল ছাড়াও অন্যান্য জিনিস যেমন—গাছ, মাছ বা লতাপাতা থাকতে পারে। জামদানির বৈচিত্র্য অনেক কিন্তু তিনটি মূল নকশা আছে। 'জাল' সবচেয়ে জটিল, যেখানে পুরো জমিনজুড়ে কাজ থাকে; 'তেরচি'তে জ্যামিতিক নকশা থাকে এবং 'বুটি'তে ফুল ও ঝরনা পুরোটা জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে (গুজনাভি ২০০৬ : ৪৭ ; আরও দেখুন গিলো ও বার্নার্ড ২০০৮ : ১৮৬)। এর বয়ন-প্রক্রিয়া এবং বাস্তবায়নের ধরন অনন্য। এককথায়, নকশার ঐশ্বর্য, তাঁতিদের দক্ষতা ও কাঁচামালের সহজলভ্যতার কারণে জামদানি খাঁটি বাংলাদেশি পণ্য হিসেবে বিকশিত হয়েছে। ওয়াটসন দাবি করেন,

> জামদানি অথবা মসলিনকে ভারতীয় কারিগরদের সেরা শিল্পকর্ম হিসেবে গণ্য করা হয়, যা অত্যন্ত চমৎকার, নিখুঁত, সুকৌশলী। কঠিন নকশার কারণে তারা ঢাকা তাঁতের সবচেয়ে ব্যয়বহুল পণ্য উৎপাদন করে।

উৎপাদনের ভৌগোলিক পরিবেশ

জামদানির ঢাকাভিত্তিক ভৌগোলিক নির্দেশনা আমরা দুটি বিষয়ের মাধ্যমে বিবেচনা করতে পারি। প্রথমত, এই অঞ্চলে তুলা উৎপাদনের জায়গা এবং পরিবেশ।

দ্বিতীয়ত, জামদানি উৎপাদনের পরিবেশগত অবস্থা। আমরা এখানে দেখব ঢাকা অঞ্চলে জামদানিশিল্পের প্রসারের ক্ষেত্রে কতটুকু ভৌগোলিক অবস্থার প্রভাব রয়েছে।

তুলা চাষের ভৌগোলিক ও পরিবেশগত অবস্থা

ঢাকা অঞ্চলে জামদানির আবির্ভাব ও প্রসার বুঝতে হলে আমাদের তুলা চাষের ক্ষেত্র ও চাষ সম্পর্কে বুঝতে হবে। কারণ, তুলার সঙ্গে সাধারণত মসলিন এবং বিশেষ করে জামদানির সংযোগ রয়েছে। তুলা ইংরেজিতে কটন, যা আরবি 'কুটন' থেকে আগত, বাংলার সবচেয়ে পুরাতন বাণিজ্যিক পণ্য। বসু (১৯৫৫ : ২৮১-৮২) চার ধরনের তুলার কথা বলেছেন, গসিপিয়াম, বারবাদেনস, গসিপিয়াম হারবাসিয়াম, গসিপিয়াম অ্যাবোরিয়াম বা হিরাসাতাম এবং গসিপিয়াম

পারুভিয়ানাম, দক্ষিণ এশিয়া ও চীনের। তুলা দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন রকম হয়। তুলাগাছ সাধারণত তিন ফুট লম্বা ঝোপের মতো হয়। এই ধরনের তুলাকে সংস্কৃতে কার্পাস এবং বাংলায় কাপাস বলা হয় (রক্সবার্গ ১৮৩২ : ১৮৪)। রক্সবার্গের মতে, যেহেতু গসিপিয়াম হারবাসিয়াম যা থেকে সমগ্র বাংলা ও করোমানডেল এলাকায় সূক্ষ্ম মসলিন তৈরি হয়, রক্সবার্গের মতে, এই তুলার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি দীর্ঘ, সূক্ষ্ম ও কোমল (রক্সবার্গ ১৮৩২ : ১৮৪)।

সাধারণত বাংলা ব-দ্বীপ, বিশেষত ঢাকা কাপাস উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। প্রাক ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক যুগের কর্মদক্ষ কর্তৃপক্ষ সুপারিশ করেছে যে ঢাকার সুতার অনন্য মানের কারণ হলো এগুলো মেঘনার শাখাগুলো এবং ব্রহ্মপুত্রের তীরে উৎপাদিত হয় (গুজনাভি : ৩৮)। উনবিংশ শতকে জন টেইলর ঐতিহাসিকভাবে তুলা উৎপাদনের এলাকার নাম উল্লেখ করেছেন : ফিরিঙ্গি বাজার, রাজেন্দ্রপুর, ইদিলপুর, বিক্রমপুর ও কার্তিকপুর। শীতলক্ষ্যা নদীর পাশে অবস্থিত রাজেন্দ্রপুর এলাকা এখনো কাপাসিয়া নামে পরিচিত এবং এটি দেশের একটি উপজেলা।

অন্য কথায়, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর সংযোগস্থল তুলা উৎপাদনের জন্য উর্বর ভূমি (ম্যাপ ১) (তালুকদার : ৫৭)। হান্টার এক বিশেষ ধরনের তন্তু সম্পর্কে বলেন, যা 'দেশি' নামে পরিচিত, এটি ঢাকা বিভাগের উত্তরে কাপাসিয়ার কাছাকাছি অনাদিকাল থেকে উৎপাদিত হয় (হান্টার ১৮৭৭ : ৮৪)। জন টেইলর বলেছেন, পৃথিবীর সবচেয়ে সূক্ষ্ম তুলা এই অঞ্চলে (কাপাস) উৎপাদিত হতো (গুজনাভি : ৮৪-৮৫-তে উদ্ধৃত)। কিছু নির্ভরযোগ্য কাজ দ্বারা বোঝা যায়, এই অঞ্চলে জন্মানো কাঁচা তুলার মানের তুলনায় ঢাকা মসলিনের মান বেশি ভালো। ঔপনিবেশিক কর্মকর্তারা পর্যবেক্ষণ করে বলেছেন যে মাটির নির্দিষ্ট বাস্তুসংস্থান অনুযায়ী এই অঞ্চলের নদীর পানিতে লৌহমিশ্রিত সিলিসিয়াস ও চুনসংবলিত মাটি রয়েছে, যা একটি বিশেষ জাতের তুলা চাষে সাহায্য করে (এলেন ১৯১২ : ৮, টেইলর ১৮৫১)। বসু (১৯৫৫ : ২৮৯) বলেছেন, কাপাসের মূল কাণ্ড যত গভীরে যাবে, তুলার মান ও পরিমাণ তত ভালো হবে। তুলার মান ও পরিমাণ ভালো হবে, যদি মাটি দো-আঁশ বা সর্বোচ্চ আর্দ্রতা ও তাপ ধারণকারী হয়। বাংলা ব-দ্বীপ অথবা ঢাকা অঞ্চলের আশপাশের এলাকা এই অবস্থার জন্য মানানসই। সমুদ্রের ঠান্ডা বাতাস কার্পাস চাষে সাহায্য করে। ভূতাত্ত্বিক ও জলবায়ুজনিত অনুকূল পরিবেশের কারণে এই অঞ্চলের মধ্যে ঢাকা তুলা উৎপাদনের অনন্য ক্ষেত্র ছিল। এই সত্য প্রতিফলিত হয় যখন ১৭৯০ ও ১৭৯১ সালে ব্রিটিশরা অন্য জায়গায় কার্পাস চাষ করে ব্যর্থ হয় (গুজনাভি : ৮৪-৮৫)।

ম্যাপ-১ : বৃহত্তর ঢাকার ঐতিহাসিকভাবে তুলা চাষের অঞ্চলসমূহ

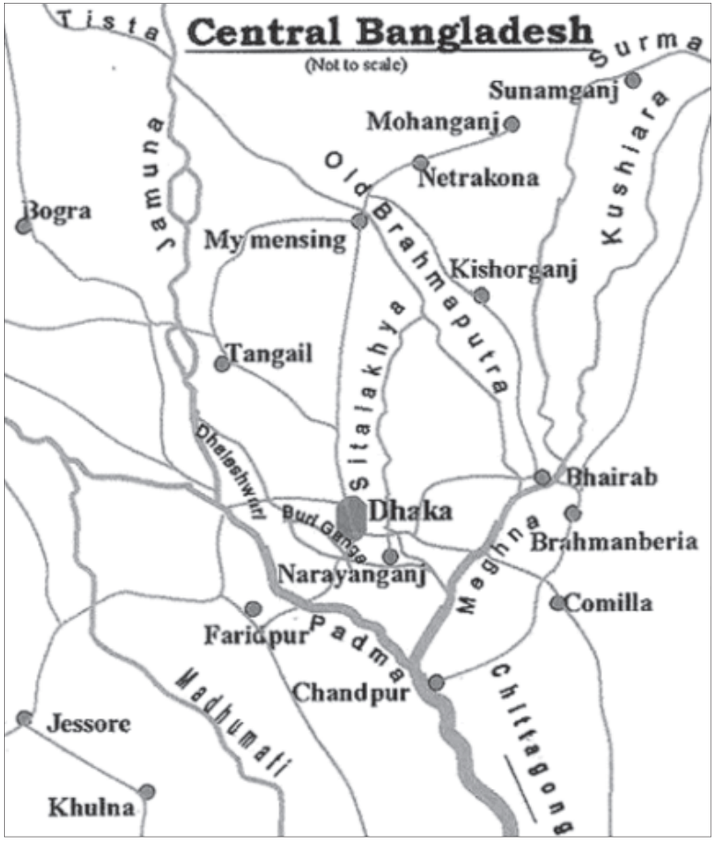

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Dhaka#mediaviewer/File:BD_Map_Central_Bangladesh.jpg

জামদানি উৎপাদনস্থানের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশগত প্রসঙ্গ

মধ্য উনিশ শতকে জেমস টেইলর বলেছেন, ঢাকা জেলার প্রতিটি গ্রামে কিছু না কিছু বয়ন প্রতিষ্ঠান ছিল, কিন্তু বড় উৎপাদন অঞ্চলগুলো ছিল ঢাকা শহর, সোনারগাঁ, ধামরাই, তিতাবাড়ী, জংলাপুর ও বাজিতপুর। বর্তমান সময়ে উৎপাদন এলাকা হলো সোনারগাঁ। ঐতিহাসিকভাবে, উৎপাদন এলাকা ছিল ঢাকার কাছাকাছি জলবেষ্টিত মেঘনা অববাহিকার ওপর, সোনারগাঁ ছিল

নিকটতম উৎপাদন অঞ্চল, যা উত্তরে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে প্রসারিত হয়েছে। উত্তর থেকে দক্ষিণে নদীর ধারে জামদানি উৎপাদন অঞ্চলগুলো হলো নরসিংদীর (ঘোড়াশাল) পাশে কাপাসিয়া, রূপগঞ্জ (কাজীপাড়া, রূপগঞ্জের তারাব পৌরসভা, শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে, পুবানকূল, মরগাকূল, রূপসী, নওয়াপাড়া) ও সিদ্ধিরগঞ্জ। গ্লাসি (২০০০ : ৪০৩) রিপোর্ট করেছেন যে এই অঞ্চলে দুই থেকে তিন হাজার তাঁতকল আছে, যার অর্ধেক শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত। সাইদুর (১৯৯৩ : ৩৩-৩৪) নদীর দুই তীরে ৫ হাজার ৪৮০টি তাঁতকলসহ ২৬টি জামদানি গ্রামের কথা বলেছেন।

এবার আলোচনা করা যাক এই অঞ্চলে জামদানির উৎপাদনের কারণ কী? প্রথমত, এটা বোঝা যায় যে এসব উৎপাদনক্ষেত্র তুলা চাষের জায়গার কাছাকাছি অবস্থিত। দ্বিতীয়ত, এই এলাকার নদ-নদীগুলো কাঁচা তুলার সরবরাহ ও বিতরণ এবং তৈরি করা পণ্যের বিপণনের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা দেয়। তাই সব বাজার নদীর তীরে অবস্থিত। হোসাইন (২০১০ : ১৪১-১৪৪) এবং এলেন (১৯১২ : ৭) নিম্নোক্ত বাজারগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন: বার্মি, কাপাসিয়া, লক্ষ্মীপুর, জামালপুর, কালীগঞ্জ, রূপগঞ্জ, মুরাপাড়া, দার্মা, সিদ্ধিরগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ।

তৃতীয়ত, এই অঞ্চলের পানির মানের সঙ্গে সম্পর্কিত। হান্টার বলেছেন, ৫০ মাইল ধরে এবং গাছপালাবেষ্টিত তীর রয়েছে, যা কখনো প্লাবিত হয় না এবং এটি পানির বিশুদ্ধতার জন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল (হান্টার ১৮৭৭ : ২১)। যেহেতু তুলা এবং অন্যান্য পণ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য পানি প্রয়োজন, সেহেতু শীতলক্ষ্যা নদীর পানি জামদানি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। এই নদীর পানি ব্লিচিং এবং ধোলাইও খুব ভালো করে হতো।[৩] বিস্তারিত দেখুন, বাসু ১৯৫৫ : ৩৭৩-৩৮৫, ৪৬৫-৬৯)। আমাদের একজন সাক্ষাৎকার প্রদানকারী সোনারগাঁয়ের মহাজন ওসমান গণি বলেছেন, ধোলাইয়ের আগে সুতা মেঘনা ও শীতলক্ষ্যার পানিতে পরিষ্কারের ফলে তৈরি করা পণ্যে যে চকচকে ভাব আসে, তা অন্য কোনো অঞ্চলে সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেছেন, যারা অন্য জায়গায় উৎপাদন করার জন্য এই জায়গা ছেড়ে গিয়েছিল, একই মানের জামদানি উৎপাদন করতে না পেরে তারা ফিরে এসেছে। আরেকজন সাক্ষাৎকার প্রদানকারী আবু তাহেরের কথায়, তিনি চট্টগ্রামে জামদানি তৈরি করতে চেয়েছেন কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতা এই অঞ্চলে সফল হয়নি।[২]

চতুর্থত, কোনো কোনো লেখক এই এলাকার আর্দ্রতাকে গুরুত্ব দেন। বুননের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে, যা সঠিক স্তরের আর্দ্রতার ওপর নির্ভর করে। যেমন—আর্দ্রতার অভাবে বুননের সুতা ভেঙে যেতে পারে (বাসু ১৯৫৫-৭৫)।

পঞ্চমত, নদী পারাপারের সুবিধার কারণে অভ্যন্তরীণ নৌচালনার ফলে পুরো অঞ্চলে এবং বাইরের বিশ্বে বঙ্গোপসাগরের মাধ্যমে লেনদেনের সুবিধা হয়।

অন্য কথায় এর বৃহত্তর মহাসাগরীয় বাণিজ্যিক সংযোগ কাপড় উৎপাদনের জন্য লাভজনক।

ষষ্ঠত, মসলিন তৈরির সরঞ্জাম এই অঞ্চলে সহজলভ্য। টেইলর ১২৬টি ভিন্ন ভিন্ন সরঞ্জামের তালিকা দিয়েছেন। যেমন মাকু, শানা, যেগুলো সূক্ষ্ম জামদানি তৈরিতে প্রয়োজন এবং এগুলো সব বাঁশ অথবা নলখাগড়ার তৈরি (টেইলর ১৮৪০ : ১৭৪)। আমাদের জরিপে দেখা যায়, এসব উপাদান এখনো জামদানি তাঁতিরা ব্যবহার করে।

সপ্তমত, স্থানীয় পরিবেশ জামদানির নকশায় বেশি প্রভাব ফেলে। নকশার ক্ষেত্রে জামদানি স্থির শিল্প ছিল না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পশোভিত নকশা বেশি দেখা যায়, বিশেষ করে স্থানীয় ফুল ও গাছপালা স্থানীয় অভিযোজন গুরুত্ব পায়। সাধারণত বাংলাদেশের বিশেষত ঢাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জীবনধারণ থেকে নকশা নেওয়া হয়। জামদানি তাঁতিদের ব্যবহৃত ডিজাইন বৈচিত্র্য প্রতিফলিত করে এমন একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো (গুজনাভি ২০০৬ : ৪৭) :

আংটি, আঙুর, বাঘনলি বা বাঘের পা, বেলি, ডালিম, দুবলা, গাঁদা ফুল, গোলাপ, কলমিলতা, কাঁকড়া, কচু, কলা, করলা, ময়ূর, মটরদানা, পান, পোনা, সাবুদানা, শঙ্খ, সাপ।

স্থানীয় ও জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে জামদানির অবস্থান

যদিও অনাদিকাল থেকে ঢাকা জামদানির অস্তিত্বের ক্ষেত্রে অগ্রদূত হিসেবে বিবেচ্য, জামদানি ভারতে মুসলিম শাসকদের আগমনের সঙ্গে একটি জনপ্রিয় ব্র্যান্ড হয়ে ওঠে। উপমহাদেশে মোগলদের আগমনের আগে বাংলায় ফারসি সংযোগ স্থাপিত হয়। ওডোরাডো বারবোসার মতে, যাঁরা ১৫১৬-২১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা ভ্রমণ করেছেন, তাঁদের মতে, আরব ও ফার্সিরা সাদা কাপড় হিজাব হিসেবে ব্যবহার করত। সম্ভবত সাদা রং জামদানির পটভূমি হিসেবে এসেছে (লাম এ উদ্ধৃত ১৯৩৭ : ১৮৯)।

একসময় জামদানি ও ঢাকা সমার্থক হয়ে ওঠে। এটা শুধু বসুর (১৯৫৫ : ২১০) প্রামাণিক গবেষণা নয়, এটা জনপ্রিয় ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ড হিসেবেও রয়েছে।

একটি বড় উদাহরণ হলো, নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত কবিতা বাঁশিতে লিখেছেন;

এগান যেখানে সত্য
অনন্ত গোধূলি লগ্নে
সেইখানে
বহি চলে ধলেশ্বরী,
তীরে তমালের ঘনছায়া—
আঙ্গিনাতে
যে আছে অপেক্ষা করে, তার
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।

আরও সাম্প্রতিক কালে, অমিতাভ ঘোষ তাঁর একটি জনপ্রিয় উপন্যাসে জামদানির কথা বলেছেন। তাঁর প্রধান চরিত্র, যে একজন দক্ষ বুননশিল্পী, আমরা একজন বহিরাগত থেকে জামদানির গোপন কৌশল শেখার নিষ্ফলতা বুঝতে পারছি : 'আমরা জানি, আমরা কী জানি। তারা বলে যখন উনি তাঁদের জামদানির গোপন কৌশল শেখানোর চেষ্টা করছিলেন এবং আমরা আর শিখতে চাইনি। একটি কাক যখন ময়ূরের মতো ওড়ার চেষ্টা করে, তখন সে আকাশ থেকে পড়ে যায়' (ঘোষ ২০০৫ : ৬৮)।

জামদানির আঞ্চলিক ও বিশ্বব্যাপী প্রচার

জামদানির আঞ্চলিক ও বিশ্বব্যাপী প্রচলন যে ঢাকাকেন্দ্রিক, তা এখানে উল্লেখ করা যায়। ভৌগোলিক নির্দেশনা অনুযায়ী এর প্রচলন ঢাকা থেকে হতে পারে। একটি উদাহরণ হলো Pocahontas, যিনি রেবেকা রলফ (১৫৯৫-১৬১৭) নামেও পরিচিত, যিনি ইন্দো-আমেরিকান ভার্জিনিয়া থেকে এসেছেন। তিনি ইংরেজদের সঙ্গে আলোচনাকারী ছিলেন। রেভ হুইটকার ইংরেজ প্রতিনিধিদের সঙ্গে রেবেকার সভা সম্পর্কে বলেন : জেমসটাউনের সবাই মুগ্ধ দর্শক ছিলেন। ভজনালয় সবুজে পূর্ণ ছিল, বন্য ফুল এবং চিরশ্যামল গুল্ম ছিল। রেবেকা ঢাকার সাদা মসলিনের জামা পরা ছিলেন (লুসিং ১৯০২)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে টেক্সটাইল বাণিজ্য যখন ভাটার সম্মুখীন, তখনো আরব (জেদ্দা, মক্কা), ইরাক ও ভূমধ্য উপকূলবর্তী দেশের কিছু অংশ ব্যবহার করা হয়েছিল। এশিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিকার ছিল (করিম ১৯৬৫ :১,১৩০)। ভারতের প্রভাবশালী সম্রাট আওরঙ্গজেব জামদানির অনুরাগী ছিলেন এবং তিনি প্রতিটির জন্য ২৫০ টাকা মূল্য দিতে বলেছেন (টেইলর ১৮৫১ : ৪৮)।

উপনিবেশের সময় জামদানি স্থানীয় শাসকদের থেকে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা হারায় এবং ভারতীয় পণ্য হিসেবে এর আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হয়। যেমন, ডাক্কার জামদানি স্কার্ফ *Great Exhibition of the Works of Industry of All*

Nations-এ প্রদর্শিত হয় (১৮৫১ : ১৫৯)। ১৮৬২ সালে লন্ডন এক্সিবিশনে জামদানি স্কার্ফ প্রদর্শিত হয় (ডাউলিনস : ১)। ১৮৬৫ সালে ডাবলিন আন্তর্জাতিক এক্সিবিশনে জামদানি মসলিন ও জামদানি স্কার্ফ ৬৭৯ ও ৬৮০ নম্বরে প্রদর্শিত হয় (নির্বাহী কমিটি ১৮৬৫ : ৫২)। ১৮৬৫ সালে নিউজিল্যান্ড এক্সিবিশনে জামদানি শাড়ি ৮৪৭ নম্বর প্রদর্শিত হয় (ওয়াটসন ১৮৬৫)। উল নির্মাণের (১৮৭৬) ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন জামদানিকে ৩১৮ নম্বরে 'ঢাকার সবচেয়ে দামি, সূক্ষ্ম ও জটিল ডিজাইনের মসলিন' হিসেবে বর্ণনা করেছেন (জাতীয় উল নির্মাণ সমিতি ১৮৭৬ : ১৮৭)।

প্রাচীনত্ব এবং বিবর্তন

যেহেতু জামদানি ঢাকা মসলিনের একটি সূক্ষ্ম পণ্য এবং ইতিহাসে জামদানির উত্থান সম্পর্কে বলা হয়নি, তাই এর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে বেঙ্গল মসলিনের রেফারেন্স দেখতে হবে। নিচের লেখাটি তৃতীয় শতাব্দীর Diogenes Laërtius-এর গ্রিক লেখা থেকে নেওয়া :

> যখন ফালেরামের দিমিত্রি তাকে রুটি এবং ওয়াইন পাঠালেন তিনি তাঁকে নিন্দার সঙ্গে বললেন, 'ওহ স্প্রিংস পানিসহ রুটি বদলে দিয়েছে। এটা পরিষ্কার যে তিনি পানি পান করেছিলেন। যখন পুলিশ এটা আবিষ্কার করল যে মসলিন পরার কারণে এ সমস্যা হয়েছে তার উত্তর ছিল, আমি আপনাকে দেখাতে পারি যে থিওফ্রস্টাসও মসলিন পরেছেন।' (হিকস ১৯৭২ : ৯১)

প্রাচীন বুদ্ধিজীবীরা কিছু সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে মসলিন ব্যবহার করতেন। এটা নির্দিষ্ট নয় যে এটা বাংলার মসলিনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কি না কিন্তু গ্রিকরা বাংলার মসৃণতম কাপড় ব্যবহার করতেন (গিলরয় : ৩৩৪)। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পূর্ব বাংলার সূক্ষ্ম কাপড়ের উল্লেখ রয়েছে। টলেমির সময় রোম ও মিসরে এই অঞ্চলের পণ্যের ভালো সুনাম ছিল। নবম দশকে আরব ভূগোলবিদ সুলায়মান, চৌদ্দ শতকে মরক্কোর ইবনে বতুতা, পনেরো শতকে কিছু চীনা লেখক, ১৬ শতকে মোগল সাম্রাজ্যের লেখক আবুল ফজল বাংলাদেশের মসলিনের অনেক প্রশংসা করেছেন (করিম : ৩-৫)। ষোলো শতকের শেষে আবুল ফজল ও রালফ ফিচ সোনারগাঁকে মসৃণ তুলা উৎপাদনের জায়গা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। পাতলা ও ফুলেল কাপড় শহর (ঢাকা) ও দেশের সর্বত্র মসলেন তাঁতিরা তৈরি করে (টেইলর ১৮৫১ : ৮)। ঔপনিবেশিক সাহিত্যে মসলিনের মান ও ঢাকার মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট।

ক্লাসিক্যাল মসলিন যুগ ও মধ্যযুগীয় জামদানি যুগের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম লাইন রয়েছে কিন্তু এমনও হতে পারে, মোগলরা আসার আগেই জামদানির উদ্ভব হয়েছে।

আমি বলব, এটি বাংলাদেশের ঐতিহাসিক মুহূর্তে এসেছে। টম পেরেস, যিনি ১৫১০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে এসেছিলেন, বলেন :

> বাঙালিরা ভাগ্যবান বণিক, যারা আবর্জনায় পাল তোলে। ফারসি, রোম, তুর্কি ও আরবের বড় অংশ এবং চউল, দাভল ও গোয়ার বণিকেরা বাংলায় বাস করে (পেরেস ২০০৫ : ৮৮)।

ওপরের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, বাংলাদেশ মুসলিম শাসনের সময় থেকে ভারত মহাসাগরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ছিল এবং শুধু এশিয়ান বণিকেরাই এখানে বসতি স্থাপন করেননি, বাঙালিরাও করেছে। এটি একটি বিশ্বজনীন মুহূর্তে গোল্ডেন পোর্ট সোনারগাঁয়ে যাত্রা শুরু করেছে, যা চীনের ভারতে যাওয়ার পথ ছিল (মুখার্জি ২০১১ : ৪৩)। মোগলরা জামদানি উৎপাদন নিখুঁত করে তোলে, যা ঢাকার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও পরিবেশে জায়গা করে নিয়েছে।

জামদানি বাণিজ্য

ভৌগোলিক নির্দেশনার দিক থেকে পণ্য বিশ্লেষণের জন্য বাণিজ্য পরিসংখ্যানের ইতিহাস বোঝার গুরুত্ব রয়েছে। মধ্যযুগীয় জামদানি সম্পর্কে আমাদের কাছে স্পষ্ট পরিসংখ্যান নেই। শুধু ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে কিছু বিক্ষিপ্ত তথ্য রয়েছে, তখন থেকে বাণিজ্যের পরিমাণ কমছে। হোসাইন (২০১০ : ১৫১) বেঙ্গল কমার্শিয়াল রেকর্ড ১৭৯৫-১৮০২ থেকে দেখান যে ঔপনিবেশিক আমলে জামদানি একটি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি পণ্য ছিল। ১৭৯৯ সালে ব্রিটিশ লাইব্রেরি থেকে একটি তালিকা তৈরি করেন, যেখানে জামদানিসহ পাঁচ হাজার কাপড় ঢাকা আড়ংয়ের মধ্যে গৃহীত হয়েছে। মনে রাখা উচিত, ওই সময়ে জামদানির মহিমান্বিত দিন শেষ হয়ে এসেছে। উনিশ শতকে মসলিন বাণিজ্যের হ্রাসের সময় টেইলর (১৮৪০) ১ হাজার ৭০০ তাঁতি পরিবার খুঁজে পেয়েছেন এই অঞ্চলে। এই শতাব্দীতেই জামদানির আরও পতন ঘটে। ১৯৬১-৬২ সালের একটি জরিপে নারায়ণগঞ্জের তারাবতে ১ হাজার ৪৫৯টি জামদানি এবং অন্য আরেকটি ১৯৬৭ সালের জরিপে ১ হাজার ১৭৩টি ছিল, যা ২০ শতাংশ কম (ইপিএসআইসি ১৯৬৭ : ৯)।

সব মতভেদ সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক আমলে জামদানি সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং মুহূর্ত পার করেছে এবং ঔপনিবেশিক আমলের পরে ধীরে ধীরে বিশেষত নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশের বাজার বিমুক্তকরণের সময় এর পুনর্জাগরণ ঘটেছে। ২০০০ সালের হিসাব অনুযায়ী, ১ হাজার ৬০০ জন তাঁতি, যা ২০১৩ সালের হিসাব অনুযায়ী ১৫ হাজার জন, তিন হাজার পরিবার আছে। একই বছর জামদানি শিল্প ১৫ হাজার ৫০০টি ইউনিট ব্যবহার করেছে (সুমন ২০১৩)। সরকারি প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের মতে, বেনারসি/ জামদানি বয়ন ইউনিটের মোট সংখ্যা ১২ হাজার ৩৮৩।[৪] এটা অনুমান করা হয় যে প্রতি সপ্তাহে এই অঞ্চলে দুই হাজার পিস জামদানি শাড়ি উৎপাদন হয়। শাড়ির দাম ৫ হাজার থেকে ৪০ হাজার টাকার মধ্যে। বিশেষভাবে তৈরি শাড়ি ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত হয়। দেশের চাহিদা পূরণের পর জামদানি শাড়ি দক্ষিণ এশিয়া, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আমেরিকায় রপ্তানি হয়। জামদানির ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে বিডব্লিউপিএমবিএ ২০১১ সালে বাংলাদেশ তাঁতবস্ত্র মেলা আয়োজন করে, যেখানে তাৎক্ষণিক অর্ডার ছিল শূন্য দশমিক ১২ বিলিয়ন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বাংলাদেশ থেকে জামদানির নেতৃস্থানীয় আমদানিকারক ভারত। ২০১০-১১ অর্থবছরে ভারতে বাংলাদেশের জামদানি রপ্তানি ৬ দশমিক ১২ মিলিয়ন ডলার যেখানে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে তা ছিল ১ দশমিক ৪৯ মিলিয়ন ডলার।[৫] এটা ধরা হয়, ভারতে জামদানি আরও রপ্তানি হয়, যার কোনো অফিশিয়াল তথ্য নেই। মোট জামদানি রপ্তানির আয় ভারতসহ ২০০৮-৯ সালে ৪ দশমিক ৮ মিলিয়ন ডলার থেকে ২০১০-১১ সালে ১০ দশমিক ৪১ মিলিয়ন ডলার।[৬]

এই সব পরিসংখ্যান ঢাকার জামদানিশিল্পের উন্নয়ন নির্দেশ করে।[৭] একটি শক্তিশালী ও ভৌগোলিক ভিত্তি, সাংস্কৃতিক দক্ষতা ও অনুশীলনের মাধ্যম ছাড়া এই পণ্য তৈরি করা সম্ভব না।

জিআই পলিসির প্রভাব : জামদানি, ঢাকাই জামদানি নাকি উপ্পাদা জামদানি?

ভারত ২০০৯ সালে অন্ধ্র প্রদেশ থেকে উপ্পাদা জামদানি শাড়ি নিবন্ধন (সিরিয়াল নং ১০৬ এবং আবেদন নং ১২২) করেছে। এই আলোচনায় দেখা যায়, ঢাকা ছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে জামদানি উৎপাদনের জন্য পৃথিবীর অন্য কোথাও ভৌগোলিক, পরিবেশগত, ঐতিহাসিক ও বাণিজ্যিক অবস্থা নেই (শহীদ : ৫৮)। সম্প্রতি কিছু প্রকাশনী ছাড়া অন্য কোনো লেখালেখিতে ঢাকাই জামদানির কোনো উল্লেখ নেই। এখন প্রশ্ন, কী দেখে বোঝা যায় যে জামদানির মূল ভিত্তি ঢাকায়? জামদানির উৎপত্তি অবশ্যই ঢাকায় কিন্তু ঢাকাই জামদানি নামে পরিচিত হতে পারে না। অন্য কথায়, ঢাকা ও জামদানি সমার্থক কিন্তু তার পরও ভারতের উপ্পাদা জামদানির ভৌগোলিক নির্দেশনা আইনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন বেআইনি এবং ট্রিপস চুক্তির লঙ্ঘন।

আমরা কিছু কারণে ঢাকাই জামদানি নামের সঙ্গে একমত নই। প্রথমত, বৃহত্তর ঢাকা জামদানি উৎপাদনের মূল স্থান ছিল, তাই জামদানি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঢাকার ভৌগোলিক নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত এবং কোনো ভৌগোলিক অবস্থানের প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়ত, ঢাকাই জামদানি নামটি অন্য দেশকে এর ভৌগোলিক

অবস্থান সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তৃতীয়ত, বিভিন্ন ঐতিহাসিক সময়ে ঢাকার জায়গা বদল হয়েছে কিন্তু আমরা নিশ্চিত না তখন এই অঞ্চলের নাম ঢাকা ছিল কি না (ইকবাল : ২০১১)।

শেষ কথা

জামদানির ঢাকার ভৌগোলিক নির্দেশনা প্রশংসাপত্র ভারতের স্টেকহোল্ডারদের দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। জনাব ঘনশ্যাম সারোদ তাঁর উইব্লগে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন যে জামদানির উৎপত্তিস্থান ঢাকায় এবং উপ্পাদা জামদানি একটি নতুন ব্র্যান্ড তৈরিতে সহায়ক হতে পারে।[৮] ইউনেসকো সম্প্রতি জামদানিকে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।[৯]

যত দূর উপ্পাদা সম্পর্কে বলা যায়, এটি অন্ধ্র প্রদেশের একটি গ্রাম, যা রেশম পণ্যের জন্য পরিচিত কিন্তু জামদানির সঙ্গে ঐতিহাসিক সংযোগ পাইনি। প্রকৃতপক্ষে গত দুই দশকে জামদানির কিছু নকশা উপ্পাদায় ব্যবহার করা হয় এবং উপ্পাদা জামদানি নামটি সম্প্রতি উদয় হয়েছে, যদিও জামদানির সঙ্গে এর কোনো সংযোগ নেই। নিচের কথাটি একে সমর্থন করে :

> দ্বিতীয় পরিবর্তনটি হলো শাড়িতে জামদানি নকশা ব্যবহার করা হয়। উপ্পাদায় জমিনে নকশা করা হয় এবং পাল্লু/ আঁচলে জরির নকশা করা হয়। এটা খুব জনপ্রিয়তা পায়।[১০]

জামদানির ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে আমাদের গবেষণা দেখায় যে ঢাকাই একমাত্র উৎপাদনক্ষেত্র। এখন বাংলাদেশে ভৌগোলিক নির্দেশনা আইন পরিচিতি পেয়েছে এবং বিশ্বসম্প্রদায় একে বাংলাদেশের পণ্য বলেছে, বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা একে ঢাকার নিজস্ব পণ্য হিসেবে পুনঃস্থাপন করার উদ্যোগ নেবে বলে আশা করা যায়।

তথ্যসূত্র

১. http://www.bhb.gov.bd/statistics.php

২. Interview taken in Panam Nagar (Sonargaon) by Sahida Khandaker and Abdus Samad. 20 September 2013

৩. Interview taken in Panam Nagar (Sonargaon) by Sahida Khandaker and Abdus Samad. 20 September 2013

৪. http://www.bhb.gov.bd/statistics.php

৫. 'Country's Jamdani Sarees gaining popularity among Indian women,' *The Financial Express*, June 6, 2012.

৬. Ibid.
৭. http://news.priyo.com/business/2011/08/15/jamdani-fair-gets-tk-012b-expo-34687.html
৮. http://sarode1.wordpress.com/2009/05/07/ghanshyam-sarode/
৯. http://archive.thedailystar.net/beta2/news/jamdani-recognised-as-intangible-cultural-heritage-by-unesco/
১০. Kanakalantha Mukund and B. Syama Sundari, *Traditional industry in the new market economy: the cotton handlooms of Andhra Pradesh* (Delhi: Sage Publications, 2001) p. 108.

অনুবাদ সহযোগীতায় : জোশিতা জিহান

জ্ঞানসারথিকে শ্রদ্ধা

বাগান থেকে মহাকাশ

মীজান রহমান

[জ্ঞানচর্চার সঙ্গে যুক্ত এমন খুবই কম সংখ্যক বাংলাদেশি ব্যক্তি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অধ্যাপক মীজান রহমান তেমনই এক ব্যক্তি, যিনি আজীবন জ্ঞানচর্চায় সম্পৃক্ত ছিলেন। মূলত তিনি গণিতবিদ। তবে গণিতবিদ্যা ছাড়াও বাংলাদেশের যে কয়জন একাডেমিয়ার সঙ্গে যুক্ত শিক্ষাবিদ আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়েছেন, বাংলাদেশকে পরিচিত করতে পেরেছেন দর্পভরে বিশ্বের অঙ্গনে তার মধ্যে মীজান রহমান অন্যতম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ছিলেন তিনি; এরপর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে (এমএ) এবং কানাডার ব্রান্সউইকে (পিএইচডি)। তারপর সেই ১৯৬৫ সালে কানাডার অটোয়াস্থ কার্লটন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় যোগ দিয়েছিলেন, সেখানে একটানা প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের গণিতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সেরা শিক্ষকের সম্মানসহ বহু সম্মানেই তিনি ভূষিত হয়েছেন।

শুধু শিক্ষক হিসেবে তিনি খ্যাতিমান তা নন, শিক্ষায়তনে সাফল্য পেতে হলে যা যা দরকার, সবই তাঁর ঝুলিতে ছিল। গণিতের বিখ্যাত জার্নালগুলোতে খুঁজলেই যে কেউ পাবেন তাঁর অসংখ্য গবেষণাপত্রের হদিস; পাশাপাশি কিছুদিন আগে গণিতশাস্ত্রের পণ্ডিত জর্জ গ্যাসপারের সঙ্গে লিখেছেন মহামূল্যবান একটি পাঠ্যপুস্তক বেসিক হাইপারজিওমেট্রিক সিরিজ (১৯৯০) শিরোনামে, যেটা প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়েই গণিতের ছাত্রদের জন্য অবশ্যপাঠ্য পুস্তক হিসেবে বিবেচিত।

ড. মীজান বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা অধ্যাপক আলবার্তো গুনবাম এবং নেদারল্যান্ডসের গণিতবিদ এরিখ কোয়েলিংক প্রমুখের সঙ্গেও গণিতবিষয়ক বহু গবেষণা করেছেন। গণিতে তাঁর অবদান এতটাই বিস্তৃত ছিল যে ১৯৯৮ সালে কানাডার ওই বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেওয়ার পরেও তাঁকে 'ইমেরিটাস অধ্যাপক' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

অধ্যাপক মীজান পরে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'Distinguished Research Professor'-এর খেতাবও পেয়েছিলেন। উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রিচার্ড এশকি নাকি তাঁকে সিম্বলিক ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে 'মাস্টার' হিসেবে ডাকতেন। গণিত

বিষয়ে বাংলাদেশের কিংবদন্তির তালিকা কেউ বানাতে বসলে মীজান রহমানকে বাদ দিয়ে সেটা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

কিন্তু গণিতের কাঠখোট্টা জগতের বাইরেও তাঁর আরেকটা পরিচিতি ছিল। তিনি ছিলেন সুসাহিত্যিক। তাঁর প্রথম দিককার উপন্যাস *লাল নদী* (২০০১) পড়ে আলোড়িত হয়েছিলাম সে সময় যা এক সমাজসচেতন প্রগতিশীল সুলেখকের প্রতিচ্ছবি। আরও কিছু বই রয়েছে *তীর্থ আমার গ্রাম, প্রসঙ্গ নারী, অ্যালবাম, অন্যান্য আমার দেশ, আনন্দ নিকেতন, দুর্যোগের পূর্বাভাস, ভাবনার আত্মকথন, শুধু মাটি নয়* প্রভৃতি। (তাঁর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন অভিজিৎ রায়ের 'অধ্যাপক মীজান রহমান : এক নক্ষত্রের মহাপ্রয়াণ')। অধ্যাপক মীজান রহমান শুধু একজন গণিতবিদ ও শিক্ষাবিদ ছিলেন না। তিনি একই সঙ্গে মুক্তচিন্তক ও সমাজসচেতন। *প্রতিচিন্তা*র প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। দূর থেকে এ উদ্যোগের তিনি একজন শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। মৃত্যুর ছয় মাস আগে *প্রতিচিন্তা*র জন্য তিনি এ লেখাটি পাঠিয়েছিলেন। *প্রতিচিন্তা* মূলত সমাজবিজ্ঞানবিষয়ক জার্নাল। তাই তাঁর লেখাটি ছাপার ব্যাপারে আমাদের দ্বিধা ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর এই লেখাটি ছাপার মধ্য দিয়ে তাঁর বহুমাত্রিক জ্ঞান অনুশীলনের প্রতি রইল, আমাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। সম্পাদক]

এক.

ছোটবেলা থেকেই দুটি ফলবৃক্ষের গল্প শুনে এসেছি আমরা। একটি আদম-হাওয়ার 'নিষিদ্ধ' ফলের গল্প, আরেকটি আইজ্যাক নিউটনের গাছ থেকে আপেল পড়ার গল্প। 'নিষিদ্ধ' ফল বলতে যে আসলে 'জ্ঞান' বোঝায়, সেটা বুঝতে বেশ সময় লেগেছিল, যদিও সে যুগের (এবং এ যুগেও) লোকেরা প্রায় আক্ষরিক অর্থেই মেনে নিয়েছিলেন গল্পটা (এবং যার সত্যতা বিষয়ে ধর্মগুরুরা যেমন নিঃসন্দেহ, আধুনিক বিজ্ঞানীরা ঠিক তেমনই সন্দিহান)। তবে আপেলের গল্পটি তুলনামূলকভাবে অনেক ইহজাগতিক। অতএব, বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু আসলেই কী ঘটেছিল ব্যাপারটা? আসলেই কি নিউটনের মাথাবরাবর হতভাগা আপেলটি পড়ে গিয়েছিল গাছ থেকে?

মহৎ লোকদের নিয়ে চুটকি-চাটকি গল্প সবারই পছন্দ। আলবার্ট আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব আমরা কজন বুঝি, সেটা ভাবার বিষয়, কিন্তু তাঁর কাল্পনিক যানে করে মহাকাশ ভ্রমণের চিত্তাকর্ষক কাহিনি শুনতে কার না ভালো লাগবে বলুন। এটা চমক লাগানোর মতো গল্প তো বটেই যে বড় ভাই শূন্যে ভ্রমণের পর থেকে ফিরে এসে দেখেন ছোট ভাইয়ের বয়স তাঁর চেয়ে বেশি! এর চেয়ে বড় বিস্ময় আর কী হতে পারে! আপেক্ষিক তত্ত্বের এটুকু রহস্যই আমাদের জন্য যথেষ্ট—আইনস্টাইন চিরকালের জন্য আমাদের মনে গেঁথে রইলেন। সত্য-মিথ্যা কী আসে-যায়! গল্প মজার হলেই হলো।

প্রাচীন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত ছিলেন সিরাকিউজের গ্রিক পণ্ডিত আর্কিমিডিস (খ্রিষ্টপূর্ব ২৮৭-২১২)। একাধারে পদার্থবিদ, প্রকৌশলী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং সর্বোপরি সে সময়কার শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ। কিন্তু সাধারণ মানুষ

তাঁকে মনে রেখেছে কীভাবে? একটি শব্দ দিয়ে : 'ইউরেকা'। মানে, 'পেয়েছি'। আর মনে রেখেছে শব্দটা উচ্চারণ করতে করতে তাঁর বিবস্ত্র হয়ে বেরিয়ে পড়া বাড়ি থেকে। আমরা সাধারণ মানুষ যেমন লাখ টাকার লটারি জিতে ফেলতে পারলে ন্যাংটা হয়ে রাস্তায় বেরোনোর উপক্রম হই, তিনি সে রকম কোনো লটারি জেতেননি, কেবল একটা বড় আইডিয়া মাথায় এসে গিয়েছিল টবের পানিতে স্নানরত অবস্থায়। গল্পটা রসাল তাতে সন্দেহ নেই এবং সাধারণ মানুষের জন্য সেটাই যথেষ্ট। কার কী গরজ পড়ে গেছে জানার যে তিনি ছিলেন প্রকৌশলীদের অবশ্যপাঠ্য বিষয় স্ট্যাটিকস ও হাইড্রোস্ট্যাটিকসের জনক, ছিলেন পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব তত্ত্বের (specific gravity) উদ্ভাবক এবং এই আপেক্ষিক গুরুত্বের আইডিয়াটিই তাঁকে উত্তেজনার চরম শিখরে পৌঁছে দিয়ে গোসলের জায়গা থেকে বের করে দিগম্বর অবস্থায় রাস্তায় নিয়ে গিয়েছিল। অনেকে হয়তো জানেও না যে রোমানদের বিরুদ্ধে গ্রিকপক্ষের যুদ্ধকালে এক মূর্খ রোমান সেনার অস্ত্রাঘাতে এই মহান ব্যক্তিটির প্রাণহানি হয়েছিল।

আইজ্যাক নিউটনের আপেলপতনের গল্পটি তেমন মজাদার না হলেও একটা চমকপ্রদ রোমান্টিকতা ছিল এতেও। আপেলের বাগান, তরুণ নিউটন ঘাসের ওপর শুয়ে শুয়ে ডুবে আছেন তাঁর কল্পনার জগতে। এমন সময় গাছ থেকে টুপ করে একটা পাকা আপেল পড়ে গেল ঠিক তাঁর কপাল বরাবর। আর অমনি দৈববাণীর মতো তাঁর মাথায় উদয় হলো এক অসাধারণ চিন্তা—তাই তো, এ তো মহাবিশ্বব্যাপী এক গূঢ় মহাশক্তির উপস্থিতিকে ঘোষণা করছে; অনেকটা যেন ধর্মগ্রন্থের অহি নাজিলের মতোই প্রেরণা জাগানো। আসলে নিউটন নিজেই নাকি ওই আপেলবৃক্ষটিকে আদিসৃষ্টির সেই বাইবেল-বর্ণিত 'জ্ঞানবৃক্ষ' বলে ধারণা করে বসেছিলেন (গল্পটি বিশ্বাসযোগ্য না হলেও এটা সত্য যে মহামতি নিউটন অতিশয় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন এবং প্রচলিত ভূতপ্রেতজাতীয় গল্পের প্রতি যথেষ্ট দুর্বলতাও ছিল তাঁর)। যা-ই হোক, এ নিবন্ধের প্রাথমিক আলোচ্য বিষয় হলো গল্পগুলো কতখানি সত্য এবং কতটুকুই-বা পুরোপুরি বানোয়াট। নিউটনের বাগানে কি সত্যি সত্যি আপেল পড়েছিল তাঁর মাথায়? নাকি আর্কিমিডিসের গল্পের মতোই সন্দেহসংকুল?

সম্ভবত আপেলের ঘটনাটি আসলেই ঘটেছিল নিউটনের গ্রামের বাড়িতে। তাঁর অন্তত দুটি ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। প্রথম সাক্ষ্য এসেছে তাঁরই ভাইঝির স্বামী জন কনডুইট নামক এক যুবকের লিখিত বয়ান থেকে—কনডুইট পরবর্তীকালে স্যার আইজ্যাক নিউটনের সহযোগী ছিলেন ইংল্যান্ডের টাঁকশালায় পরিচালকের পদে নিযুক্ত থাকাকালে। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী, ১৬৬৬ সালে ব্রিটেনের ব্যাপক মহামারির সময় নিউটন কেমব্রিজ থেকে তাঁর গ্রামের বাড়ি লিঙ্কনশায়ারে মায়ের

কাছে চলে গিয়েছিলেন। ছুটিছাটায় বরাবরই তা করতেন তিনি। একদিন ভাবাকুল অবস্থায় বাগানে হাঁটাহাঁটি করার সময় গাছ থেকে একটি পাকা আপেল টুপ করে মাটিতে পড়ে তাঁর চোখের সামনে। আর অমনি তাঁর মন ছুটে গেল অন্য জগতে। এই পড়াটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মনে হলো তাঁর কাছে। নিচে পড়ছে কেন? এবং ঠিক লম্বালম্বিভাবে, কোনাকুনি বা আঁকাবাঁকা হয়ে নয়। এ থেকে তিনটি জিনিস প্রতীয়মান হয়ে উঠল তাঁর মনে। এক. আপেল নিচে পড়ে, ওপরে ওঠে না, কারণ নিচের দিকেই আকর্ষণধর্মী একটা শক্তি তাকে টেনে নেয়। দুই. কোনাকুনি বা বাঁকানো পথে পড়ে না, তার কারণ আকর্ষণটি পৃথিবীর ঠিক কেন্দ্রের দিকে। অর্থাৎ, মাধ্যাকর্ষণ একটি কেন্দ্রিক শক্তি (central force), যার একটা গভীর তাৎপর্য আছে। তিন. এই আকর্ষণ কেবল আপেলের বেলায় কাজ করে তা নয়, এটাই বিশ্বপ্রকৃতি—সব বস্তুর ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। প্রতিটি ভরযুক্ত বস্তুই আসলে একে অন্যকে এভাবে আকর্ষণ করে। ছোট বস্তুর বেলায় এটা লক্ষণীয় নয়, বড় বস্তু, যেমন ভূমণ্ডল, সে ক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষণীয়।

দ্বিতীয় সাক্ষ্য আমরা পাই নিউটনের ব্যক্তিগত বন্ধু (লোকটার বিশাল প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল বটে সমগ্র দেশে, কিন্তু বন্ধুসংখ্যা ছিল হাতে গোনার মতো) উইলিয়াম স্টুকলি (১৬৮৭-১৭৬৫) ও বিশিষ্ট জীবনীকার ও ইতিহাসবিদ, তাঁর বিখ্যাত বন্ধুর জীবনীতে লিখে গেছেন যে আপেলের গল্পটি তাঁর বন্ধুর নিজের মুখ থেকে শোনা—১৭২৬ খ্রিষ্টাব্দে, অর্থাৎ নিউটনের মৃত্যুর এক বছর আগে লন্ডনের কেনসিংটন পার্কে বসে দুজনে ঘনিষ্ঠ আলাপ করাকালে। এবং তাঁর বর্ণনার সঙ্গে জন কনডুইটের বর্ণনা প্রায় হুবহু মিলে যায়। তাতে মনে হয়, বিজ্ঞানের অন্তত এই গল্প হয়তো একেবারে মনগড়া নয়।

কিন্তু তার পরও প্রশ্ন থেকে যায়। বিজ্ঞানের তো ধারাই এটা। কোনো কিছুই চূড়ান্তভাবে মিটে যায় না। আপাতদৃষ্টিতে একটা প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেলে নতুন প্রশ্ন সৃষ্টি হয়, অনেক সময় সেই সমাধান থেকেই প্রশ্নের উদ্রেক হয়। আপেলের ঘটনা সত্য হলেও প্রশ্ন ওঠে, সর্বজনীন মাধ্যাকর্ষণের ধারণাটা কি হঠাৎ করে দৈববাণীর মতো পেয়ে গিয়েছিলেন নিউটন, না, আগেও একটা ইতিহাস ছিল বা ছিল কোনো বৈজ্ঞানিক আভাস-ইঙ্গিত। সাধারণত, বিজ্ঞানের কোনো বড় আইডিয়া হঠাৎ করে আকাশ থেকে পড়ে যায় না। প্রচণ্ড রকম মেধাবী কোনো ব্যক্তি একদিন ঘুম থেকে উঠে 'ইউরেকা' 'ইউরেকা' বলে ঘরের বাইরে চলে যান না তাঁর সদ্যপ্রাপ্ত বৃহৎ আইডিয়া নিয়ে। বিজ্ঞানের রীতিটাই এমন যে সব সৃষ্টির পেছনেই একটা দীর্ঘকালীন প্রস্তুতি লাগে, লাগে একটা চিন্তাভাবনার ধারাবাহিকতা, সেটা মৌলিক চিন্তাই হোক আর যৌক্তিক চিন্তাই হোক। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের পেছনে ৩০০ বছর আগে ছিলেন গ্যালিলিও গ্যালিলি, যাঁর নিজেরও এক

প্রকার আপেক্ষিক তত্ত্ব ছিল, যা আইনস্টাইনের চিন্তাজগতে যথেষ্ট খোরাক জুগিয়েছিল। তদুপরি ছিল নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব, যা না থাকলে চট করে এত সব যুগান্তকারী ভাবনা তাঁর মাথায় প্রবেশ করার সুযোগ পেত কি না সন্দেহ। শুধু তা-ই নয়, তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে বড় সহায় অন্য বিজ্ঞানীদের তত্ত্বকথা নয়, ফলিত বিজ্ঞানীদের পরীক্ষালব্ধ ল্যাবরেটরিজাত তথ্যসমূহ।

নিউটন কেবল মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্বই উপলব্ধি করে ক্ষান্ত হননি, তার প্রকৃতিও পূর্ণভাবে নিরূপণ করে গিয়েছিলেন। দুটি বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে ঠিকই, কিন্তু সেই আকর্ষণের মাত্রা কমতে শুরু করে বস্তুদ্বয়ের দূরত্বের সঙ্গে, ওটা প্রায় সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝার মতো, কিন্তু এই কমে যাওয়ার পরিমাণটা যে দূরত্বের বিপরীত বর্গের অনুপাতে, সেটা বুঝে ফেলা কিন্তু চাট্টিখানি কথা নয়। নিউটন সেটা বুঝতে পেরেছিলেন সহজেই। কিন্তু কীভাবে বুঝেছিলেন এবং তিনিই প্রথম ব্যক্তি কি না বিপরীত বর্গনীতি আবিষ্কারের, তারও একটা পশ্চাৎকাহিনি আছে।

মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে মানুষের কৌতূহল আজকের নয়, পুরাকাল থেকেই। বর্তমান যুগে আমরা যেমন অমাবস্যার রাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে অবাক বিস্ময়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল আর নক্ষত্ররাজির মিটিমিটি আলোর রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করি, আদিযুগের মানুষও ঠিক একইভাবে তারাদের গতিবিধি বোঝার চেষ্টা করতেন। এ যুগে আমাদের হাতে হাজারটা যন্ত্র আছে দূর দূর নক্ষত্র, যা খালি চোখে দেখা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়, সেটা দুরবিন দিয়ে অনায়াসে দেখতে পারার। সে যুগের মানুষ তাই খালি চোখে যা দেখতেন, তারই ওপর ভরসা করে প্রকৃতির ধারা-প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেতেন। তাঁরা দেখতেন চন্দ্রগ্রহ কীভাবে প্রতি মাসে নিয়মিত উদয় হচ্ছে আকাশে ছোট্ট কাস্তের আকারে, তারপর দুই সপ্তাহের মধ্যে বৃদ্ধি পেতে পেতে পূর্ণ গোলাকার মূর্তিতে আকাশ-পাতাল উজাড় করে দিচ্ছে আলোয় আলোয়। সেই যে সুনির্দিষ্ট সময়ান্তর প্রতি মাসে একইভাবে উদয় হওয়া, পূর্ণ হওয়া আবার বুজে যাওয়া, সেই পর্যবেক্ষণ থেকেই জন্ম নেয় চান্দ্র বৎসর। প্রাচীন যুগে প্রায় সব দেশেই চান্দ্র বৎসরের ব্যবহার ছিল। এখন কোথাও তা ব্যবহার করা হয় না, যদিও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে প্রায় প্রতিটি মুসলিমপ্রধান ও ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলে চান্দ্রিক বৎসর অবধারিতভাবে প্রচলিত আজ পর্যন্ত। ইহুদিদের ইহুদি পঞ্জিকা আর মুসলমানদের হিজরি পঞ্জিকা পুরোপুরিই চন্দ্রানুসারী।

আধুনিক যুগে যেমন পাশ্চাত্য সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রেই অগ্রসর প্রাচ্যের অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায়, মধ্যযুগের আগ পর্যন্ত পরিস্থিতি ছিল ঠিক তার বিপরীত—পশ্চিমই বরং ছিল অনেক পশ্চাতে। বিশেষ

করে ভারত, চীন এবং সর্বোপরি মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের তুলনায়। সে সময় ইসলামিক সভ্যতার স্বর্ণযুগ—জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্ববিষয়ে তাঁরাই ছিলেন নেতৃস্থানীয়। ওদিকে ভারতের প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ আর্যভট্ট ৪৯৯ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বকেন্দ্রিক ব্রহ্মাণ্ডের পরিবর্তে একটি সূর্যকেন্দ্রিক ব্রহ্মাণ্ডের মডেল তুলে ধরলেন সর্বসমক্ষে। শুধু তা-ই নয়, তিনি এও বললেন যে পৃথিবী কেবল সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণই করে না, প্রতিদিন নিজেরই একটা কক্ষপথে একবার করে ঘুরপাক খায়। তারপর ১০০০ সালে আরব জগতের বিখ্যাত গবেষক আবু রায়হান বিরুনি প্রায় একই প্রস্তাব দাঁড় করালেন সুধীসমাজে, সম্ভবত আর্যভট্টের ঘোষণা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত থেকেই (সেকালে ইন্টারনেটের গুগুল সার্চ মেশিন দূরে থাক, কাগজের ব্যবহারই শুরু হয়নি)। দুঃখের বিষয় যে পরবর্তী সময়ে বিরুনি তাঁর অগ্রমুখী মতামত থেকে দূরে সরে গিয়ে গতানুগতিক বিশ্বাস, অর্থাৎ বিশ্বকেন্দ্রিকতা এবং চান্দ্র বৎসরে ফিরে গেলেন। তারপর ১৩০০ সালের দিকে নাজম আল-দিন আল-কাতিবি নামে এক গবেষক নানা রকম ছবিটবি এঁকে প্রমাণ করতে চাইলেন যে পৃথিবী আসলেই সূর্যের চারদিকে ঘোরে, উল্টোটা নয়। কিন্তু তিনিই-বা কী কারণে বিরুনির মতো গতানুগতিক ধারায় ফিরে গেলেন, সেও এক রহস্য বটে।

এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা কি সব বিফল ছিল তাহলে? একবার এটা, একবার ওটাতে বিশ্বাস করে তাঁরা কি মানুষকে বিভ্রান্ত করছিলেন? মোটেও না। গবেষণা কখনোই ব্যর্থ হয় না, যদিও তার ফলাফল সব সময় সত্য নাও হতে পারে। দেখা গেল যে আল-কাতিবির সেই বর্জিত আঁকাজোকাগুলো বিস্তারিতভাবে ব্যবহার করেছিলেন পোল্যান্ডের নিকোলাস কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) নামের এক বিজ্ঞানমনস্ক জ্যোতির্বিদ, যদিও কথাটি স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি কোথাও (তাঁর নিজের আঁকা ছবির সঙ্গে কাতিবির ছবিগুলো অবিকল মিলে যাওয়াতেই বিজ্ঞানের ঐতিহাসিকেরা এমন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন)। কোপারনিকাসের প্রণীত গ্রন্থ *On the Revolution of Celestial Spheres* (১৫৪৩) বলতে গেলে পশ্চিমা বিশ্বে এক অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সূচনা করে। খ্রিষ্টান চার্চের তৎকালীন টলেমি ও অ্যারিস্টোটলভিত্তিক ভূকেন্দ্রিক তত্ত্বের অনড় বিশ্বাসের ভিত্তি নড়িয়ে তিনিই প্রথম স্থির বিশ্বাসের ওপর বুদ্ধি ও যুক্তির প্রাধান্য স্থাপন করে দিলেন। বইটি প্রকাশলাভের অব্যবহিত পরই তিনি মারা যান। সম্ভবত মৃত্যু তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল চার্চের অপরিসীম লাঞ্ছনা, এমনকি দৈহিক অত্যাচারের কবল থেকে। তাঁর মতামত সমর্থন করার কারণেই সমসাময়িক বেশ কজন খ্যাতনামা ব্যক্তির ভাগ্যে অসীম দুর্ভোগ নেমে এসেছিল, মহামান্য গ্যালিলিও তা থেকে রেহাই পাননি। কিন্তু চার্চ রুদ্ধ করতে পারেননি প্রগতির পথ। বুদ্ধিকে যদি তার নিজস্ব

নির্বাধ পথে অগ্রসর হতে না দেওয়া হয়, তাহলে সে জাতি আত্মদহনে কালে কালে নির্বাপিত হয়ে যেতে বাধ্য। ইউরোপীয় সভ্যতা তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। কেবল ইউরোপিয়ানই-বা বলব কেন, প্রাক-মধ্যযুগের ইসলামিক সভ্যতারও তো প্রায় একই ইতিহাস। ইসলামের যে বর্তমান বাধার দেয়াল দাঁড় করানো, জ্ঞান-সাধনার প্রতিটি ক্ষেত্রে সেই বাধা-নিষেধগুলো সে সময় ছিল না। এবং ছিল না বলেই আজকে আমরা 'ইসলামিক সভ্যতা' বলে একটা যুগের কথা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করতে পারি।

এবার আসুন আমরা সেই পুরোনো প্রশ্নে ফিরে যাই—কার আগে কে কী করেছিলেন। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এবং বিশেষ করে বিপরীত বর্গনীতি, উভয় আবিষ্কারের জন্যই আদি জনক হলেন রবার্ট হুক। অথচ নিউটন যখন তাঁর মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব এবং অন্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো সুবিন্যস্তভাবে প্রকাশ করেন ১৬৮৭ সালের ৫ জুলাই, তাতে তিনি হুক সাহেবের নাম উল্লেখ করেছিলেন বটে, কিন্তু 'জনক'-এর গৌরব তাঁর সঙ্গে ভাগাভাগি করতে প্রস্তুত ছিলেন না। বেচারা হুক। বিপরীত বর্গনীতি, আসলে কি নিউটন সাহেব নিজে থেকেই টের পেয়েছিলেন বাগানের গাছ থেকে আপেল পড়ার পর, না, তাঁর পেছনে একটা কাহিনি ছিল, যা তাঁকে সাহায্য করেছিল সেটাকে পাকাপোক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে। দেখা যায় যে রবার্ট হুক নামের এক সহব্রিটন (আমরা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষে 'হুকস ল' নামে একটা সূত্র অধ্যয়ন করেছি, তাদের কাছে নামটি মোটেও অপরিচিত নয়) মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্বন্ধে কেবল অবহিতই ছিলেন না, এ শক্তি যে বিপরীত বর্গনীতি পালন করে, সেই মর্মে পেপারও লিখেছিলেন এবং সে পেপার ব্রিটেনের সম্মানিত প্রতিষ্ঠান 'রয়েল সোসাইটি'তে পাঠ করেছিলেন ১৬৭০ সালের ২১ মার্চ। তদুপরি পেপারটি তিনি স্বয়ং আইজ্যাক নিউটনের কাছে ডাকযোগে প্রেরণ করেছিলেন ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দে। এতে কি প্রমাণিত হয় যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সত্যিকার জনক ছিলেন রবার্ট হুক, নিউটন নন? নিউটনের বৈজ্ঞানিক নিবন্ধসমূহ (মাধ্যাকর্ষণ শক্তিসহ) মুদ্রিত আকারে প্রকাশলাভ করে ১৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দে, সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*-তে। তাতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও বিপরীত বর্গনীতির আইডিয়াটির আদ্যোপান্ত ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলেন এবং হুক সাহেবের যেটুকু কৃতিত্ব প্রাপ্য বলে মনে হয়েছিল, সেটুকু স্বীকৃতি দেওয়ায় মোটেও কার্পণ্য করেননি। রবার্ট হুকের রয়েল সোসাইটিতে পড়া পেপার এবং তাঁর ব্যক্তিগত পত্র সবই তিনি উল্লেখ করেছেন, যা আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন যেকোনো গবেষকের জন্য অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং পেশাগতভাবে শোভন ও অভীষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, বিপরীত বর্গতত্ত্ব এবং এ-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের মূল

আবিষ্কারক হিসেবে তাঁর নিজস্ব দাবি প্রত্যাহার করতে রাজি ছিলেন না। তাঁর যুক্তিটা ছিল এ রকম : ঠিক আছে, মানছি যে রবার্ট হুক এবং তাঁর আগে আরও দু-একজন গবেষক এই শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করেছিলেন, এমনকি এই শক্তি যে দূরত্বের সঙ্গে বিপরীত বর্গের নিয়মে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, সেটাও তাঁদের কাজের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এই তথ্যগুলো যে সত্যি সত্যি প্রকৃতির সব পদার্থের বেলায় প্রযোজ্য, তার কোনো প্রমাণ তাঁরা দেননি। কোনো গাণিতিক গণনাকার্য দ্বারা তাঁদের সিদ্ধান্তগুলো সুদৃঢ় যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারেননি। তিনি বললেন যে তত্ত্বগুলোর নির্ভুল প্রমাণের জন্যে বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষা দরকার। যেহেতু মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণেই গ্রহ-নক্ষত্রের নিত্য এবং নিয়মিত প্রদক্ষিণ, বিশেষ করে আমাদের সৌরমণ্ডলের সূর্যের চারদিকে পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহের বার্ষিক আবর্তন, সেসব চাক্ষুষ তথ্যাবলির সঙ্গে হুবহু না হলেও অনেকাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোনো তত্ত্বই গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে না। তিনি যেসব তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন, সেই কাজ অত্যন্ত সফলভাবে করে, কিন্তু হুক বা তাঁর পূর্ববর্তী অন্য গবেষকেরা সে ধরনের পাকাপাকি কোনো যুক্তি দাঁড় করাতে পারেননি। উপরন্তু, নিউটন যুক্তিসংগতভাবেই দাবি করলেন যে তিনি বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইউহান কেপলারের (১৫৭১-১৬৩০) প্রামাণিক তথ্যসমূহ ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে তাঁর গাণিতিক ফলাফলের সঙ্গে সেগুলো সুন্দরভাবে মিলে যায়। সর্বোপরি, তিনি গণিতের যে অংশটি আবশ্যিকভাবেই ব্যবহার করেছিলেন, সেটা তাঁর আগে কেউ ব্যবহার করতে পারেননি। কারণ, তাঁর প্রণেতা নিউটন স্বয়ং ক্যালকুলাস বা কলনশাস্ত্র।

কিন্তু কেপলারের পরীক্ষিত তথ্যগুলো কী, সেটা তো বলা হলো না এখনো। কেপলার সম্পূর্ণ নিজের কল্পনাতেই সৌরমণ্ডলের গ্রহ-উপগ্রহগুলোর গতিবিধি নির্ধারণ করতে পেরেছিলেন তা নয়। সেকালের বড় মাপের জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং কেপলারের পূর্বসূরি ছিলেন টাইকো ব্রাহি (১৫৪৬-১৬০১) নামের এক অসাধারণ প্রতিভাধর বিজ্ঞানী। তাঁর জন্ম ডেনমার্কে, যদিও তাঁর জন্মস্থানটি বর্তমানে সুইডেনের অংশ। তিনি ছিলেন দুরবিনের পোকা—সারাক্ষণ দুরবিন নিয়ে মজে থাকতেন আকাশের তারাদের গতিপথ আবিষ্কারের আশায়। একটু রগচটা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন ভদ্রলোক—কারও সঙ্গেই খুব একটা সুসম্পর্ক রাখতে পারতেন না। এমনকি ডেনমার্কের রাজার সঙ্গেও রাগারাগি করে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাগ শহরে। সেখানে তাঁকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয় মনের খুশিতে গ্রহ-নক্ষত্রের দিকে দুরবিন উঁচিয়ে তাকিয়ে থাকার। বেশ বড় রকমের একটা প্রেক্ষাগৃহও তৈরি করে দিয়েছিলেন প্রাগের তৎকালীন শাসনকর্তা। একা একা সব কাজ কুলিয়ে উঠতে পারছিলেন না বলে ইউহান কেপলার নামের এক

মেধাবী জার্মান তরুণকে নিযুক্ত করলেন সহকারী হিসেবে। সেটা ছিল ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ। শুরুতেই দুই প্রতিভার ঠোকাঠুকি লেগে গেল, প্রধানত কেপলারের পারিতোষিক নিয়ে। যা-ই হোক, সেটা মীমাংসা হয়ে যাওয়ার পর দুই বিজ্ঞানী উঠে-পড়ে লেগে গেলেন সৌরমণ্ডলের সঠিক প্রকৃতি নির্ধারণ করার কাজে। ভাগ্যের এমনই লিখন যে তার ঠিক এক বছর পরই মান্যবর ব্রাহি অন্তর্ধান করেন। তাঁর অবর্তমানে প্রাগের বিচক্ষণ শাসনকর্তা কেপলারকেই নিযুক্ত করে ফেললেন ব্রাহির স্থলে। কেপলার ব্রাহির দুরবিনলব্ধ বেশ কিছু তথ্য সৌরমণ্ডলের নিয়মকানুন হিসেবে গ্রহণ করে দুটি সূত্রের ওপর আস্থা স্থাপন করেন। সেগুলো এ রকম :

১. সৌরমণ্ডলের সব গ্রহ (পৃথিবীসহ) অধিবৃত্ত পথে প্রদক্ষিণ করে সূর্যের চারপাশে (কোপারনিকাসের ধারণা ছিল, গ্রহপথগুলো বৃত্তাকার। বৃত্তের প্রতি পুরাকাল থেকেই মনীষীদের একটা দারুণ পক্ষপাতিত্ব ছিল। তাঁরা ভাবতেন যে বৃত্ত, গোলক—এগুলো হলো 'নিখুঁত', এবং যেহেতু সৃষ্টিকর্তার পরিকল্পনায় খুঁত থাকা সম্ভব নয় সেহেতু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় জ্যামিতিক আকৃতিকেও নিখুঁত হতে হবে। কোপারনিকাস নিজেও সেই আদর্শ বিশ্বাস করতেন)।

২. এই প্রদক্ষিণের বেগটা এমন যে গ্রহ থেকে সূর্য বরাবর একটি সরলরেখা আঁকতে পারলে দেখা যাবে, রেখাটি সমান সমান সময়ে সমান সমান এলাকা অতিক্রম করে যাচ্ছে।

তিনি দাবি করেন যে সূত্রগুলো দুরবিনের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ দ্বারা দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নির্ধারণ করা হয়েছে। এই ঘোষণার সময় ছিল ১৬০৯ সাল। কেপলারের তৃতীয় একটি সূত্র আছে :

৩. সূর্যের চারপাশে পুরো একবার ঘূর্ণনের জন্য যে সময় ক্ষেপণ হয় তার বর্গ হলো তার অধিবৃত্তটির পরাক্ষের অর্ধাংশ নিয়ে তার তৃতীয় মাত্রার সমানুপাতিক সম্পর্কে সংযুক্ত। এতে করে প্রতিটি গ্রহের সৌরবৎসরের সঙ্গে তাঁর জ্যামিতিক অধিবৃত্তের সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়। অর্থাৎ সূর্য থেকে দূরত্ব যত হবে, ততই লম্বা হবে তার বৎসর। সেটা হয়তো সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝে নেওয়া যায়, কিন্তু ঠিক কী নিয়মে তা ঘটে, কেপলারের দুরবিন তাঁকে সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। উল্লেখ্য, এই সূত্র পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁকে পুরো ১০ বছর ধরে চিন্তাভাবনা করতে হয়েছিল। এর প্রকাশকাল ছিল ১৬১৯ খ্রিষ্টাব্দ।

এখন কথা হলো, রবার্ট হুক কেপলারের সূত্রগুলো সম্বন্ধে জানতেন কি না কিছু। যদি-বা জেনে থাকেন, তার ব্যবহার প্রকাশ পায়নি তাঁর সপ্তদশ শতকের সপ্তম দশকের প্রকাশিত গবেষণার মধ্যে। খুব সম্ভব উপায়ও ছিল না তাঁর এবং সে কারণেই হয়তো তাঁর বৈজ্ঞানিক ঘোষণাগুলো কোনো পরীক্ষাগারিক তথ্য দ্বারা সমর্থন করতে সক্ষম হননি। নিউটন তা পেরেছিলেন। কারণ, তাঁর হাতে তখন

এক মোক্ষম হাতিয়ার তৈরি হয়েছিল, যার নাম ক্যালকুলাস, যেটা তাঁর নিজেরই আবিষ্কার। উপরন্তু, তাঁর কাছে দ্বিতীয় আরেকটি মোক্ষম অস্ত্র ছিল—বস্তুর গতিসূত্রত্রয় (Three laws of Motion), যা নিউটনের নিজেরই উদ্ভাবন। ক্যালকুলাসের সঙ্গে গতির ত্রিসূত্র ব্যবহার করে তিনি অনায়াসে দেখিয়ে দিলেন যে গাণিতিক গণনার সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিপরীত বর্গসূত্র জুড়ে দিলে কেপলারের সৌরমণ্ডলের গতিবিষয়ক তিনটি সূত্রই অনায়াসে বের হয়ে আসে, যা বর্তমান যুগের স্নাতক শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা ঘরে বসেই কষে ফেলতে পারে। ইউনিভার্সিটির ফলিত গণিতের ক্লাসে আমি নিজেও করেছি সেটা। অবশ্য নিউটন গোড়াতে যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন কেপলারের সূত্র প্রমাণ করতে, তাতে ক্যালকুলাস প্রয়োগ করা হয়নি, প্রয়োগ করেছিলেন সেকালের জনপ্রিয় জ্যামিতিক পদ্ধতি। সেটা আজকের ছেলেমেয়েদের জন্য চট করে বুঝে ফেলা সহজ হবে না। বলা যায়, তাঁর জ্যামিতিক যুক্তিগুলো বেশ জটিলই মনে হবে এ যুগের ছেলেমেয়েদের কাছে।

এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, গ্রামের বাড়ির আপেলবাগানে যখন গাছ থেকে আপেল পড়ে গেল তাঁর মস্তক বরাবর, তখন কি তিনি আগেকার গবেষকদের মাধ্যাকর্ষণবিষয়ক চিন্তাভাবনার কথা জানতেন? সে সময় তাঁর বয়স ২৪, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা ও গণিতের সেরা ছাত্র। ফ্রান্সের ইসমায়েল আর আরব বিজ্ঞানীদের কাজের কথা শুনেও থাকতে পারেন। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যে বিপরীত বর্গের আইন পালন করে, সেটা কেউ হলফ করে বলতে পারেননি। কারণ, তাঁদের কাছে কোনো প্রমাণ ছিল না। পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীরা কেউ কেউ অনুমান করে বলেছেন বিপরীত বর্গের কথা, এমনকি কেপলার এমন মতামত রেখে গেছেন যে আইনটি সম্ভবত বিপরীত বর্গ নয়, শুধু বিপরীত মাত্রাই। অর্থাৎ দূরত্ব যত বাড়বে, আকর্ষণের তীব্রতা ততই কমবে, তবে ভগ্নাংশটি ১/(দূরত্ব) অনুসারে, ১/(দূরত্ব)*২ অনুসারে নয়। সমস্যা হলো যে কেপলার সাহেবও কোনো প্রমাণ দাঁড় করাতে পারেননি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আপেলপতনের দৃশ্য থেকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রকৃতি সম্বন্ধে নিউটনের মনে যে প্রেরণা উদয় হয়, সেটা ছিল পুরোপুরি মৌলিক, কারও কাছ থেকে ধার করা নয় এবং তাতে তাঁর তীক্ষ্ণ ধীশক্তির পরিচয়ই শুধু প্রকাশ পায় না, তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণশক্তি ও অবরোহী ক্ষমতার স্বাক্ষর বহন করে। মানুষটি আপাদমস্তক একজন বিশুদ্ধ সৃষ্টিশীল প্রতিভাধর ছিলেন, যাঁর সমকক্ষ বিজ্ঞানী হাজার বছরে একজন হয় না।

আমার নিজের অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে, ছাত্রাবস্থায়, কল্পনা করেছি এমন কোন শক্তির অস্তিত্ব প্রকৃতির মধ্যে, যেখানে আকর্ষণ বা বিকর্ষণের শক্তি বর্গের নিয়মে ঘটে না, সম্পূর্ণ ভিন্ন নিয়মে চলে। অর্বাচীন মন, যৌবনের আকাশকুসুম কল্পনা।

এখন বুঝি যে প্রকৃতির নিয়মগুলো এমনই যে তার থেকে একটু উনিশ-বিশ হলেই আমাদের কোনো অস্তিত্বই থাকত না। নিউটন তাঁর সদ্য আবিষ্কৃত গাণিতিক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন যে কেপলারের সৌরমণ্ডলসংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো সত্য হলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বিপরীত বর্গ পালন করতে বাধ্য। তার উল্টোদিক থেকে ভাবতে গেলে বিপরীত বর্গের একমাত্র ফলাফলই হলো কেপলারের সূত্র নির্ভুল।

মজার ব্যাপার হলো যে এই বিপরীত বর্গের প্রতি প্রকৃতির যেন একটা বিশেষ পক্ষপাতিত্ব আছে। পদার্থের পারস্পরিক আকর্ষণের ক্ষেত্রেই কেবল নয়, চুম্বক, স্থিত তড়িৎ (Static Electricity), আলো বিকিরণ—এসবের মধ্যেও সেই একই নিয়মের প্রভাব দেখা যায়। দুটি বিদ্যুৎকণা যেমন একে অন্যকে টানে বিপরীত বর্গের নিয়মে, দুটি চুম্বককণাও ঠিক সেভাবেই টানে বা ঠেলে দেয় (বিপরীত মেরু বা সমমেরু অনুসারে)। অনুরূপভাবে, একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে টর্চলাইট জ্বেলে যদি সে আলোর বিকিরণ লক্ষ করা হয় গোলাকার (যার কেন্দ্র হচ্ছে সেই আলোর উৎসটি) কোনো পাতের ওপর, তাহলে দেখা যাবে পাতটি যতই দূরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেই আলোর বিন্দু থেকে ততই তার জ্যোতি কমে যাচ্ছে ঠিক সেই অনুপাতেই, অর্থাৎ বর্গের নিয়মে। এর একটা সহজবোধ্য কারণও আছে—কেন্দ্র থেকে পাতটির মাঝখান পর্যন্ত যে দূরত্ব, সেটি হলো গোলকের ব্যাসার্ধ এবং ওই গোলকাংশটুকুর আয়তন সেই ব্যাসার্ধের বর্গেরই অনুপাতে; অতএব এটা সহজেই অনুমানসাপেক্ষ যে ওই টর্চের আলো থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মির তীব্রতা হ্রাস পাবে বিপরীত বর্গেরই অনুসারে, যতই তার দূরত্ব বৃদ্ধি পাবে আলোর উৎস থেকে। অর্থাৎ এখানেও সেই একই বিপরীত বর্গনীতির প্রযোজ্যতা প্রকাশ পেল।

নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আর বিপরীত বর্গনীতির সঙ্গে পূর্ববর্তী গবেষকদের একটা জায়গায় বড় পার্থক্য—অন্যেরা এই তত্ত্বের প্রয়োগশীলতা যে কেবল স্থানীয় পরিবেশে অবস্থিত দুটি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, ঊর্ধ্বাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রসহ সমগ্র বিশ্বচরাচরেই সমানভাবে প্রযোজ্য, সেটা তাঁরা স্পষ্ট করে উল্লেখ করেননি, সম্ভবত তাঁদের কাছে কোনো পরীক্ষিত প্রমাণ ছিল না বলেই। কিন্তু নিউটনের তা ছিল এবং সে কারণেই তাঁর তত্ত্বে ছিল বিশেষভাবে আকর্ষণীয় একটি উপাদান—সর্বজনীনতা, যা তাঁদের তত্ত্বে ছিল না।

কথা হলো, নিউটনের তত্ত্ব কি একেবারেই নিখুঁত, নির্ভুল? বহুলাংশে তা-ই। সাধারণ ব্যবহারের জন্য তাঁর প্রদত্ত তথ্যসমূহ এখনো পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করা হয়, এমনকি বর্তমান যুগের মহাশূন্যযানের প্রকৌশলশাস্ত্রেও। তবে সংসারের অন্যান্য বিষয়ের মতো বিজ্ঞানেরও বিবর্তন বলে একটা কথা আছে—সময়ের সঙ্গে তার অভ্যন্তরীণ চিন্তাভাবনাগুলো নতুন যুগের আলোকে পুনঃপরীক্ষার বিষয় হয়ে ওঠে।

উঠে আসে উন্নততর যন্ত্রপাতি, তৈরি হয় আধুনিকতর গবেষণাগার। উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে বিজ্ঞানীদের উপলব্ধির নাগালে এসে গেল যে নিউটনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তত্ত্বে একটা জিনিস স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, প্রচ্ছন্নভাবে হলেও যে আলোর গতি অসীম। সেটা আসলে সত্য নয়—আলবার্ট আইনস্টাইনের গবেষণা থেকে সেটা অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে ফুটে উঠেছে। তদুপরি তাঁর গবেষণা প্রকাশলাভের বেশ আগেই আমেরিকান পদার্থবিদ মাইকেলসন আর মর্লির পর্যবেক্ষণে সেই একই তথ্য পরিষ্কারভাবে বের হয়ে এসেছে। তবে কথাটা হলো: এই নবার্জিত জ্ঞান কি নিউটনের বলবিজ্ঞান, বিপরীত বর্গনীতিসহ মাধ্যাকর্ষণবিষয়ক যাবতীয় তত্ত্বকে একেবার নাকচ করে দেয়? মোটেও না। সাধারণ ব্যবহারের জন্য নিউটন এখনো রাজার আসনে বসে আছেন এবং সম্ভবত থাকবেনও আজীবন। পরিবর্তন যা হয়েছে, সেটা কতগুলো ছোটখাটো বিষয়ে, যেমন বুধ গ্রহটির গতিপরিক্রমায় একটা সূক্ষ্ম ব্যাপার ছিল, যা নিউটনের তত্ত্বের সঙ্গে ঠিক খাপ খাচ্ছিল না, কিন্তু আইনস্টাইনের অভিনব তত্ত্ব প্রদত্ত গণনায় সেগুলো প্রায় নিখুঁতভাবে মিলে যায়। তদুপরি নিউটনের তত্ত্ব অনুযায়ী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো সীমা নেই, আইনস্টাইন বলছেন, না, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য নয়। সীমা আছে বৈকি, মহাবিশ্বের সীমানা সেখানে যত দূর আলোকরশ্মি ভ্রমণ করতে পারে অপ্রতিহত অবস্থায়। তাঁর যুগান্তকারী যুক্তিসমূহের মধ্যে একটি হলো যে আলো ভরশূন্য হলেও বড় নক্ষত্র দ্বারা প্রভাবিত, আলো তার কাছে এসে বেঁকে যায়, কারণ সেই নক্ষত্রটি তাকে টেনে নিচ্ছে, যেমন নেয় ভরযুক্ত বস্তুকে। স্বভাবতই এসব সূক্ষ্ম বিষয় আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একেবারেই প্রযোজ্য নয়, আমরা নিউটনকে পেয়েই খুশি।

দুই.

নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের আরেকটি সীমাবদ্ধতা হলো এই যে এতে কেবল দুটি বস্তুর পারস্পরিক আকর্ষণের কথা বলা হয়েছে। যতক্ষণ আমরা দুই বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকি, ততক্ষণ নিউটন অপরাজেয়। তাঁর বিপরীত বর্গনীতি আর গতিসূত্র—দুয়ে মিলে উভয় বস্তুর গতিপথ নিখুঁতভাবে বের করে দেবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দুই বস্তুর মধ্যে সীমিত থাকা ঘটনা কত আর দেখা যায়। বিশেষ করে গ্রহ-নক্ষত্রের বেলায় এটা জলের মতো পরিষ্কার যে একটা গ্রহ বা উপগ্রহ একাধিক বিশাল ভরবিশিষ্ট বস্তুর নৈকট্য দ্বারা প্রভাবিত। যেমন ধরুন, আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী চন্দ্র গ্রহ—বেচারা আমাদের উপগ্রহের উপাধি পেয়েছে। কারণ, তার কপালটিই এ রকম যে ক্ষুদ্র হওয়ার অপরাধে তাকে সূর্যের চারদিকে নয়, পৃথিবীরই চারদিকে প্রদক্ষিণ করতে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে।

কিন্তু তাতে বিষয়টা সরল হয়ে যায় না, বরং নতুন এক জটিলতার মাত্রা যোগ হয়। এখন একই পাড়ায় দুটি নয়, তিনটে নায়ক দাঁড়িয়ে যাচ্ছে—একদিকে সর্বাধিনায়কের আসনে নিজ গাম্ভীর্যময় আলোকসত্তা নিয়ে বসে আছেন সূর্যদেব। আরেক দিকে তাঁরই অমোঘ আকর্ষণের বলয়ে আবদ্ধ হয়ে আছেন আমাদের পৃথিবী, অপর দিকে রয়েছেন ক্ষুদ্রতর চন্দ্র গ্রহ, যাঁর আকার ছোট হলেও তাঁরও আকর্ষণ নেহাত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার মতো নয়। সুতরাং, মহাকাশের একই পরিবেশের মধ্যে দুটি নয়, তিনটি খেলোয়াড় দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন হলো, নিউটনের তত্ত্ব যদি দুই বস্তুর সীমানায় আবদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে তার অর্থ কি এই দাঁড়ায় যে তাঁর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও অকেজো হয়ে যায় এই ত্রিদেহী জটের মধ্যে? না, সৌভাগ্যবশত তা হয় না, এখানেও দ্বিদেহী ক্রিয়ার মতো মাধ্যাকর্ষণ শক্তিসহ নিউটনের বলবিদ্যার সমীকরণসমূহ সমভাবে প্রযোজ্য। সমস্যা যেটা দাঁড়ায়, সেটা হলো যে দ্বিদেহী তত্ত্বের মতো বস্তুগুলোর গতিপথ চট করে বেরিয়ে আসে না দু-চারটে অঙ্ক কষার পর। আসলে চট করে দূরে থাক, আদৌ বের হয় কি না সন্দেহ। প্রথম দিকে নবীন-প্রবীণ সব রকম গবেষকদের ধারণা ছিল, এটা কোনো সমস্যা হলো? নিউটনের গতিবিষয়ক সমীকরণগুলো থাকতে চিন্তা কিসের। কিন্তু কাজের বেলায় দেখা গেল, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। যুগে যুগে বহু জ্ঞানী-গুণী মানুষ মাথা ঘামিয়েছেন ত্রিদেহী সমস্যার সমাধান পেতে। ইংরেজিতে একে বলা হয় থ্রি-বডি প্রবলেম, যা নিউটনের সময়কার টু-বডি প্রবলেম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং যার জটিলতার মাত্রা একবারে সীমা ছাড়ানো। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গবেষক এ সমস্যার বিশেষ বিশেষ সমাধান বের করেছেন সীমিত শর্তাদি ব্যবহার করে এবং অনেক ক্ষেত্রে সেগুলো কাজেও লেগেছে। কিন্তু কোনো রকম শর্ত আরোপ না করে পূর্ণ প্রয়োগযোগ্যতাশীল সমাধান বের করতে, অন্তত নিউটনের কলনশাস্ত্র ব্যবহার করে, আজ পর্যন্ত কেউই সক্ষম হননি।

তর্কের খাতিরে প্রশ্ন তোলা যায়, আচ্ছা, আমরা থাকি এই মহাবিশ্বে, মাধ্যাকর্ষণ বলয়ের বাইরে কোনো দিনই আমাদের যাওয়ার সম্ভাবনা নেই, অতএব আমাদের সাধারণ জীবনধারণের জন্য একাধিক গ্রহের পারস্পরিক ঠোকাঠুকি নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকারই-বা কী! অনর্থক একটা কাল্পনিক বিষয় নিয়ে অজস্র টাকা খরচ করে কী লাভ হবে আমাদের। এ প্রশ্নের অন্তত দুটি উত্তর, যা মানবকুলের সবার জন্যই প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয়। প্রথমটি হলো আমাদের জ্ঞানের সীমানা কোথায়, সেটা তন্নতন্ন করে খুঁজে নেওয়ার অন্তহীন প্রচেষ্টা আমাদের মনুষ্যত্বকে একটা ভিন্ন মাত্রা দান করে। এই যে প্রতিদিন রাতের আকাশে এত এত গ্রহ-নক্ষত্রের সমাবেশ, যা কবি আর বিজ্ঞানীকে সমভাবে অনুপ্রাণিত করে গেছে অনাদিকাল থেকে, তাদের সঙ্গে আমাদের এই ভূখণ্ডটির আসল সম্পর্কটা কী? এটা

যদি জানতে পারি, তাহলে আমাদের আদি ইতিহাস—আমাদের অস্তিত্বের আগাগোড়া পরিক্রমা—কোথায় আমাদের যাত্রা শুরু, কোথায়ই-বা শেষ, তার কিছুটা হদিস হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

তবে দ্বিতীয় একটি মাত্রা আছে, যা আধুনিক বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও জরুরি—শূন্যে ভ্রমণ। বলবেন, শূন্যেই-বা যেতে হবে ভ্রমণের জন্য কে বলল? লোকে ফ্লোরিডা যায়, মেক্সিকো যায়, বড়জোর ইউরোপে। শূন্যে যাবে কোন পাগল? হ্যাঁ, পাগল বটে। বড় বড় বিজ্ঞানী ও গবেষক আসলেই পাগল। পাগল না হলে কি জীবনের সবকিছু বিসর্জন দিয়ে দিনরাত ল্যাবের ঘিঞ্জি ঘরের ভেতর যন্ত্রপাতি নিয়ে সময় কাটান? কী জানেন? তাঁরা কাটান বলেই আমাদের জীবন আজকে এত আরাম-আয়েশময় বিলাসদ্রব্য দ্বারা পরিপূর্ণ হতে পেরেছে। এত সব ইলেকট্রনিক গ্যাজেটের মহাপ্লাবনে ভেসে যাচ্ছে আমাদের জীবন, সেই পাগলগুলোর কারণেই। তা ছাড়া আমরা সবাই জানি, ১৯৬৯ সালে মানুষ সশরীরে চন্দ্র গ্রহে গেছে মহাকাশের শূন্যযানে করে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো মঙ্গল গ্রহেও যাওয়া হয়ে যাবে। এই যে শূন্যে ভ্রমণের ব্যাপারটি, এখানেই অনিবার্যভাবে দাঁড়িয়ে যায় বহুদেহী আকর্ষণ তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা। আমরা দূরদর্শনেই দেখেছি, ঊর্ধ্বলোকের একটা উচ্চতায় পৌঁছানোর পর যাত্রীরা কার্যত 'ওজনহীন' অবস্থায় দাঁড়িয়ে যায়—যানের অভ্যন্তরে তারা ভাসতে শুরু করে নদীর মাছের মতো। এরপর যতই ওপরে উঠতে থাকে, ততই নতুন গ্রহ-উপগ্রহদের পরিপাশে চলে আসে একসময়। তখন আবার নতুন করে ভিন্ন রকম মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বলয়ের মধ্যে নিজেদের অবস্থিতি উপলব্ধি হতে শুরু করে। হয়তো একটি নয়, একাধিক বিপুলদেহী বস্তুর টানে তারা এক প্রকার দিশেহারা হয়ে যায়—সে টানে এদিকে, ও টানে ওদিকে। অর্থাৎ একটি অতিবাস্তব বহুদেহী পরিস্থিতি। এর মাঝে নিউটনের বিপরীত বর্গনীতি অকেজো হয়ে যায় তা নয়, কিন্তু শূন্যযানের যাত্রাপথের মানচিত্রটি চট করে অঙ্ক কষে বের করে ফেলা একরকম দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। অথচ মহাশূন্যে যান প্রেরণের আগেই তার যাত্রাপথ সঠিকভাবে নিরূপণ করার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। তার মানে, যে করেই হোক একটা নিখুঁত বা প্রায় নিখুঁত মানচিত্র দাঁড় করাতেই হবে, সেটাই হলো যাননিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের জ্ঞানী-গুণী বিজ্ঞানীদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

কিন্তু তার উপায় কী? নিউটনের মতো সোজা অঙ্ক কষে যদি সেটা জানা সম্ভব না হয়, তাহলে বিকল্প আর কী পন্থা আছে?

সেসব কারণে ত্রিদেহী এবং বহুদেহী তত্ত্বের প্রতি গাণিতিকদের মনোযোগ একটা জরুরি পর্যায়ে পৌঁছে যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। তাঁরা উঠেপড়ে লেগে যান প্রথম তিন বস্তু, পরে বহু বস্তুসংবলিত সমাবেশে তাদের গতিপথের

প্রকৃতি কী হবে, তা গণিতের মাধ্যমেই উদ্ধার করা। রীতিমতো একটা থমথমে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায় বলবিদ্যাবিষয়ক গণিতের গবেষণায়। ঠিক এই সময় ঘটে এক অভিনব ঘটনা।

তিন.

১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন আর নরওয়ের রাজা তৃতীয় অস্কার তাঁর ষষ্ঠ দশম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে একটা এককালীন পুরস্কার ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নেন। ব্যক্তিগতভাবে রাজা অস্কার ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞনের প্রতি দারুণ আকৃষ্ট। বিশেষ করে গণিতের প্রতি। বর্তমান যুগের রাজা-বাদশাদের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্যজনক মনে হলেও এটা সত্য যে সে যুগে জ্ঞানের প্রতি প্রচণ্ড একটা আকর্ষণ ছিল অনেক নৃপতিরই। সে সুবাদেই তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সে সময়কার সুইডেন, তথা সারা ইউরোপের সেরা গাণিতিকদের মধ্যে একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব মিটাগ-লেফ্লার (১৮৪৬-১৯২৭)। নামটা একটু অদ্ভুত মনে হচ্ছে হয়তো। মিটাগ তাঁর প্রথম নাম আর লেফ্লার পারিবারিক, নাকি উল্টোটা? আসলে কোনোটাই না। লোকটা সত্যি সত্যি একটু ভিন্ন প্রকৃতির পুরুষ ছিলেন। ঠিক নারীবাদী না হলেও নারীর সমান অধিকার এবং সামাজিক সম্মানের প্রতি ছিলেন দারুণ সহানুভূতিশীল এবং সে সময়কার চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে ভীষণ মুক্তমনা। তাঁর বাবার নাম ছিল মিটাগ আর মায়ের অবিবাহিত নামটি ছিল লেফ্লার। জন্মকালে মিটাগ হলেও পরে তাঁর সঙ্গে মায়ের নামটি নিজেই যুক্ত করে নিলেন—হয়ে গেলেন মিটাগ-লেফ্লার। গণিতজগতের অত্যন্ত সম্মানিত একটি নাম। সুইডেনের অধিবাসীদের কাছে তিনি একজন জাতীয় হিরো।

মিটাগ-লেফ্লার সেকালের সর্বাধুনিক অমীমাংসিত গাণিতিক সমস্যাগুলো সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলেন। জানতেন যে দাঁত-বসানো-শক্ত এমন সব সমস্যার মধ্যে একেবারে চূড়ায় বসে আছে ভরযুক্ত বস্তুর ত্রিদেহী, তথা বহুদেহী সমস্যা। তাই এটিই হোক রাজার জন্মদিনের নির্বাচিত সমস্যা, মনে মনে ঠিক করে ফেললেন তিনি। রাজা অস্কারের কাছে প্রস্তাব নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সানন্দে রাজি হয়ে গেলেন এবং সে অনুযায়ী গণিতজগতে বিস্তারিতভাবে সিদ্ধান্তটি প্রচারিত হয়ে গেল।

প্রতিভার স্বভাবটাই এমন যে সমস্যা যত কঠিন হবে, তার প্রতি আকর্ষণটাও তেমন প্রবল হবে। তারা চ্যালেঞ্জ পছন্দ করে। সেকালের চ্যালেঞ্জ সৃষ্টিকারী গাণিতিক সমস্যাগুলোর মধ্যে ত্রিদেহী সমস্যা ছিল একেবারে প্রথম সারিতে। অতএব, ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দেশ-বিদেশের মেধাবী গবেষকদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। একে তো সমস্যাটি এমনিতেই আকর্ষণীয়, তার ওপর পুরস্কার। সে তো আরও উত্তেজনার ব্যাপার। প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল তুমুল বিক্রমে।

এই প্রতিযোগীদের মধ্যে একজন ছিলেন ফ্রান্সের তৎকালীন তরুণ গাণিতিকদের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব আনরি পয়েনক্লেয়ার (১৮৫৪-১৯১২)। তিনি ছিলেন মূলত বলবিদ্যাবিশারদ—নিউটন থেকে শুরু করে, অয়লার, লাগ্রাঞ্জ, হ্যামিলটন, জ্যাকবি, এঁদের মতো শীর্ষস্থানীয় গবেষকের যাবতীয় মৌলিক কাজের সঙ্গে সুপরিচিত। তিনি ত্রিদেহী সমস্যা নিয়ে আগেও অনেক ভাবনাচিন্তা করেছিলেন। পুরস্কার ঘোষণার পর সেটা মনোযোগের চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেল। কিছুদিন একনিষ্ঠ গবেষণা করে তাঁর মনে হলো উত্তর পেয়ে গেছেন—এত দিনের দাঁত-বসানো-শক্ত সমস্যাটির পূর্ণ সমাধান তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে! কাজটি একটু গোছগাছ করে সাজিয়ে মিটাগ-লেফ্লারের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। মিটাগ-লেফ্লার বেশ মনোযোগ দিয়েই পড়লেন পেপারটি। কোনো রকম ফাঁকফোকর কোথাও আছে বলে মনে হলো না। তা ছাড়া গাণিতিক হিসেবে পয়েনক্লেয়ারের সুনাম সম্বন্ধে আগে থেকেই সচেতন ছিলেন তিনি—এ লোক কোনো কাঁচা কাজ করবে না, সে বিশ্বাস তাঁর যথেষ্টই ছিল। দুরূহ সমস্যার সাবলীল সমাধান পেয়ে মিটাগ-লেফ্লার মহাখুশি। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন, পুরস্কারের সুযোগ্য প্রাপক আনরি পয়েনক্লেয়ার। এই মর্মে ঘোষণা প্রচার হয়ে গেল গণিতজগতে। সাড়া পড়ে গেল চতুর্দিকে। বিজ্ঞানজগতের উত্তেজনা রাজনৈতিক উত্তেজনার চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। নিশ্চয়ই কালজয়ী প্রতিভা হবে লোকটা—পয়েনক্লেয়ারের সুনাম আরও শত গুণে ছড়িয়ে পড়ল গণিতের ঊর্ধ্বমহলে। রাজপ্রাসাদে যথাযথ আড়ম্বরের সঙ্গে পুরস্কার প্রদানের পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর পেপারটি মিটাগ-লেফ্লার সাহেব ছাপার জন্য পাঠিয়ে দেন তাঁর নিজেরই প্রতিষ্ঠিত সে সময়কার এক শীর্ষস্থানীয় গাণিতিক জার্নালে। সেটার ভুলভ্রান্তি কিছু পেলে সেগুলো শুধরে প্রুফ দেখার ভার দেওয়া হলো অ্যাডভ্যান ফ্র্যাগমেনের কাছে (এই ভদ্রলোক বয়সে তখন খুব তরুণ হলেও ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে মিটাগ-লেফ্লারের আস্থাভাজন হয়ে উঠেছিলেন)। ফ্র্যাগমেন প্রুফ দেখাকালে পয়েনক্লেয়ারের থেওরেমের প্রমাণটিতে যৌক্তিক স্খলন দেখতে পেলেন কিছুটা এবং সে মর্মে মঁসিয়ে পয়েনক্লেয়ারের কাছে একটি পত্র পাঠিয়ে দিলেন, যদিও পেপার প্রকাশের ব্যাপারে কোনো সমস্যা আছে—এমন কোনো দুর্বিনীত ইঙ্গিত ছিল না তাঁর প্রুফ দেখাতে। যথাসময়ে পেপার ছাপা হয়ে গেল এবং অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে না দেখলে তাতে কারোরই কোনো ফাঁকফোকর চোখে পড়ার কথা নয়, যেমন পড়েনি স্বয়ং মিটাগ-লেফ্লারের চোখে। কিন্তু ফ্র্যাগমেনের চিঠি পড়ার পর পয়েনক্লেয়ার যখন দ্বিতীয়বার তাঁর কাজটি নেড়েচেড়ে দেখলেন, তখন তাঁর মাথা ঘুরে গেল—সর্বনাশ, এ তো ডাহা ভুল! গোটা ব্যাপারটাই, প্রমাণের যুক্তিই কেবল নয়, প্রমাণিতব্য সিদ্ধান্তটিও। মানে নিউটনের কলনশাস্ত্র আর প্রথাগত কলাকৌশলগুলো ব্যবহার করে যে ফলাফল

তিনি পেয়েছিলেন তা আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসংগত মনে হলেও আসলে তা নয়। সে কী লজ্জা পয়েনক্লেয়ার সাহেবের—পত্রিকা বের হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। সবাই জেনে গেছে ত্রিদেহী সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে গেছে। তিনি তখন তাড়াহুড়ো করে সম্পাদক মিটাগ-লেফ্লারের কাছে খবর পাঠালেন যে প্রকাশিত পেপারটি তিনি প্রত্যাহার করছেন এবং সংশোধিত কাজ শেষ হয়ে গেলে তার পুনঃপ্রকাশের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার তিনি নিজের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে বহন করবেন। মিটাগ-লেফ্লার আগ্রহসহকারেই রাজি হয়ে গেলেন তাঁর প্রস্তাবে।

পরবর্তী কাহিনি গণিতজগতের এক যুগান্তকারী ঘটনা। পয়েনক্লেয়ার সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলেন যে গতানুতিক গাণিতিক পদ্ধতিতে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সম্পূর্ণ নতুন চিন্তার সূচনা না হলে ত্রিদেহী বা বহুদেহী বিশ্বের দ্বারোদ্‌ঘাটন হবে না। কলনশাস্ত্র আর বীজগণিতের পথ এড়িয়ে তিনি জ্যামিতির শরণাপন্ন হলেন। এবং তাতেই হলো অভীষ্টসিদ্ধি—ধীরে ধীরে প্রকৃতি তাঁর অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করতে শুরু করল। কিছুদিন দিনরাত খাটাখাটি করে আনরি পয়েনক্লেয়ার এক অপূর্ব উপহার নিয়ে এলেন গণিতের বিচিত্র জগতে। তাঁর সমাধানের মধ্য দিয়ে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা ধাবিত গতির যে সূক্ষ্ম বিষয়গুলো কিছুতেই ধরা দিতে চাচ্ছিল না, তাঁর দ্বিদেহী তত্ত্বের বলয়ে, তার পূর্ণ সমাধান অবিশ্বাস্য এক রূপসীর রূপ ধারণ করে আবির্ভূত হলো। এবং সেটা হলো এমনই এক নতুন সজ্জায় যে তাতে করে জ্যামিতিক গণিতের একটা পুরোপুরি নতুন শাখাই সৃষ্টি হয়ে গেল বলতে গেলে। শাখাটির নাম 'টপলজি', যার সঠিক বাংলা আজ পর্যন্ত হয়েছে বলে আমার জানা নেই (পরাজ্যামিতি বলা ঠিক হবে কি?)। এই নতুন জ্যামিতি অনুযায়ী একটি বর্গক্ষেত্র আর একটি বৃত্তের মধ্যে (দুয়ের ভেতরটা যেন একই রকমভাবে ফাঁকা থাকে) প্রকৃতিগত কোনো প্রভেদ নেই—দুটোই টেনেটুনে ছোট আকারে সংকুচিত করে করে বিন্দুতে পরিণত করা যায়। সুতরাং, পরাজ্যামিতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তারা অভিন্ন। স্পষ্টতই গতানুগতিক ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতির সঙ্গে আকাশ-পাতাল তফাত।

কিন্তু তার চেয়েও বড় যে জিনিসটি পরিষ্কার ভাষায় ফুটে উঠেছে, সেটা হলো বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে পয়েনক্লেয়ারের অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ অনুধাবন, যেন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর সন্ধানী দৃষ্টির তীক্ষ্ণবাণে বিদ্ধ হয়ে অবশেষে নতশিরে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল এই যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যতই জটিল হোক (এবং আকর্ষণ-বিকর্ষণের অমোঘ বিধান দ্বারা নিবদ্ধ বস্তুর সংখ্যা নিউটনের দ্বিদেহী সংস্থার গণ্ডি পার হয়ে তিন বা তারও ঊর্ধ্ব সংখ্যায় পৌঁছে গেলে), যতই জটিল থেকে জটিলতর পথ পরিক্রম করুক না কেন, 'শেষ পর্যন্ত' প্রতিটি চলমান বস্তুই তার যাত্রাবিন্দুতে প্রত্যাবর্তন করে, সাময়িকভাবে হলেও। শর্ত হলো যে

তাদের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের নিরন্তর প্রক্রিয়াটি অবিরাম যেন চলতে থাকে। সেখানে কোনো রকম বিরতি ঘটলে চলার শকটটিও স্থিতাবস্থায় সমাপ্ত হয়ে যাবে। কিছুটা ঘড়ির কাঁটার মতো। পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে আমি একটা গুরুত্ব আরোপ করেছি 'শেষ পর্যন্ত' শব্দযুগলের ওপর—তার কারণ এই যে ফিরে আসাটা, এটি কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে মোটেও টের পাওয়া যাবে না। আসলে অধিকাংশ গতিই এ রকম প্রত্যাবর্তী আচরণ প্রদর্শন করে না—অনেক অনেক কাল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারলে তবেই সে ধরা দেবে। অবশ্য সব বস্তু পূর্বাবস্থানে ফিরে এসে অন্তহীন পরিক্রমায় ঘুরতে থাকবে তাও নয়—কিন্তু যারা আসে তাদের প্রতিই আমাদের বেশি জোর দিতে হয়। যেমন সূর্যের চারপাশে নিত্য ঘূর্ণমান পৃথিবী একবার ঘুরে এসে আবারও ঠিক একই পথে চলতে শুরু করে। পয়েনক্লেয়ার সে কথাটার ওপরই জোর দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর নিজেরই ভাষায় : 'The reason the periodic solutions are so precious to us is that they are the only opening by which we can enter this inaccessible fortress.' (এই পৌনঃপুনিক সমাধানগুলো এত মূল্যবান আমাদের কাছে, কারণ এই একটিমাত্র উপায় আমাদের, যাতে করে আমরা প্রকৃতির দুর্ভেদ্যে রহস্যপুরীতে প্রবেশ করতে পারি) জটিল গণিতের সাধকেরাও যে কখনো কখনো কাব্যিক ভাষায় তাঁদের ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখেন, এই পঙ্‌ক্তি যেন তারই খানিক ইঙ্গিত দেয়।

আমরা সাধারণ মানুষ হয়তো বিজ্ঞের মতো মুচকি হেসে বলব, এগুলো সব পাগল গাণিতিকের উর্বর কল্পনার উদ্ভট আবিষ্কার ছাড়া কিছু নয়। এর সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্ক কী? হ্যাঁ, আছে। আমরা অজ্ঞ বলেই বুঝেও বুঝি না, দেখেও দেখি না। পয়েনক্লেয়ারের কথাগুলো যে বর্ণে বর্ণে সত্য, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো আমাদের চোখের সামনে—রোজই ডগডগ করে তাকিয়ে থাকে আমাদের দিকে। মানে আমাদেরই চিরপরিচিত সূর্য-চন্দ্র-পৃথিবী নিয়ে যে ত্রিদেহী সমাবেশটি ঊর্ধ্বগগনে, আমি তারই কথা বলছি। এরা তো তিনটিতে মিলে সেই একই দৃশ্যের অবতারণা করে চলেছে অনাদিকাল ধরে—একে অন্যকে টানছে নিজ নিজ ভরমাফিক ক্ষমতা দিয়ে, অতএব তিনটিরই তো কিছু না কিছু নড়াচড়া হওয়ার কথা ওই কারণে। হয়ও। তবে সূর্য তারকাটি আকারে এত বিশাল অন্য দুটির তুলনায় যে তার গায়ে বলতে গেলে সামান্য একটু আঁচড়ও লাগে না। লাগে অপর দুটির গায়ে। লাগে বলে পৃথিবী বছরে একবার করে সূর্যের চারদিকে ঘোরে আর চন্দ্র ঘোরে পৃথিবীর চারদিকে মাসে একবার। ওদের মধ্যে যে ইতিমধ্যে নানা রকম টানাটুনি হয়ে যাচ্ছে, তা আমরা খালি চোখে টেরও পাচ্ছি না। তবে নভোদর্শীরা পান তাঁদের শক্তিশালী দুরবিনের সাহায্যে। তাঁরাই কেবল টের পান যে প্রায়

প্রতিবছরই পৃথিবী ও চন্দ্র, দুটিই সামান্য পরিমাণে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে তাদের গ্রহপথ থেকে, যদিও পয়েনক্লেয়ারের সেই 'দীর্ঘকাল অপেক্ষা'র পর দেখা যায়, তারা আবার সেই একই জায়গায় ফিরে এসেছে। এভাবেই বিশ্বচরাচর তার চিরকালীন স্থিতিস্থাপকতা অক্ষুণ্ন রেখে চলেছে।

পয়েনক্লেয়ারের যুগান্তকারী আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির আরও এক বিচিত্র বৈশিষ্ট্য একটু উঁকি মারতে শুরু করেছে, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় কেয়স (Chaos), সাধারণ অর্থে যাকে আমরা চরম বিশৃঙ্খলা হিসেবে বুঝি। এর বৈজ্ঞানিক অর্থ তার চেয়ে অনেকটাই গভীর—বর্তমান যুগে ফলিত গণিতের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখায় পরিণত হয়েছে বলা যায়। যেখানেই বহু বস্তুর যুগপৎ সংঘাতের ব্যাপার সেখানেই কেয়সের সম্ভাবনা। ঢাকা শহরের বহু-আলোচিত, প্রায়-কিংবদন্তিতে পরিণত-হওয়া যানজটের সঙ্গেই তুলনীয় বলা চলে। শব্দটির বিজ্ঞানসম্মত কোনো বাংলা প্রতিশব্দ বেরিয়েছে কি না জানি না, তবে শব্দটির বৈজ্ঞানিক অর্থের সঙ্গে সাধারণ ব্যবহারিক অর্থের এতটাই দূরত্ব যে আমার মনে হয়, এর কোনো তরজমাই হওয়া ঠিক হবে না।

যা-ই হোক, ওপরের কথাগুলোর সারমর্ম এই যে পয়েনক্লেয়ারের গবেষণার একটি উপরি প্রাপ্তি বিজ্ঞানের এই নতুন চিন্তার ধারাটি। কিন্তু এটা হলো তাঁর পরোক্ষ ফলাফল, প্রত্যক্ষ নয়। প্রত্যক্ষটি হলো ভরযুক্ত বস্তুর গতি বিশ্লেষণের এক অভিনব পন্থার আবিষ্কার—জ্যামিতিক পন্থা। নিউটন আমাদের শিখিয়েছিলেন কীভাবে তাঁর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সঙ্গে বস্তুর ত্বরণ সমীকরণীকৃত করে কলনবিদ্যার রীতিনীতি (যা নিউটনের নিজেরই আবিষ্কৃত) দ্বারা সোজা অঙ্ক কষে বের করে ফেলা যায় আদ্যোপান্ত সব সমস্যার সমাধান। অবশ্য এখানে বলে রাখা দরকার যে জ্যামিতির পদ্ধতিতে আঁকা চিত্র চিত্রায়ণের এই প্রক্রিয়া গতানুগতিক ইউক্লিডিয়ান ছবির মতো ঠিক নয়। এগুলো সাধারণত অবস্থানভিত্তিক স্পেসে আঁকা নয়, অবস্থান ও গতি—দুটোকেই সমান মর্যাদা দেওয়া স্পেসে, যাকে গণিতের ভাষায় বলা হয় 'ফেজ স্পেস'। এখানে বস্তুর অবস্থানকে দেওয়া হয় একটি অক্ষ, আরেকটি থাকে গতির দখলে। অর্থাৎ এই মানচিত্রে একটা বিন্দু দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা ইত্যাদি সূচিত করে না, করে একটি চলমান বস্তুটি তার চলার পথে এ মুহূর্তে কোথায় অবস্থিত এবং এর গতিবেগ কত। এই চিত্রে একটি পরীক্ষমাণ বস্তুর গতিবিধি অনুসরণ করে কী ধরনের ছবি সৃষ্টি করে যাচ্ছে, তার গোটা ইতিহাসই কেবল বোঝা যায় না, এই গতির প্রকৃতিটাও পরিমাপন করা যায়—স্থিতিশীল, সুশৃঙ্খল না, একেবারেই এলোমেলো, বিভ্রাটময় (অর্থাৎ কেয়টিক)। বহুমাত্রিক এবং বহুদেহী পরিস্থিতিতে এই তথ্যটুকু অত্যন্ত প্রয়োজন।

চার.

প্রাচীনকালে দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে গণিত আর বিজ্ঞানের বড় একটা বৈষম্য ছিল না—একই বিষয়ের এপিঠ-ওপিঠ। প্লেটো, অ্যারিস্টোটল (বিশেষ করে অ্যারিস্টোটল), উভয়ই কেবল বড় দার্শনিকই ছিলেন না, বড় গাণিতিক-বিজ্ঞানীও ছিলেন বটে। অ্যারিস্টোটল যে প্রাণীবিজ্ঞানের আদি জনক, সেটা আমাদের অনেকেরই জানা নেই। শুধু প্রাচীন যুগের কথাই বলি কেমন করে, মধ্যযুগের বেলায়ও অনেকটা প্রযোজ্য কথাটি। ওমর খৈয়ামের রুবায়েতে যে গভীর জীবনদর্শন প্রকাশ পায়, তা অদ্যাবধি মানুষকে দোলা দেয়। ওদিকে তিনি ছিলেন একজন বড় মাপের গাণিতিক এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী। লেওনার্দো দা ভিঞ্চির কথা বলতে শুরু করলে তো এক বেলায় শেষ হবে না। তাঁর মতো শতমুখী প্রতিভা পৃথিবীতে বোধ হয় হাজার বছরে একটি জন্মায়। সাধারণ মানুষ কেবল তাঁর 'মোনালিসা'র দিকেই চেয়ে রইল এতটা কাল, তাঁর অন্যান্য কাজের দিকে ফিরেও তাকাল না। তিনি একাধারে মানবদেহ তত্ত্বের (Human Anatomy) অবিসংবাদিত জনক, উড়োজাহাজের প্রথম মডেল তাঁরই হাতে গড়া, তিনি ভাস্কর, তিনি স্থপতি, তিনি গণিতের একনিষ্ঠ সাধক। উপরন্তু, তিনি মানবচরিত্র সম্বন্ধে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী রেখে গিয়েছিলেন, তা বর্তমান যুগের দিকে তাকালে অবিশ্বাস্য মনে হবে—এতটাই মিল।

পাঠক হয়তো ভাবতে শুরু করেছেন, এসবের সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কী সম্পর্ক। আছে। আছে বলেই এটুকু ভূমিকার অবতারণা। নিউটনের সময়কালে এটা ধরেই নেওয়া হতো যে প্রকৃতি কোনো 'ভুল' করতে পারে না, এখানে মনুষ্যসুলভ বিভ্রান্তিকর বালখিল্যের প্রশ্রয় নেই, কারণ মহান সৃষ্টিকর্তার সুপরিকল্পিত মানচিত্রে এসবের স্থান নেই। সংসারে কোনো ঘটনাই ঘটা সম্ভব নয় একটা নির্দিষ্ট কারণ ছাড়া। ধর্মগ্রন্থে পরিষ্কার লেখা আছে, ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া গাছের তুচ্ছ পাতাও নড়ে না। এই সহজবোধ্য ধ্যানধারণার সঙ্গে নিউটনীয় কার্যকারণসম্বন্ধীয় চিন্তাধারা পুরোপুরি মিলে যায়। নিউটনের তত্ত্ব অনুযায়ী একটা বস্তু, যত ক্ষুদ্র বা বৃহৎই হোক, এক মুহূর্ত থেকে পরের মুহূর্তে বা আরও অনেক পরের মুহূর্তে কোথায় যাবে তা নির্ভর করে বস্তুটি যাত্রাকালে কোথায় ছিল, কতটা বেগ ছিল তার তখন এবং কিসের তাড়নায় তার চলন, এগুলো জানা থাকলে এর ভবিষ্যৎ গতিবিধির নিখুঁত মানচিত্র এঁকে দেওয়া সম্ভব। সৌভাগ্যবশত আমাদের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের তাগিদে যা কিছু জানা দরকার, সেগুলো এভাবেই জেনে নেওয়া হয়। লন্ডন থেকে ঢাকাগামী একটি প্লেন বেলা তিনটায় রওনা হলে ঠিক কয়টার সময় ঢাকার বিমানবন্দরে পৌঁছাবে, সেটা আগে থেকে জানা থাকে। কারণ, প্লেন মোটামুটিভাবে নিউটন এবং আধুনিক বিমানবিজ্ঞানীদের গণনা অনুসারে অত্যন্ত আজ্ঞানুবর্তিতার সঙ্গে সব নিয়মকানুন পালন করে চলে।

কিন্তু প্রকৃতি সব সময় এমন সুশীল আজ্ঞাবহতার ধার ধারে না। আগের অধ্যায়ে এর একটা ছোট্ট আভাস দিয়েছি—ত্রিদেহী সমস্যা নিয়ে পয়েনক্লেয়ার সাহেবের যে মাথা দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছিল, তার উৎসটাই তো সেখানে। দুটির বদলে তিনটি মিলে একে অন্যকে টানাটানি শুরু করলে কে কোন দিকে যাবে, সেটা স্বয়ং নিউটন সাহেবও হয়তো হলফ করে বলতে পারতেন না। আসলে এটা কোনো পারিবারিক ঝগড়াঝাঁটির মতো নয়, এটাই প্রকৃতির মৌলিক চরিত্র। এই যে ছোট ছোট বিশৃঙ্খলা থেকে একসময় লাগামছাড়া বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়া, যেটা একসময় পূর্ণমাত্রা কেয়সের আকার ধারণ করে, তা প্রকৃতির বিকার নয়, স্বরূপ।

কার্যকারণ সম্পর্কহীনতা যে কেবল বহুদেহী ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা নয়। অনেক সময় একটিমাত্র বস্তুর গতিতেও এ রকম আপাতবিকারগ্রস্ততা পরিলক্ষিত হয়—নির্ভর করে বস্তুটি কী রকম আধারে ধারণ করা হয়েছে, কেমন তার পরিবেশ ইত্যাদি। বাচ্চাদের খেলার মাঠে একটা দোলনায়-চড়া শিশু প্রায় কখনোই বেসামাল গতিতে চলতে শুরু করবে না—এটা কার্যকারণের আওতার ভেতরই পড়ে। একটি গোলাকার পাত্রের কথা ভাবুন। এবং ধরা যাক, পাত্রটির ভেতরকার দেয়ালটি খুবই মজবুত, একেবারে মসৃণ মেঝের মতো চকচকে। এবার কল্পনায় তার ভেতরে একটা ছোট্ট বল ছুড়ে দিলেন একটা কৌণিক লক্ষ্য বরাবর এবং ঠিক কতটা কোণে সেটা ছুড়লেন, সেটা সঠিক জেনে রাখুন। বস্তুটি সেই কোণের মাত্রা অনুযায়ী আরেকটা দিকে প্রতিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। সেখান থেকে ওটা সেই গোলাকার পাত্রেরই একটা বিশেষ বিন্দুতে গিয়ে ঘা খেয়ে তৎক্ষণাৎ নিক্ষিপ্ত হবে ঠিক একই কোণের অন্যত্র। আরম্ভের কোণটা যদি ৩৬০ ডিগ্রির একটি ভগ্নাংশের গুণক হয়, তাহলে একসময় সে-ই প্রথম বিন্দুটিতে প্রত্যাবর্তন করে আবার নতুন পথে চলতে শুরু করবে। ছবিটা একটি গোলাকার (কাল্পনিক যদিও) পিং পং টেবিলের ওপর বলটির অন্তহীন লাফালাফি করার মতো। তবে গোড়ার কোণের পরিমাণটি যদি ৩৬০ ডিগ্রির ভগ্নাংশ (rational number) না হয়, তাহলে কিন্তু বলটা তার অন্তহীন চলার পথে কখনোই আর আগের বিন্দুটিতে ফিরে আসবে না। তথাপি একটা সত্য থেকে যায়—একটি কোণ কেবল একটা পথই (সরলরেখা, যদি তার চিত্র আঁকা হতো) নির্দেশ করে। পাত্রের আধারখানি গোলাকার না হয়ে যদি অধিবৃত্তের আকারে হতো, তাহলেও গতিপ্রকৃতি মূলত একই থাকত, কেবল চিত্র, মানে গ্রাফ আঁকতে গেলে সেটা সরলরেখা না হয়ে বাঁকা হয়ে যেত।

এই উদাহরণ দুটির মধ্যে মৌলিক মিল যেখানে, সেটা হলো কার্যকারণ সম্পর্ক। অর্থাৎ হেতুবাদ অক্ষুণ্ন থাকছে দুটিতেই। মূল সংখ্যাটি যা হবে, পরবর্তী সংখ্যাগুলো সে অনুসারেই তৈরি হবে। অর্থাৎ কারণ যে রকম, ফলটাও সে রকম। নিউটন তত্ত্বের সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এই সরলচিত্র একেবারেই ওলট-পালট হয়ে যায়, যখন সেই আধারটির জ্যামিতিক প্রকৃতি আগাগোড়া বদলে যায়। ওটা যত জটিল হবে, বলটির গতিপ্রকৃতিও ঠিক সেই পরিমাণে জটিল হতে শুরু করবে। তখন এমন হয় যে বলসংখ্যা মাত্র একটি হলেও তার গতিপথের যে ছবি উঠে আসে, তা আর একটি সরলরেখা বা বক্ররেখা না হয়ে একটা হযবরল ধরনের জগাখিচুড়ি বা কুজ্ঝটিকাজাতীয় অস্পষ্ট জিনিস বের হয়ে আসে। যেন একটা মেঘের দলা। অর্থাৎ একটা পুরোদস্তুর কেয়স। বিষয়টি আমার এই চিত্রবিহীন সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় ভালো করে হয়তো ফুটে উঠল না। তাই কৌতূহলী পাঠকদের আমি উৎসাহ দিচ্ছি যেন ইভার একল্যান্ড-প্রণীত গ্রন্থ : *The Best of All Worlds (1)*, বা জেমস গ্লাইকের লেখা কেয়সবিষয়ক পূর্ণাঙ্গ বই *Chaos (2)*-এর পাতা উল্টিয়ে দেখার চেষ্টা করেন। এটি বর্তমান যুগের বিজ্ঞানজগতে একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়। এতে একাধারে উঁচুমানের গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, দর্শন, সব একসঙ্গে মিলে একটা রহস্যময় জগৎ তৈরি হয়ে গেছে।

পাঁচ.

এবার আমাদের পুরোনো প্রশ্নে ফিরে আসা যাক—বহুদেহী বস্তুর সমাবেশে প্রকৃতির নিয়মকানুন কোথায় দাঁড়ায়। আগেই বলেছি, এই কঠিন প্রশ্নটিতে কীভাবে বারবার ব্যাহত হয়েছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঘা বাঘা প্রতিভা। এবং স্বয়ং পয়েনক্লেয়ার সাহেবও (যিনি ওই শতাব্দীর, অনেকের মতে, সর্বকালের, অন্যতম শ্রেষ্ঠ গাণিতিক হিসেবে পরিচিত) চরম বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে গিয়েছিলেন এই দুরূহ সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে—পেপার ছাপা হওয়ার পর তাতে সম্পূর্ণ ভুল উপপাদ্যের 'প্রমাণ' আবিষ্কার করা যে কী লজ্জা, সেটা আমি কিছুটা বুঝি। ভাগ্য ভালো যে সময় থাকতে ফ্রাগম্যানের মতো একজন শ্যেনদৃষ্টিসম্পন্ন তুখোড় এবং তরুণ গাণিতিকের হাতে গিয়ে পড়েছিল তাঁর পেপারটি, নইলে হয়তো সেই ভুল অবস্থাতেই পয়েনক্লেয়ারের পেপার বলে পরিচিত একটি অসত্য 'উপপাদ্য' গণিতশাস্ত্রের এক কলঙ্কিত ইতিহাস হয়ে থাকত।

যা-ই হোক, অবশেষে ওই পেপারের শেষরক্ষাই হয়নি কেবল, পয়েনক্লেয়ারের অসাধারণ গাণিতিক চিন্তাচেতনার এক সুবর্ণ দলিল হিসেবে তাঁর পরিবর্তিত পেপারটি অমরত্ব লাভ করেছে। এতে তিনি যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে অতি সহজবোধ্যভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন যে নিউটন সাহেবের তত্ত্বাবলি অক্ষুণ্ন থাকা সত্ত্বেও তাঁরই সৃষ্ট কলনপদ্ধতি দিয়ে ঊর্ধ্বাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রাদির চালচলন বুঝে ওঠা সম্ভব নয়, সেখানে সব সময় সরল বুদ্ধি কার্যকারণ সম্পর্ক কাজ করে না। বরং ইউক্লিড-বহির্ভূত একপ্রকার অদ্ভুত জ্যামিতিই যেন সেখানকার প্রচলিত ভাষা।

এই অভিনব ভাষারই প্রাথমিক আভাস উঁকি দিয়েছিল পয়েনক্লেয়ারের পরিমার্জিত পেপারে, যা পরবর্তী সময়ে টপলজিতে পল্লবিত হয়। তারও কিঞ্চিৎ আভাস আমি দিয়েছি এ রচনার গোড়ার দিকেই। বিষয়টি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন বিজ্ঞান ও গণিতের এক প্রসিদ্ধ লেখক ইয়ান স্টুয়ার্ট। আমি এ নিবন্ধে প্রধানত তাঁর বিবরণই (৩) অনুসরণ করেছি, অধিকাংশ সময় আমার বক্তব্য পেশ করার জন্য।

পয়েনক্লেয়ার শুরুতে প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন ত্রিদেহী গতিরেখার ছবি আঁকতে গিয়ে। সূর্যকে স্থির রেখেও চন্দ্র আর পৃথিবী মিলে অবিশ্বাস্য জটিলতা সৃষ্টি করে দেয়—ওদের গতিপথগুলো অসংখ্যবার পরস্পরকে ছেদ করে, যার ফলে ওদের গতির হদিস রাখা একেবারে সাধ্যাতীত হয়ে পড়ে। সে সময় যে কথাটি তাঁর মাথায় হয়তো পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠেনি, তা হলো যে এই অসংখ্য ঠোকাঠুকির মধ্যেই লুকিয়ে ছিল কেয়সের পূর্বাভাস। পরে অবশ্য কেয়স শব্দটি স্পষ্ট করে খুলে না বললেও অন্যরা ওই সূত্র ধরে পুরো আইডিয়াটি সংজ্ঞাবদ্ধ করে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। আরও একটি ঘটনা ঘটে, কচিৎ-কদাচিৎ যদিও, সেটি হলো যে একটা আবদ্ধ গতিপথ তৈরি হয়ে যায়, অর্থাৎ সেখানে গতির পৌনঃপুনিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়। মানবজাতির স্থিতিস্থাপকতার দিক থেকে ভাবতে গেলে এই পৌনঃপুনিকতাই আমাদের অস্তিত্বের শেষ ভরসা। সে কারণেই সূর্য-চন্দ্র-বিশ্ব এই ত্রিশক্তির মধ্যেও আমাদের জীবনে বছর ঘুরে বছর আসে, অধিবর্ষ হয় প্রায় ঘড়ির কাঁটা ধরে এবং বিজ্ঞানীরা দূর ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দিতে পারেন। এই পৌনঃপুনিকতার সন্ধান, এই অধিবৃত্তিক গ্রহপথের সন্ধানই ছিল পয়েনক্লেয়ার সাহেবের ইউক্লিডের বাইরে নতুন জ্যামিতি সৃষ্টি করতে যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য।

আমরা যত দিন পৃথিবীপৃষ্ঠে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করেই সন্তুষ্ট ততক্ষণ অন্য কোনো বড় সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা তেমন নেই। কিন্তু মানুষ কখনোই এক জায়গায় স্থির থাকতে পারে না—অজানাকে জানার স্পৃহা আমাদের অন্তহীন। তাই মানুষ উড়োজাহাজ আবিষ্কার করেছে, বেলুনে করে আকাশ ভ্রমণ করতে চেয়েছে, শেষে এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। সেই চেষ্টারই রূপায়ণ ঘটেছে চন্দ্র গ্রহের অভিযানে। প্রথমে চালকবিহীন, পরে চালকসহ—এক নয় একাধিক। প্রশ্ন হলো, ওই প্রথমবার যখন শূন্যযান পাঠানো হয় চাঁদের দিকে, তখন নাসার প্রকৌশলীরা কীভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যানটিকে কোন রাস্তা ধরে চালিত করবেন? এবং তাঁদের সেই সিদ্ধান্তগুলোর পেছনে কী সব যুক্তি তৈরি করা হয়েছিল? সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হতে পারে, কেন, সোজা চাঁদ বরাবর ছুড়ে মারলেই তো হয়। না, ব্যাপারটি তত সহজ নয়। প্রথমত, 'চাঁদ বরাবর সোজা দিক' বলে কোনো দিক নেই। ভুলে গেলে চলবে না যে চাঁদ আমাদের চারপাশে ঘুরছে, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ঘুরছি পৃথিবীর চারপাশে। অতএব আমাদের সোজা

দিকটিকে ঠিকমতো বাঁকাতে না পারলে কখনো ওটা গন্তব্যে গিয়ে পৌঁছাবে না। দ্বিতীয়ত, ভূপৃষ্ঠ থেকে চন্দ্র গ্রহের দূরত্ব ৩,৫৮,০০০ কিলোমিটার (২,২১,৮০০ মাইল) থেকে ৪,০৮,৩০০ কিলোমিটার (২,৫২,৫০০ মাইল) পর্যন্ত ওঠানামা করে, আমাদের থেকে সূর্যের দূরত্ব যেমন গ্রীষ্মে কমে যায় আর শীতে বাড়ে। দুটোরই মূল কারণ হলো অধিবৃত্তাকার কক্ষপথ উভয়েরই। সুতরাং, এতটা পথ মহাশূন্যের অচেনা পথে ভ্রমণ করার এমন একটা রাস্তা খুঁজতে হয় যাতে, এক. সবচেয়ে কম খরচে উদ্দেশ্য সাধন করা যেতে পারে; দুই. সময় বাঁচানো, বিশেষ করে যদি এক বা একাধিক চালক থাকে সঙ্গে (তাদের স্বাস্থ্যের কথা ভাবতে হবে, তাদের খাবারদাবার, তাদের নিরাপত্তা ইত্যাদি নানা বিষয় ওদের বিবেচনায় রাখতে হয়); তিন. যাতে ফেরার পথে অনায়াসে ফেরা যায় চাঁদের আকর্ষণের বলয় থেকে বের হয়ে এবং যাতে ওজনহীন অবস্থায় কিছুক্ষণ ঝুলে থাকার পর বিনা ঝাঁকুনিতে পৃথিবীর আকর্ষণ ক্ষেত্রে প্রবেশ করা যায় নিশ্চিন্তে। এগুলো ছোটখাটো প্রশ্ন নয়—কমান্ড সেন্টারের বাঘা-বাঘা বিজ্ঞানী-প্রকৌশলী ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ এগুলো আদ্যোপান্ত বিবেচনা না করে মানুষচালিত যান আকাশে উড্ডীন হতে দেবেন না।

চাঁদে যেতে সোজা তাক করে যাত্রা শুরু করার বড় সমস্যা হলো প্রচণ্ড রকম জ্বালানি তেল খরচ হয় তাতে—গোটা মিশনটা তখন ব্যয়সাধ্যতার বাইরে চলে যায়। ভুলে গেলে চলবে না যে পৃথিবী থেকে চাঁদের পথে রওনা হতে প্রথম তার আকর্ষণের বলয় অতিক্রম করতে হয় এবং সেখানেই জ্বালানিশক্তি ব্যয় হয় সবচেয়ে বেশি। এই সমস্যার একটা ছোটখাটো সমাধান বের হয়েছে তথাকথিত হোম্যান অধিবৃত্ত বদল তত্ত্বের মধ্য দিয়ে। আইডিয়াটি এ রকম। পৃথিবী থেকে এক টানে সোজা ওপরে চলার পরিবর্তে প্রথমে ঊর্ধ্বমুখী হতে হতে পাশে, বৃত্তাকারে পৃথিবীর চারপাশে একবার ঘুরে তারপর আস্তে আস্তে চাঁদের দিকে অগ্রসর হওয়া—সরলরেখায় নয়, একটি চিকন অধিবৃত্তের রেখা ধরে, এতে কম তেল খরচ হয়। তারপর একটা জায়গায় এসে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ দুর্বল হতে হতে যানটিকে ওজনহীন অবস্থায় এনে দেয়। অর্থাৎ তখন পৃথিবী আর চন্দ্র দুইয়ের আকর্ষণ থেকেই অপেক্ষাকৃত মুক্ত আমাদের শূন্যযানটি—সেটা বেশ আরামের সময়ই, তেল প্রায় একেবারেই খরচ হয় না। তারপর ওকে আস্তে আস্তে চাঁদের দিকে চলতে শুরু করতে হবে। তবে একবারে নয়। প্রথমে চাঁদের চারদিকে একবার চক্কর দেওয়া—ঠিক পৃথিবীর চারপাশে যেমন ঘোরা হয়েছিল একবার। সেটাও ওই একই উদ্দেশ্যে—জ্বালানির খরচ কমানো। শেষে ধীরে ধীরে কক্ষ বদল করে চাঁদের দিকে অগ্রসর হওয়া। ১৯৬০ আর ১৯৭০ সালের মাঝে যে কবার চাঁদে ভ্রমণ করা হয়েছিল, তার সবই এই নীতি পালন করেছে।

কিন্তু আধুনিক যুগের শূন্যযাত্রীদের জন্য চন্দ্র গ্রহ এখন প্রায় ডালভাত। বিজ্ঞান ও প্রকৌশল দুটিই হু হু করে এগিয়ে গেছে। এতটাই অগ্রসর এ যুগের প্রযুক্তি যে অতি সম্প্রতি নাসার বিজ্ঞানীরা মঙ্গল গ্রহে একটি অনুসন্ধানী (যন্ত্রচালিত স্বভাবতই) যান পাঠাতে সক্ষম হয়েছেন। সেখানে ব্যাপারটি তত সোজা নয়। প্রথমত, মঙ্গল গ্রহের দূরত্ব গড়ে প্রায় ২২৫ মিলিয়ন কিলোমিটার এবং গ্রহটির আকার এত বিশাল যে সেখানে একটি ৩৬৫ দিনবিশিষ্ট বছরের যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি, তার তুলনায় ওটা ৬৮৭ দিন। সেখান থেকে আলোরশ্মি পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছাতে লাগে তিন মিনিট, যেতে লাগে আরও তিন মিনিট। সেখানে যেতে কেবল নিউটন সাহেবের দ্বিদেহী তত্ত্বের ওপর ভরসা করে যাওয়া যাবে না। কারণ, ওই দীর্ঘ পথে ভ্রমণ করতে গিয়ে পথিমধ্যে অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে হবে। সেখানে সাধারণ ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতিও বড় একটা কাজে আসে না। তার চেয়ে পয়েনক্লেয়ার সাহেবের নতুন তত্ত্ব ব্যবহার করা অনেক লাভজনক। যা-ই হোক, আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গের জন্য এসব জটিল প্রশ্ন যতই আকর্ষণীয় হোক, খুব একটা প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয় না। আমার মনে হয়, আগ্রহী পাঠকের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য এ বিষয়ের সত্যিকার বিশেষজ্ঞ যাঁরা, তাঁদের প্রণীত গ্রন্থাদি খোঁজা উচিত—আজকাল বাজারে অনেক বই-ই বের হয়েছে এসব বিষয়ের ওপর। সহজবোধ্য পাঠের জন্য গ্রন্থসূত্রে যে দুটি বই (৪ ও ৫) আমি উল্লেখ করেছি, তার পৃষ্ঠাগুলো উল্টেপাল্টে দেখলেও হয়তো কিছুট ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

এ লেখাটি আমি শেষ করে দেব ভবিষ্যতে যাঁরা শূন্যে ভ্রমণ করার ইচ্ছা পোষণ করেন, তাঁদের জন্য কিছু টুকিটাকি খবর তুলে ধরে। মহাশূন্যে ভ্রমণ করতে গেলে এটা ধরেই নিতে হবে যে একটা জায়গায় গিয়ে যাত্রীদের কোনো ওজন বলে কিছু থাকবে না—ভর থাকবে, কিন্তু ওজন কাটাকুটি হয়ে শূনে চলে যাবে। কিন্তু সে অবস্থাটি কতক্ষণ বজায় থাকবে, সেটা নির্ভর করবে যানের গতি, অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের নৈকট্য কত দূর এবং তাদের আকর্ষণ শক্তির জোর কতটা। শুধু তা-ই নয়, গ্রহ-উপগ্রহ কি একটি, না একাধিক, এবং একাধিক হলে তার সংখ্যা কত। সাধারণত ঊর্ধ্বাকাশে বহুসংখ্যক গ্রহ-উপগ্রহ এমনকি উল্কা, ধূমকেতু এগুলোর সাক্ষাৎ পাওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। কথা হলো, সে অবস্থায় শূন্যযানের চালককে কী ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হতে হয়। মনে রাখতে হবে, তেল বাঁচানো একটা জরুরি বিষয়—কোনোক্রমে যদি তেল ফুরিয়ে যায় এক লাখ মাইল ওপরে, তাহলে আপনাকে সরাসরি বিধাতার দরবারে পৌঁছে যেতে হবে—স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের মুখ দেখার ভাগ্য হবে না আর। কিন্তু তেল বাঁচাতে কী করতে হয়? সে প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবেন প্রকৌশলীরা, যাঁরা পাহাড়ি রাস্তায় রেলগাড়ি চালানোর জন্য পাহাড়ের গায়ে রেল না বসিয়ে পাহাড়ের ভেতরে গর্ত করে সুড়ঙ্গ তৈরি করেন।

উদ্দেশ্য একই, এতে খরচ বাঁচে অনেক গুণ। আধুনিক নগরজীবনে অনেকেই পাতালট্রেন ব্যবহার করেন। পাতালট্রেন তৈরি করা হলো কেন? কেবল যানবাহনের ভিড় লাঘব করার উদ্দেশ্যেই নয়, খরচ বাঁচানোর জন্যও অনেকখানি। অনুরূপভাবে শূন্যে ভ্রমণের বেলায়ও আজকাল 'পাতালট্রেন' বলে একটা অদ্ভুত আইডিয়া আলোচিত হচ্ছে। পাঠক নিশ্চয়ই সন্দিহান হয়ে উঠছেন ইতিমধ্যে, শূন্যে আবার পাতাল এল কী করে? ঠিকই ধরেছেন, জাগতিক অর্থে পাতাল নেইও সেখানে, কিন্তু এখানে 'পাতাল' শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে ভাবার্থে। এর সত্যিকার কোনো অস্তিত্ব নেই, গাণিতিকের কল্পনায় মাত্র। শুধু তা-ই নয়, এর মাত্রাসংখ্যা তিনের চেয়ে বেশি, সাধারণত পাঁচ থেকে সাত পর্যন্ত যেতে পারে (মাত্রা বলতে আমি ইংরেজির ডাইমেনশনকে বোঝাচ্ছি)। আসল ব্যাপারটা হলো, শূন্যের 'পাতালপথ' মানে যেখানে জ্বালানি খুব কমই ব্যবহার করতে হয় অন্যান্য পথের তুলনায় এবং যেখান থেকে এক গ্রহের কক্ষপথ বদল করে অন্য গ্রহের কক্ষপথে স্থানান্তরিত হওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা আছে। অনেকটা টরন্টো-মন্ট্রিয়ল-নিউইয়র্কের পাতালট্রেনের এক লাইনে করে একটা স্টেশনে যাওয়ার পর সেখানে নেমে অন্য লাইনের ট্রেনে উঠে গন্তব্যে পৌঁছানোর মতো। এতে গোটা যাত্রাটি খুব অল্প সময় ও ব্যয়ে শেষ করা সম্ভব হয়। আমাদের শূন্যে ভ্রমণের জন্য 'পাতালট্রেন'-এর ধারণাটিও অনেকটা সে রকম। কম ঝামেলা, কম খরচ।

অবশ্য এসবই এ মুহূর্তে কল্পকাহিনি ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু আজকে যেটা কল্পনা, ১০ থেকে ১৫ বছর পর যে সেটা বাস্তবে পরিণত হবে না, কে বলবে সে কথা? অতীতের অনেক উদ্ভট কল্পকাহিনিই তো বাস্তবে রূপ পেয়ে গেল এ যুগের প্রযুক্তির কল্যাণে। ভবিষ্যতে আরও কত-কী ঘটবে কে জানে!

তথ্যসূত্র

Ivar Ekeland, *The Best of All Possible Worlds*, University of Chicago Press, 2006; Paperback edition, 2007.

James Gleick, *Chaos*, Penguin Books paperback edition, 1988.

Ian Stewart, *In Pursuit of the Unknown,* Basic Books, 2012.

Douglas Adams, *The Hitchhiker's Guide to the Galaxy,* Published by Del Ray, 2005.

Beth Revis, *Across the Universe,* Published by Razorbill, 2011.

Internet.

অটোয়া (মুক্তিসন '৪১), কানাডা

(রচনাটি ২০১২ সালের ২২ আগস্ট লেখা)

লে খ ক প রি চি তি

বদরুল আলম খান

বদরুল আলম খান দীর্ঘকাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব বিভাগে শিক্ষকতার পর বর্তমানে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন সিডনিতে অধ্যাপনা করছেন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বাংলাদেশ সমাজ, শ্রেণি, ধর্ম ও বিশ্বায়ন। তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার মধ্যে *পুঁজিবাদের সমাজতত্ত্ব* (সম্পাদনা), *সমাজতত্ত্ব : সংকট ও সম্ভাবনার দেড় শ বছর, দর্শনের সংকট* এবং *তৃতীয় বিশ্ব, ধর্ম ও সমাজ বিপ্লব* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। *সংঘাতময় বাংলাদেশ : অতীত থেকে বর্তমান* নামক একটি গ্রন্থ সম্প্রতি প্রথমা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

লাইলুফার ইয়াসমিন

লাইলুফার ইয়াসমিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এবং সিডনির ম্যাকুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ইতিহাস, রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ডক্টরেট প্রার্থী। তিনি বিস্তৃতভাবে বাংলাদেশের নিরপেক্ষতাবাদ এবং দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর প্রধান গবেষণার বিষয় হলো ধর্ম ও রাজনীতি, জাতিগত সমস্যা এবং দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি।

সাবেকুন নাজমুন

গণবিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি ও প্রশাসন বিভাগে শিক্ষকতা করছেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন শেষে একই বিভাগ থেকে ২০১১ সালে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ছিল পরিবেশ নারীবাদ : বাংলাদেশ প্রসঙ্গ। পরিবেশ, নারী, সাক্ষরতা, বয়স্ক শিক্ষা, নারীর জীবন-জীবিকা, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়ে লেখার পাশাপাশি বিভিন্ন সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন।

আবদুর রাজ্জাক

বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক (১৯১২-৯৯) ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী এক মানুষ। অর্ধশতাব্দীর অধিককাল তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। এটিই ছিল তাঁর প্রাণকেন্দ্র। তবে কর্তব্যবোধে বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তিনি ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিলেতফেরত এই ব্যক্তির জীবনযাপন প্রণালির সারল্য, অনাড়ম্বর দেশীয় সজ্জা এবং মৌখিক ভাষার নিজস্ব ঢং তাকে বিশিষ্টতা দিয়েছিল।

ইফতেখার ইকবাল

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিবেশ এবং ইতিহাসে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। জার্মানির Humboldt বিশ্ববিদ্যালয়সহ নর্থ সাউথ, ইস্ট ওয়েস্ট ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়িয়েছেন। ব্রিটিশ একাডেমি, আগা খান বিশ্ববিদ্যালয়, হুম্বল্ডত ফাউন্ডেশন ও কমনওয়েলথ ট্রাস্ট থেকে ফেলোশিপ পেয়েছেন। তাঁর বই *দ্য বেঙ্গল ডেল্টা* (পালগ্রাভ মাকমিলান, ২০১০) বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন পুরস্কার এবং Bernard S. Cohn Book Prize কমিটি কর্তৃক Honorable Mention অর্জন করেন (২০১০)।

মীজান রহমান

মীজান রহমান (জন্ম ১৯৩২) বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কানাডিয়ান গণিতবিদ। তিনি কানাডার নিউ ব্রুনসউইক থেকে ১৯৬৫ সালে পিএইচডি ডিগ্রি নেন। তারপর তিনি কার্লেটন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন এবং পরে প্রফেসর ইমেরিটাস হিসেবে আখ্যায়িত হন। শিক্ষকতা ছাড়াও তিনি বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখি করেন। বিভিন্ন ইন্টারনেট ব্লগ, ই-ম্যাগাজিনে বাংলা ভাষায় লেখালেখি করেন। তাঁর বইয়ের মধ্যে *Basic Hypergeometric Series (coauthor), Special Functions, q-Series and Related Topics (coeditor), তীর্থ আমার গ্রাম, লাল নদী, ভাবনার আত্মকথন, শূন্য, আনন্দ নিকেতন* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

যেকোনো সময় যেকোনো সংখ্যা থেকে *প্রতিচিন্তা*র গ্রাহক হওয়া যাবে। একবারে কমপক্ষে চার সংখ্যা বা এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হবে। 'মিডিয়াস্টার লিমিটেড প্রতিচিন্তা' বরাবর মানি অর্ডার, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে টাকা জমা করা যাবে। অফিসে সরাসরি উপস্থিত হলেই শুধু নগদ টাকা গ্রহণ করা হবে। এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে দেশের গ্রাহকদের অগ্রিম দিতে হবে ২০০ (দুই শত) টাকা, বিদেশের গ্রাহকদের জন্য ৩০ (ত্রিশ) ডলার; দুই বছরের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪০০ (চার শত) টাকা ও ৬০ (ষাট) ডলার।

গ্রাহক হিসেবে আবেদন করতে পরিষ্কার করে লিখুন :

নাম, অবস্থান (দেশ/ বিদেশ), বিস্তারিত ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল (যদি থাকে), গ্রাহক হওয়ার মেয়াদ (এক/ দুই বছর), অর্থ প্রদানের মাধ্যম (মানি অর্ডার/ পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট), টাকা/ ডলারের পরিমাণ।

গ্রাহক হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার পর গ্রাহককে একটি রশিদ দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক
প্রতিচিন্তা
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ (সিএ ভবন), কারওয়ান বাজার
ঢাকা ১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৮১


Call now 01977667766
কুটিল ফ্লাইওভার থেকে
মাত্র ১০ মিনিট দূরত্বে এক নতুন ঢাকা...
এককালীন পরিশোধে কাঠা প্রতি মূল্য

টাকা মাত্র!
আজই বুকিং দিন...
PURBACHAL
Sabuj Dhaka
Bestway GROUP
সবুজ বনানী ঘেরা আপনার ভবিষ্যত প্রজন্মের নিরাপদ আবাসন পূর্বাচল সবুজ ঢাকা।
At your service
Bestway for Homes
Baridhara Zone: 01914702981; Panthapath Zone: 01973333121; Uttara Zone: 01914702983; Mirpur Zone: 01937403296; Shyamoli Zone: 01929917822; Moghbazar Zone: 01919168902; Motijheel Zone: 01929917863; Bongshal Zone: 01914702982; Chittagong Zone: 01939913772


LCBS Dhaka
Welcome to LCBS Dhaka!!!
We are proud to use "THE FIRST" statement:
– The first approved partner (Platinum) in Bangladesh
– The first ACCA CBE Centre in Bangladesh
– The first & only CIMA quality learning partner
– The first CIMA CBE Centre
– The first CIPFA approved Training Partner in the world and Exam Centre
With career development forum and training facilities along with Job Placement.
CIMA
CIPFA
Career Success
Job Placement
JobsbankBD.com
Corporate Training
Public Sector
&
Private Sector
Career Development Forum (CDF)
Exam Centres
ACCA (CBE)
CIMA (CBE)
CIPFA Exam
ACCA/CIMA
CIPFA
Your ONE STOP Career Solution
01746388644-46
www.facebook.com/lcbs.dhaka
www.linkedin.com/company/3008019
Elearning.lcbsdhaka.com
www.lcbsdhaka.com
House # 39/B, Road #14/A, Dhanmondi, Dhaka-1209

প্রথমার বই সারা বছর সেরা বই



প্র ব ন্ধ - গ বে ষ ণা

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
- **নাগরিকদের জানা ভালো** ৩য় মুদ্রণ ৳ ৩৩০

মইউদ্দিন আহমদ
- **জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি** ৩য় সংস্করণ ৳ ৫৫০

আলী রীয়াজ
- **ভয়ের সংস্কৃতি : বাংলাদেশে আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের রাজনৈতিক অর্থনীতি** ৳ ২৭০




- **How Did We Arrive Here?** ৳ ৩৫০

বদরুল আলম খান
- **সংঘাতময় বাংলাদেশ : অতীত থেকে বর্তমান** ৳ ৫৫০

সৈয়দ আজিজুল হক
- **জয়নুল আবেদিন : সৃষ্টিশীল জীবনসমগ্র** ৳ ৬০০

রওনক জাহান
- **Political Parties In Bangladesh** ৳ ৫৫০

মজিউর রহমান
- **খাপড়া ওয়ার্ড হত্যাকাণ্ড ১৯৫০** ৳ ৩০০




আ ত্ম স্মৃ তি / স্মৃ তি

এ কে খন্দকার
- **১৯৭১ : ভেতরে বাইরে** ৭ম মুদ্রণ ৳ ৪৫০

এবিএম মূসা
- **আমার বেলা যে যায়** ৩য় মুদ্রণ ৳ ৫০০

আনিসুজ্জামান
- **বিপুলা পৃথিবী** ৳ ৮০০





শি ল্প শি পি

মুনীর চৌধুরী, লিলি চৌধুরী
- **শিলপঞ্জি-মনপঞ্জি-ডাকঘর** ৳ ৪৫০




মু ক্তি যু দ্ধ

ফারুক আজিজ খান, অনু : আসজাদুল কিবরিয়া
- **বসন্ত ১৯৭১ : মুজিবনগর সরকারের কেন্দ্র থেকে দেখা মুক্তিযুদ্ধ** ৳ ৪০০

সম্পাদক : মজিউর রহমান
- **সম্মুখযুদ্ধ ১৯৭১ : মুক্তিযোদ্ধাদের কলমে** ৳ ৩৫০

প্রাপ্তিস্থান : প্রথমা বইয়ের দুনিয়া—ঢাকা কারওয়ান বাজার ৮১৮০০৭৮; বাংলাবাজার ০১৭২৮ ৮৮৪৪২০; শাহবাগ ৯৬৬৪৮২৫; **চট্টগ্রাম** ৬১৬১৬৫, **রাজশাহী** ০১৭৪৯ ৮৪৫৮৪৫
ফোনে অর্ডার/ বই অনুসন্ধান : ০১৭১৩-০৬৮১০৩, ০১৯৫৫-৫৫২০৬২, ০১৮৪২-৩২২৫৭৭